রবীন্দ্রসঙ্গীতসুষমা

কিরণশশী দে

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

॥ ভূমিকা ॥

কিছু কিছু ব্যক্তির জীবন জাতীয় জীবনের বহুমুখিন সৃষ্টিধারার সঙ্গে এমন গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে যে তাঁদের কর্মকৃতিকে বিস্মৃত হলে জাতীয় জীবনের ইতিহাসের ধারা বিস্মৃত হবার নামান্তর হয়ে পড়ে। জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়িতে দ্বারকানাথ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত—এই তিন পুরুষের যে মহতী সৃষ্টিধারা প্রবাহিত হয়েছিল তা বাংলার নব জাগরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সঙ্গীতজগতে রামমোহন যে ধ্রুপদ-গানের প্রবর্তন করলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর সন্তানেরা—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ—সেই ধারাকে নানা দিক থেকে নানা ভাবে পুষ্ট ত করলেনই, নানা নতুন সুর সৃষ্টির দ্বারা সেই ধারাকে সমৃদ্ধশালিনী করে তুললেন। তাঁদের এই সৃষ্টিপ্রয়াসের ইতিহাস অনেক বাঙালী জানেন না,—শ্রীযুক্ত কিরণশশী দে এই অভাবটি পূরণ করে না-জানার লজ্জা থেকে আমাদের ত্রাণ করেছেন।

সকল রকমের সঙ্গীতেই স্বরলিপির প্রয়োজনীয়তা যে সুর-বিকৃতি করবার জন্যে নয়, সুর-রচয়িতার সুরগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে—সেই বিষয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের এবং তৎসহ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে প্রমুখ বিশিষ্ট সঙ্গীতবেত্তাদের যথাযথ উদ্ধৃতি সংকলন করে কিরণশশীবাবু এই পুস্তিকাটিতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

গানের কথাগুলি কী ভাবে উচ্চারণ করা দরকার—সে-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ও অভিমত ছিল খুবই সুস্পষ্ট! জড়িয়ে-জড়িয়ে শব্দের উচ্চারণ কিংবা অস্পষ্ট উচ্চারণ শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন অতীতের সঙ্গীতাচার্যেরা গায়কের দোষ বলে নির্ণিত করেছেন। অধুনা যে-ভাবে অস্ফুট কাকলীর ঢঙে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া হয়ে থাকে তা বেদনাদায়ক। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত সকলের কাছে তুলে ধরে কিরণশশীবাবু সঙ্গীতসাধকদের প্রভূত উপকার করেছেন।

এই পুস্তিকায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট বিভিন্ন সুর ও তাল এবং তাঁর সঙ্গীতে স্বদেশ-প্রীতি প্রভৃতি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এই সকল মূল্যবান আলোচনা রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিক্ষার্থীদের নিঃসন্দেহে উপকারে আসবে।

বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদু ভট্ট ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সঙ্গীতাচার্যদের জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে অতি মূল্যবান তথ্য কিরণশশীবাবুর এই বইটিতে পাওয়া যাবে।

এই পুস্তিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশকের নিবেদন

এই গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত কিরণশশী দে রবীন্দ্রসঙ্গীত-জগতে একটি অতি পরিচিত নাম। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিবিধ সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে তিনি বহুদিন ধরে আলোচনা করে চলেছেন। তাঁর লিখিত 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি জিজ্ঞাসা' ইতিমধ্যেই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শান্তিনিকেতনে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছাত্র হবার এবং কবিগুরুর সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেছিলেন। সঙ্গীত-বিষয় নিয়ে তৎকালে কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনার সুযোগও হয়েছিল একাধিকবার। তাঁর সমগ্র জীবনই রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষাদানে অতিবাহিত। সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সুধীজন সঙ্গ তাঁকে যে পরিণতি দান করেছে, তার চিহ্ন তাঁর লেখার মধ্যে সর্বত্র অত্যন্ত স্পষ্ট।

শ্রীযুক্ত দে'র রচিত 'রবীন্দ্রসঙ্গীতসুষমা' গ্রন্থটিরও স্বাতন্ত্র্য আছে। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পাঠোপযোগী করে নিপুণভাবে তিনি তো লিখেছেনই—পরন্তু একাধিক জটিল বিষয় নিয়ে সহজ সরল ভাষায় সমস্যার বিশ্লেষণও করেছেন। সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য হল রচনাগুলি, বহুবিধ তথ্যে সমৃদ্ধ হয়েও কেবলমাত্র শুষ্ক উপদেশ বা নীরস শাস্ত্রালোচনায় ভারাক্রান্ত হয় নি, বরং অনেক ক্ষেত্রে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত সুচিন্তিত মতামত, সব রকম পাঠকের মনেই পরিতৃপ্তি এনে দেবে।

পরিশেষে জানাই, 'রবীন্দ্রসঙ্গীতসুষমা' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষ হওয়ায়, পাঠকদের আগ্রহ ও উৎসাহের কথা মনে রেখেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হল। লেখকও প্রতিনিয়ত রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে নানারকম গবেষণা করে যাচ্ছেন, তার ফলাফলও এই সংস্করণকে সমৃদ্ধতর করেছে। আশাকরি গ্রন্থটি সুধীসমাজে সমাদৃত হবে।

কলিকাতা ৯

বিনীত

সুধাংশুশেখর দে

॥ লেখকের নিবেদন ॥

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পরলোকে যাবার আগের বছর আমাদের বলেছিলেন : "গানের কথা আমি বলি গানেতেই,—গানের কথা আমাকে ফের যদি বলতে হয় ভাষাতে, তবে আমার উপর কি জুলুম হয় না? পুরানো পুঁথিপত্র খুঁজলে দেখবে গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কী বলেছে—যথেষ্ট বলেছে"।*

আবার এও তো অনেকের জানা, যে, স্বীয়-সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের সমগ্র বক্তব্য নিঃশেষে পরিবেশন করে গেছেন এবং তিনি নিজেই নিজের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। তা' সত্ত্বেও আশ্চর্য,—তাঁর গানের বিষয় নিয়ে নিজ-নিজ বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে ভাষ্য তৈরির কাজে আমাদের কারুর বিন্দুমাত্র দ্বিধা কিংবা দুর্বলতা নেই! এমনতর কাজের পিছনে নিশ্চয় আছে কোন্-এক অজানা পরিতৃপ্তি। আজ আমিও সেই পরিতৃপ্তি লাভের লুব্ধতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে রাখতে পারছি না বলেই পূজনীয় গুরুদেবের সঙ্গীত সম্পর্কীয় যাবতীয় প্রবন্ধ, কথোপকথন এবং বক্তৃতাদি ঘেঁটে প্রয়োজনীয় তথ্য সাধ্যমত সংকলন করে এই নূতন ভাষ্য রচনায় ব্রতী হয়েছি—এ কথাটা শুরুতেই জানিয়ে রাখা ভাল। এ নিয়ে বলবার বা লিখবার তেমন সময় সুবিধা হয়ত আর ভবিষ্যতে না-ও পেতে পারি,—সেটাও আমার পক্ষে আর এক অলঙ্ঘনীয় কারণ বটে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে এই জাতীয় প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে আমাকে কয়েক বৎসর আগে পাঠকের আসরে টেনে নিয়ে আসেন, গড়িয়া-দীনবন্ধু এনড্রুজ-কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান রমেন্দ্র চৌধুরী—যার ফলশ্রুতি হিসাবে আমাদের 'রবীন্দ্রগীতিপ্রবাহ ১ম ভাগ'-টির প্রকাশ। সেই ১ম ভাগের দ্বারা অনেক পাঠক-পাঠিকা উপকৃত হয়েছিলেন জেনে আমরা অচিরে তার ২য় ভাগটিও প্রকাশ করি। সে-কাজে এরই মধ্যে যে সফলতা ও সার্থকতা এসেছে সে-গৌরবের অধিকার অনেকাংশে শ্রীমান রমেন্দ্রর। এবারেও আমার এই নূতন প্রচেষ্টার পেছনে তার উৎসাহ ও উদ্যম সমভাবে অক্ষুণ্ন রেখে তিনি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

পুরোবর্তী রবীন্দ্রগীতিপ্রবাহ ১ম ও ২য় ভাগে সন্নিবিষ্ট বিষয়বস্তু সমূহের প্রসঙ্গেই যদিচ বর্তমান গ্রন্থটিও রচিত, তবু এর ভিতরকার রূপ কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক—অনেকটা পরিবর্তিত, পরিমার্জিত এবং বহুল পরিমাণে পরিবর্ধিত;—সহৃদয় পাঠকেরা তা পড়লেই অনায়াসে বুঝতে পারবেন। আর, এমনতর কাজে আমার প্রবৃত্ত হবার মূল কারণটিও আমি নিবেদনের গোড়াতে ব্যক্ত করেছি। সোজা ভাষায় বলতে হয়,—আগের প্রবন্ধগুলি খুব

* আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ আষাঢ় ১৩৪৭

সংক্ষেপে লিখেছিলাম, অনেকটাই দ্রুত লিপিচালনের প্রয়োজন-তাড়নায়; আমার মনের সব কথা তখন পূর্ণ প্রকাশের অবকাশ পায় নি। এবারে তা নয়,—বক্তব্য বিস্তারিত হওয়ায় গ্রন্থটির কলেবরও স্ফীত হল অনেকটা,—যাকে প্রায় একখানা নূতন বই-ই বলা চলে।

লেখা বাহুল্য গ্রন্থ প্রস্তুতির আদ্যোপান্ত রবীন্দ্ররচনাবলীর সহায়তা আমাকে পূর্ণমাত্রায় নিতে হয়েছে এবং উক্ত রচনাবলী প্রত্যেকটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণের। তদুপরি অন্যান্য গ্রন্থের ও পত্রপত্রিকার যা সাহায্য নিয়েছি সেই স্বীকৃতি কৃতজ্ঞচিত্তে যথাস্থলে যথারীতিতে লিপিবদ্ধ করা সত্ত্বেও—বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ-প্রণেতাদের নাম সহ একটা মোটামুটি পরিচয়-পত্র এখানেও পুনরায় সংযোজন করলাম :—

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ : রাণী চন্দ
[ফাল্গুন ১৩৬৮ সংস্করণ]

গীতসূত্রসার : কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়
[৩য় সংস্করণ ১৩৬১]

গীত-পরিচয় : সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
[চিত্রে ভূষিত বিশেষ সংস্করণ ১৩৬৬]

জীবনের ঝরাপাতা : সরলা দেবী
[দোলযাত্রা, ফাল্গুন ১৮৭৯ শকাব্দ]

তীর্থংকর : দিলীপকুমার রায়
[৩য় সংস্করণ, পরিবর্ধিত ১৩৫৮]

পিতৃস্মৃতি : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
[অগ্রহায়ণ ১৩৭১]

বক্তব্য : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
[৬ আশ্বিন ১৩৬৪, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭]

ভ্রাম্যমান : দিলীপকুমার রায়
[নূতন সংস্করণ,৭ বৈশাখ ১৮৮৬ শকাব্দ]

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত
: নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী
: সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

মংপুতে রবীন্দ্রনাথ : মৈত্রেয়ী দেবী
[এপ্রিল ? ১৯৪৩, প্রথম প্রকাশ]

যাত্রী : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
[পোষ, ১৩৫৭]

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণীসঙ্গম : ইন্দিরা দেবী

রবীন্দ্রসঙ্গীত I : শান্তিদেব ঘোষ
[পরিবর্ধিত সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯]

রবীন্দ্রসঙ্গীত II : ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী
[২৫ বৈশাখ ১৩৭৭]

রবীন্দ্রায়ণ : পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত

রবীন্দ্রগীতিপ্রবাহ (১ম ও ২য় ভাগ) { কিরণশশী দে, রমেন্দ্র চৌধুরী

রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধনা : সুবিনয় রায়

শান্তিনিকেতন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
[বিশ্বভারতী সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৪২]

সঙ্গীতের মুক্তি : রবীন্দ্ররচনাবলী-১৪শ খণ্ড

সঙ্গীতদর্শিকা (১ম ও ২য় খণ্ড) { ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সাঙ্গীতিকী : দিলীপকুমার রায়
[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৮]

সুর ও সঙ্গতি { রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
[শ্রাবণ ১৩৪২]

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি : কাঙ্গালীচরণ সেন
[আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত : মাঘ ১৮২৮ শক]

আমার এই লেখার কাজে সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছি প্রায়ই। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর অন্তরের শুভকামনা লিখে দিয়ে বর্তমান গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের যে শ্রী ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন—সে গৌরবের অনুভব ভাষায় প্রকাশ করতে আমি অক্ষম—তাঁর এই স্নেহের ঋণ আমার কাছে অপরিশোধ্য হয়ে রইল।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও সঙ্গীতবিভাগের মাননীয় ডীন শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁর নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যে আবদ্ধ থেকেও, অনেক কাল আগেই আগ্রহ নিয়ে সদরদে পড়েছেন এবং খুশি হয়ে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তার অমূল্য অভিমত জানিয়ে আমাকে একান্তভাবে উপকৃত ও বাধিত করেছেন।

গ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীতের তাল ও রাগরাগিণী নামাঙ্কিত তালিকাটি তৈরি করার সংকল্প আমার বহুবৎসর আগের,—তথা ১৩৩৫-৩৬ সালে কাজটি শুরু করার পর কিছুদিন বন্ধ রেখে পুনশ্চ রবীন্দ্র-তিরোধানের পরে এতে হাত দিই; কিন্তু স্বল্প জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে সব দিক থেকে একে সুসম্পন্ন করে তোলা সহজসাধ্য নয় ভেবে এত কাল আত্মসংকোচিত অবস্থায় আমাকে থাকতে হয়। তাহলেও যে টুকু মাত্র কোনো প্রকারে করে উঠতে পেরেছিলাম সে-টুকুই 'সুরছন্দা' সম্পাদক শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গীতবিষয়ক পত্রিকায় পরমযত্নের সহিত ধারাবাহিক ছাপিয়ে এর প্রতি গুণীপাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমায় যে উৎসাহিত করেছেন, তজ্জন্যে তিনি শুধু তালিকা-প্রণেতার নয়—সমগ্র পাঠকসমাজের ধন্যবাদার্হ। সেই তালিকাটি কিঞ্চিৎ সংশোধিত ও সমৃদ্ধতর করে এখানে পুনর্মুদ্রিত হল।

আরো উল্লেখ প্রয়োজন,—গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন কালে লেখার আগে কিংবা পরে, পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে আমার বয়সে ছোট-বড় অনেকেরই কাছ থেকে আমি কম-বেশি বিভিন্ন রকমের সাহায্য নিয়েছি—বহু বিশেষজ্ঞ, বহু সাহিত্যিক-কবি, বহু আত্মীয়জন, বহু বন্ধুবান্ধব ও ছাত্রছাত্রীর। এঁরা সকলেই নিঃসন্দেহে আমার শুভানুধ্যায়ী;—এঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখান্তে ধন্যবাদ জানাতে গেলে বিরাট তালিকা এমন কি একটি পুস্তিকা তৈরি করতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা করা এ-যাত্রায় নানা কারণে সম্ভব হল না, তাই আর পৃথক-পৃথক ভাবে কারো নাম উল্লেখ না করে সকলের প্রতি একত্রে—আমার অপরিসীম ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখলাম এই গ্রন্থের ভূমিকায়।

রবীন্দ্রসঙ্গীত-অনুশীলনে যাঁদের জীবন একান্তভাবে উৎসর্গীকৃত তাঁরা যদি এই প্রবন্ধগুলি পড়েন, এবং এর মধ্য থেকে নিজগুণে যদি কোনো গ্রহণীয় উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে বর্তমান গ্রন্থ-রচয়িতার যাবতীয় শ্রম হবে সার্থক—বিনম্রচিত্তের এই অনুভব সর্বশেষে নিবেদন করেও শুধু একটি কথা এখানে জানাতে চাই,—প্রবন্ধগুলি (বিশেষকরে—'সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের সুর ও তাল সৃজন-প্রতিভা', 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি ও শিল্পীর স্বতন্ত্রতা',

'রবীন্দ্রসঙ্গীতে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য' নামীয় আলোচনাযোগ্য জটিল বিষয় কয়টি) লিখতে বসে বারবার মনে প্রশ্ন জেগেছে : রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালোবাসেন বটে অনেকেই,—কিন্তু এর বিশ্লেষণের প্রতি উৎসাহী কয় জন? জবাব খুঁজতে গিয়ে দেখেছি,—কেবলমাত্র গান সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ নিজে কত জায়গায় কত কি লিখে গেছেন, বলে গেছেন—এ-সব স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পড়বার কিংবা জানবার আগ্রহ যে অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী জনের মধ্যেও বিরল—তা বোধকরি একেবারে অস্বীকার করা চলে না।

তাই নিবেদনটির উপসংহারে এইটুকু প্রত্যাশা রাখি,—আমার এই সামান্য গ্রন্থ-মধ্যে লিখিত বক্তব্য একজন পাঠককেও যদি কবিগুরুর মূল রচনা পাঠের প্রতি আগ্রহী ও উৎসাহী করে তুলতে পারে, তাহলেই নিজের এই পরিমিত জীবনের অকিঞ্চিৎকর শিক্ষা ও সাধনা চরিতার্থ হয়েছে বলে জ্ঞান করব।

৯ এপ্রিল ১৯৭৩
"নবায়ন"
১৬বি, ঝিল রোড
কলিকাতা-৭৫

কিরণশশী দে

॥ দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি ॥

গুরুদেবের গান প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রকাশের একটা নৈতিক কর্তব্য ছিল,—সেই কর্তব্যপালনের প্রয়াসে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতসুষমা' রচনায় হাত দিয়েছিলাম ১৩৭৩ সালে। গ্রন্থটি প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্য এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী বহুজনের স্বতঃপ্রণোদিত স্বীকৃতি লাভ করেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ একে পাঠ্যতালিকা ভুক্ত করেছেন,—বাংলার এবং বাংলার বাইরের একাধিক অনুমোদিত সঙ্গীত-শিক্ষাকেন্দ্রেও এই 'রবীন্দ্রসঙ্গীতসুষমা' পাঠ্যপুস্তকরূপে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে, তা-ছাড়া সাধারণ পাঠকেরাও আনন্দ পেয়েছেন এই বই পড়ে। ইত্যাকার নানা কারণে প্রথম সংস্করণটি অচিরে নিঃশেষিত হওয়ায় এবার এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে উৎসাহ বোধ করছি।

নূতন করে এর বিজ্ঞপ্তি না-লিখলেও চলতো,—তবু প্রাসঙ্গিকবোধে এইটুকু লিখি, যে, ইতোমধ্যে কোনো কোনো সহৃদয় চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতসুষমা' গ্রন্থে উল্লেখিত প্রবন্ধগুলি নিয়ে সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনার সুযোগ আমি পেয়েছি। ফলে আমার পূর্বেকার লিখিত বক্তব্যাদির মধ্যে কোনো কোনো স্থলে অধিকতর স্পষ্টতা আনবার জন্যে যে ঈষৎ পরিমার্জনের প্রয়োজন আছে—তা অনুভব করেছি। তাই উক্ত হিতৈষীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে—এই দ্বিতীয় সংস্করণের জায়গায়-জায়গায় কতক সংশোধন করা হল। এর দ্বারা দ্বিতীয় সংস্করণটি শুধু সংশোধিত নয়,—বেশ কিছু পরিবর্ধিতও হয়েছে অনিবার্যভাবে।

সঙ্গীত-প্রসঙ্গ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য আরো নানা বিষয় দিয়ে এবারের গ্রন্থটিকে তথ্যসমৃদ্ধ করে তোলবার চেষ্টা করেছি। তাই আশা করি 'রবীন্দ্রসঙ্গীত-সুষমা' প্রথম সংস্করণের চেয়ে দ্বিতীয় সংস্করণের আদর হবে অনেক বেশি।

উপসংহারে জানানো দরকার,—রবীন্দ্রসঙ্গীতসুষমার বর্তমান সংস্করণের প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর দে এবারের গ্রন্থটি যথোচিত যত্ন সহকারে প্রকাশ করে যেমন লেখকের তেমনি সংশ্লিষ্ট পাঠক-পাঠিকা সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন;—বিশেষত আমি এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপটের রঙিন আলেখ্যটি এঁকে দিয়ে পূজনীয় গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের যে সামান্য সুযোগ পেয়েছি তজ্জন্য নিজেকে কৃতার্থ বোধ করি। বলাবাহুল্য প্রকাশক মহাশয়ের সৌজন্যস্নিগ্ধ আনুকূল্যেই এটি সম্ভব হল।

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ — কিরণশশী দে

যাদবপুর

উৎসর্গ

স্বর্গত পিতা কৈলাসচন্দ্র দে

[জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩–বৈশাখ ১৩৬৯]

ও

স্বর্গতা মাতা সুষমাবালা দে'র

আষাঢ় ১৩০০–আষাঢ় ১৩৭৮ ।

স্মৃতির উদ্দেশে

রবীন্দ্রসঙ্গীতসুষমা-সূচীপত্র

ঠাকুরপরিবারে সাঙ্গীতিক পরিবেশ

আজ আমাদের, ঘরে-ঘরে সংগীতের চর্চা হচ্ছে—অন্তত, সংগীতবিদ্যালয়েব কোনো অভাব নেই। তেমনি শিক্ষার্থীদের ভিড়ও অসম্ভব। অথচ এখানে, এই বিংশ শতাব্দীরই প্রথমাংশের সাঙ্গীতিক আবহাওয়া ছিল অন্যরকম। কালেভদ্রে সংগীত-বিদ্যালয় কোথাও পাওয়া গেলেও খুব অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীরা এসে সেখানে যোগ দিতেন। এরও অনেক বৎসর কাল আগে অর্থাৎ বিগত উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—এমন কি তার মাঝামাঝি সময়েও শোনা যায়,—এতৎদেশে যখন সংগীতবিদ্যালয় বলে প্রায় কিছুই ছিল না, সেই তখনকার দিনে—সঙ্গতিপন্ন সম্ভ্রান্তশ্রেণীর লোকেরা নিজেদের বাড়িতেই বেশ জাঁকজমক সহকারে সংগীতের চর্চা করতেন। সেখানে গায়ক এবং শ্রোতা উভয়কেই সংগীতশাস্ত্রেব প্রথাসম্মত সংগীতপ্রবণতা দেখাতে না পারলে তা সম্মানী পরিবারের কাছে অশিক্ষার লজ্জাকর ব্যাপাব বলে গণ্য হত। এর ফলে সাধারণের মধ্যে এই সংগীতবিদ্যার সহজ প্রচারে বাধা ছিল বিস্তর। উপরে কথিত বিশ-শতকের গোড়াকার পরিস্থিতিটা সম্ভবতঃ এরই প্রতিক্রিয়া। (সকলে এই বিদ্যা আজকের দিনের মত এত অনায়াসে শিখতে পারতেন না কিংবা শিখবাব সুযোগ পর্যন্ত পেতেন না বলেই মুখে মুখে এমন প্রবাদও গড়ে উঠেছিল যে,—গান-বাজনা কেবলমাত্র ওই সঙ্গতিপন্নদেরই একচেটে বিলাসিতার অঙ্গবিশেষ—আর নয়ত নিজ আভিজাত্যের তথা, বংশমর্যাদার পরিচায়ক।

কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি—প্রিন্স দ্বারকানাথের (১৭৯৪-১৮৪৬) সময় থেকেই ধনে, মানে, যশে, ঐশ্বর্যে, চরিত্রে, রূপে, গুণে সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলে সুপবিচিত। "প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের কোন চিন্তা, কোন অনুভূতিই এই বাড়িতে অপাংক্তেয় ছিল না। তিলক-কাটা নামাবলী-পরা চিন্তা ছাড়া আর সব বর্জনীয়—এই ধরনের উগ্র সংকীর্ণতা এ-বাড়ির অবহাওয়াকে যেমন কখনো বিষিয়ে দেয়নি, ঠিক তেমনি সমুদ্রের ওপার থেকে যা-কিছু এসেছে তার মূল্য যাচাই না করে নির্বিচার গ্রহণ, এই মেরুদণ্ডহীন চিন্তার ক্লীবত্ব এ-বাড়ির বায়ুমণ্ডলকে কলুষিত করেনি। ভারতবর্ষের বৃহৎ ধারণার সম্বন্ধে যেমন শ্রদ্ধা ছিল, পাশ্চাত্যের বৃহৎ ভাবসম্ভারের প্রতি তার চেয়ে কম শ্রদ্ধা ছিল না। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকে পাশ্চাত্যেব সঙ্গে

প্রাচ্যের মালাবদল ঘটে গিয়েছিল জোড়াসাঁকো-বাড়ির প্রাঙ্গণে"—(যাত্রী, পৃ ১)। সেখানেও আমরা দেখতে পাই, সঙ্গীতের চর্চা—উপরে বর্ণিত নীতিতে হয়ে আসছিল। দ্বারকানাথের 'বেলগাছিয়া-ভিলা' নামে বাগানবাড়িটি ছিল সেদিনকার কলকাতার একটি বড় আকর্ষণ। দেশী-বিদেশী বহু ধনবান ও প্রতিষ্ঠাবান লোকেরা প্রায়ই ঐ 'ভিলায়' নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। তখন সেখানে নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনার উপযোগী আহার ও নৃত্যগীতাদির ব্যবস্থা থাকত। উদ্যোক্তা অবশ্য দ্বারকানাথ। তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় দেশেরই যাবতীয় শুভ আচার-বিচারের প্রতি সমান মনোযোগী ছিলেন। উক্ত নৃত্য-গীতের উৎসবগুলি কখন-সখন যদিও বিবিধ কারণবিশেষে তাঁর বেলগাছিয়া-ভিলায় পাশ্চাত্য-রীতি অনুসারেই পরিচালিত হ'ত, তা'হলেও এর মধ্যে ছিল কিছুটা বৈশিষ্ট্য। সঙ্গীতের উপর সেই বৈশিষ্ট্যের ধারা সুপরিলক্ষিত হয় তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথের আমল থেকে। কিন্তু এর আগে জেনে রাখা দরকার, "সমাজের সমস্ত কুসংস্কারের গ্লানি থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করবার কাজে দ্বারকানাথ ছিলেন রামমোহন রায়ের অন্যতম সাথী। সতীদাহের বিরুদ্ধে তিনি রামমোহন রায়ের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন। শবচ্ছেদ যখন হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল তখন এই কুসংস্কার দূর করবার জন্যে যে-হিন্দু শবচ্ছেদ করবে মেডিকেল কলেজে, তাকে অর্থ পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করেন। শিক্ষাবিস্তারের জন্যে তাঁর অকুণ্ঠিত দানের পরিচয় তখনকার প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে পাওয়া যাবে। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে তাঁহার যাতায়াত ছিল। সমুদ্রযাত্রার সম্বন্ধে [সেকালের] প্রচলিত হিন্দু ধারণা তাঁকে বিচলিত করে নি"—(যাত্রী, পৃ ২)। প্রিন্স দ্বারকানাথ বিদ্যায় বুদ্ধিতে যেমন অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ ছিলেন—তেমনি সেযুগে তাঁর মত বড় ধনী এবং দয়ালু দাতাও আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁর এই ব্যক্তিত্বের গুণে শুধু ভারতবর্ষ থেকে নয়—সমগ্র য়ুরোপ থেকেও প্রচুর সম্মান পেয়েছিলেন তিনি। য়ুরোপের তদানীন্তন বিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে প্যারিসে। প্রিন্স দ্বারকানাথের চিত্তলোকে সঙ্গীত-পিপাসা যে কত অন্তরঙ্গভাবে প্রসারিত ছিল সে কথা বোঝাতে গিয়ে ম্যাক্সমুলার এক জায়গায় বলেছেন: "সঙ্গীতের ব্যাপারে দ্বারকানাথ ছিলেন তদ্‌গত প্রাণ, এমন কি ফরাসী ও ইটালীয় সঙ্গীতেও তাঁর দখল ছিল। একদিন আমায় নিয়ে তিনি পিয়ানোর কাছে এগোলেন। দেখি, কেবল যে তাঁর গলার স্বর সুমিষ্ট তা নয়,—শুনলেই বোঝা যায়, সঙ্গীতে রীতিমত তালিম নেওয়া গলা তাঁর।…তিনি গান করতেন আর আমি সেই গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজাতাম- এইভাবে আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দে কেটে যেত।" বস্তুতপক্ষে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন দ্বারকানাথ। তা'ছাড়া গণ্যমান্য সঙ্গীতশিল্পীদেরও যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন তিনি। তাঁরই এই সংগীতপ্রীতির

ঐতিহ্যধারা প্রথমে পুত্র এবং পরে পৌত্রদের মধ্যে সংক্রমিত হয়ে কী ভাবে যে ক্রমে ক্রমে সর্বভারতীয়-স্বীকৃতি পেয়েছে—সেই ছবিটাই আমরা এবার আলোচনা প্রসঙ্গে দেখতে পাব।

"প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের যুগের অবসানে যে যুগ শুরু হল, সেই যুগে পারস্য-আরব্যের ইসলামীয় সংস্কৃতি, ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞান-সম্পদ ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা, এই তিন সুগভীর চিন্তাধারার ত্রিবেণী-সঙ্গম হল জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে এই তিন ধারার সমন্বয় আমরা দেখতে পাই"—(যাত্রী, পৃ ৩)। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫) ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র। তাঁর ঐকান্তিক উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ি পরবর্তী যুগে লক্ষ্মী-সরস্বতী সম্মেলনের লীলাভূমিতে রূপান্তরিত হয়। আর এ-কথা তো অনেকেরই জানা যে, দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই বিপুল রাজসিক ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রতিপালিত হন। সাংসারিক নানা গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁর সব কিছু গুণকে ছাপিয়ে উঠেছিল তাঁর অগাধ ঈশ্বরভক্তি। সংসারী এবং ত্যাগীর এক অপূর্ব সমন্বয় ছিল তাঁর জীবন। তাই তিনি জনসমাজে 'মহর্ষি' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁর সংগীত-মনের প্রসারতায় তাঁর পিতৃবন্ধু যুগগুরু রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাব ছিল অনেকটা; আর বস্তুতপক্ষে রাজা রামমোহনের একনিষ্ঠ অনুগামী তো দেবেন্দ্রনাথই।

এখানে দেবেন্দ্রনাথের আদর্শপুরুষ রাজা রামমোহন সম্পর্কে অতি সামান্যই বলছি প্রসঙ্গোচিত বিবেচনায়, এবং এই সূত্র ধরে জ্ঞানপিপাসুরা ভবিষ্যতে আরো গভীরে প্রবেশের সুযোগ পাবেন,—সে-বিশ্বাস নিয়েও। তাছাড়া সত্যি বলতে কি—তথ্যের এ সামান্যটুকুই যদি অজানা থেকে যায়, তাহলে জোড়াসাঁকো-ঠাকুরপরিবারে সাঙ্গীতিক পরিবেশ সৃষ্টির আসল পটভূমি চিহ্নিত করার কাজটা কিন্তু কোনো জিজ্ঞাসুপাঠকের পক্ষেই অভ্রান্ত হবে না কিছুতে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, রামমোহন রায় বয়সে দ্বারকানাথের চেয়ে ২০।২১ বৎসরের বড়ো ছিলেন।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রায় শুরুতে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। তার বছর কয়েক আগে মুসলমান রাজত্বের অবসান ঘটেছে মাত্র। দেশের ওস্তাদ সঙ্গীতজ্ঞ মহলে সেই সময় পর্যন্ত গায়কদের তাৎকালিক আদর্শানুযায়ী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতাদির চর্চা যদিচ বহুল পরিমাণেই রক্ষিত হয়ে আসছিল তবু, সেই সঙ্গীত যে ঈশ্বর-উপাসনার কাজেও (যেমন হত প্রাচীনতম ভারতে বৈদিকযুগে—তেমনি) ব্যবহৃত হতে পারে সেই বোধটা অনেক গায়ক প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলেন কোনো-না-কোনো বিপর্যয়ে;—এর প্রমাণ সঙ্গীয় অনুবর্তী ঘটনা থেকে কিছু আন্দাজ করা যায়।

হিন্দু-ধর্মসংস্কারের উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন যে আলোচনা-সভার সূত্রপাত করলেন

সেটা 'ব্রহ্মসভা' নামে কলকাতা শহরের কোন এক নির্দিষ্ট জায়গায় বসত। সাধারণত ভক্ত বিদ্বান জ্ঞানীরা, অনেকটা রাজার অনুরোধে, সেখানে একত্রে মিলে, ব্রহ্ম তথা ঈশ্বর-তত্ত্ব কথা নিয়ে আলোচনা করতেন। সেখানে প্রথম প্রথম শুধু তত্ত্বালোচনা ও ব্রহ্মের উপাসনাই হত। 'ব্রহ্মসভা' পরবর্তীকালে 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হল। এই সমাজে বিশেষ করে সঙ্গীতের সহায়তায় উপাসনা করবার প্রথাটি প্রবর্তন করলেন রাজা রামমোহন। একদিন তিনি যখন বললেন যে, "ভাল ভাল গায়ক সকল সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত দিলে ভাল হয়, —অমনি গুণী গায়ক সকল সেখানে একত্রিত হইলেন এবং নানা ভাবের সঙ্গীত চলিল। রামমোহন রায় বলিলেন, ওসব কেন? 'অলখনিরঞ্জন' গাও। তখন সেই অবধি ব্রহ্মসঙ্গীত হইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে এইটুকুও তখন কাহারো বুঝ ছিল না যে, ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত গাইতে বলিলে ঈশ্বরের সঙ্গীত গাইতে হইবে"—(মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পৃ ১৬৯)। এই তথ্যসংবলিত মন্তব্যটুকু আমরা পাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রদত্ত কোনো এক বক্তৃতা থেকে।

ব্রহ্মসঙ্গীতের উৎপত্তি

ঠিক এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনও তাঁর 'যুগগুরু রামমোহন' নামীয় পুস্তিকার ১১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "সামাজিক উপাসনা ছাড়া যে সামাজিক সংহতি হয় না, ইহা রাজা বুঝিয়াছিলেন। তাই সমবেত উপাসনা তাঁহার এত কাম্য ছিল। রাজার সমাজে যে ব্রহ্মসঙ্গীত গান হইত তাহার প্রথম রচয়িতাও স্বয়ং রাজা;—এই যুগে ব্রহ্মসঙ্গীতের আদি রচয়িতার সম্মানও রাজারই প্রাপ্য। এই ব্রহ্মসঙ্গীতের উৎকর্ষ হইল রবীন্দ্রনাথের ভক্তি-সঙ্গীতে।"

রবীন্দ্রনাথের ভক্তি-সঙ্গীতের কথাটা অবশ্য আরও অনেক পরে আলোচ্য।

তবে এই জায়গায় আমরা ব্রহ্মসঙ্গীতের আদিরচয়িতার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখব, রাজা রামমোহন রায় যে-সব ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করে গেছেন সেগুলি ছিল তাঁর স্বকীয় অবদান—সে যুগের বাংলা ভাষায় প্রায় একেবারে নতুন জিনিস। যথা,—স্মর পরমেশ্বরে অনাদিকারণে॥ ভাব সেই একে॥ অনিত্য বিষয় কর সর্বদা চিন্তন॥ দম্ভভাবে কত রবে, হও সাবধান॥ একদিন যদি হবে অবশ্য মরণ॥ মনে কর শেষের সে-দিন ভয়ংকর॥ নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ॥ বিগতবিশেষং জনিতাশেষং—ইত্যাকার সংস্কৃত শব্দবহুল নির্গুণব্রহ্মের স্তুতিগুলি গান হিসাবেই তিনি লিখেছিলেন, এবং শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের উপর আধিপত্য থাকায় তাঁর রচিত ঐ সকল গান হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের অনুরূপ পদ্ধতিতে সমাজে গাইবারও নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনিই।

রাজা রামমোহনের ব্রহ্মসভা গঠনকালে দেবেন্দ্রনাথ মাত্র ১১ কি ১২ বৎসরের বালক। পড়তেন রাজার স্কুলে,—একই গাড়িতে করে রাজার সঙ্গে যাতায়াত করতেন, রাজাকে দেবতার ন্যায় সমীহ করতেন। এসব কারণে রামমোহনের বিরাট ব্যক্তিত্বের

সঙ্গে তাঁর ধর্মসম্বন্ধীয় চিন্তাধারাও বালক দেবেন্দ্রনাথকে কৌতূহলী ও আকৃষ্ট করে তোলে—নিজের অজান্তে। রামমোহন দেহত্যাগ করলেন ১৮৩৩ সালে বিলেতের ব্রিষ্টল শহরে। তখনও দেবেন্দ্রনাথ বালকই—বয়স কমবেশি ১৬। সবাই জানেন, দেবেন্দ্রনাথের পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ছিলেন রাজা রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিন্তু তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন না। তাহলেও রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব কিন্তু অনেকাংশে রক্ষিত হচ্ছিল দ্বারকানাথেরই বদান্যতার ফলে। উক্ত সমাজে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন দ্বারকানাথ। রাজার মৃত্যুর নয় বৎসরকাল বাদে দ্বারকানাথ যখন বিলেত যান তখন ঐ ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ।

আলোচ্য-প্রসঙ্গের শুরুতেই বলা হয়েছে—বিপুল ভোগবিলাস ও ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করেও দেবেন্দ্রনাথ মূলত ছিলেন ধর্মকাম। তদুপরি পিতার অকৃপণ দাক্ষিণ্যে তরুণবয়সে ওস্তাদের অধীনে সঙ্গীতানুশীলনের যে সুযোগ পেয়েছিলেন তাও ছিল তাঁর ধর্মচর্চার সহায়ক। দ্বারকানাথ কিন্তু বরাবরই নিজগৃহে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে তথা রাজসিক রীতিতে হিন্দুর বিবিধ পূজাপার্বণাদি পালন করতেন, অথচ তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথের মন বাল্যাবধি রাজা রামমোহন-গঠিত ব্রাহ্মসমাজের রীতিনীতির প্রতি নিবিড়ভাবে প্রণত ছিল। এ-বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ নিজেই পরিণত বয়সে তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন: "ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইলে পর আমি মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া তথায় যাইতাম।" উল্লেখ বাহুল্য যে, সেখানকার গায়কদের পরিবেশিত সঙ্গীতসমূহও তাঁর ধর্মচেতনা বিকাশের বিশেষ অনুকূল ছিল। সে যাই হোক—দ্বারকানাথ বিলেত চলে যাবার পর দেবেন্দ্রনাথ যখন প্রকাশ্যভাবেই ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন, তখন থেকে সমাজের সঙ্গীতানুষ্ঠানের হল শ্রীবৃদ্ধি—এবং এর গায়কেরাও দেবেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে নূতন প্রেরণা লাভ করতে লাগলেন।

দেবেন্দ্রনাথ নিজে গায়ক নামে খ্যাত ছিলেন না বটে, কিন্তু বাংলায় এবং সংস্কৃতে রচিত ধর্মবিষয়ক একাধিক গান তাঁর পাওয়া যায়। যেমন,—কারণ সে যে, তাঁর ধ্যান কর॥ কেন ভোল, ভোল চিরসুহৃদে॥ পরিপূর্ণমানন্দম্॥ তং পরং পরমেশ্বরং॥ দেহ জ্ঞান দিব্য জ্ঞান—প্রভৃতি। সেগুলিতে আবার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতানুরূপ অনেক ভারী-ভারী ঢং-এর রাগরাগিণী এবং তালাদিও আরোপ করেছেন নিজে—যা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, দেবেন্দ্রনাথ যে কেবল ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের একজন বিশেষ অনুরাগী বোদ্ধা ছিলেন তা নয়, তিনি এর ভিতরকার মূল ভাবটিকে (Spirit-কে) ধরে এনে আপন করে নেবার রসও খুঁজে পেয়েছিলেন নিজের গভীর অন্তর্দৃষ্টির গুণেতে—যা অন্যেরা উপলব্ধি করেছেন বহুকাল পরে। আর সঙ্গীতের বাইরের formটা যে অনেক আগেই তাঁর আয়ত্তে এসেছিল—সে কথার উল্লেখ তো বাহুল্য মাত্র। এ-ছাড়া তাঁর নাতি অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' নামক গ্রন্থটি পড়লে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু তথ্য আমরা পাই;

সেই গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠায় লেখা : "কর্তাদাদামশায়ের কালোয়াতি গান শেখবার শখ ছিল···· তিনি নিজেও আমাদের বলেছিলেন, আমি পিয়ানো শিখেছিলুম ছেলেবেলায় সাহেব মাষ্টারের কাছ থেকে তা জানো !"

প্রসঙ্গত এখানে বলা চলে যে, বাংলার সঙ্গীতে নিশ্চয়ই কোন অনির্দিষ্টকাল থেকে স্বকীয় বিশেষত্বে মণ্ডিত একটা রূপ ছিল এবং আজও আছে—সঙ্গীতের ইতিহাস আরো গভীরভাবে অনুশীলন করলে তার সঠিক বিবরণ পাবার সম্ভাবনা। কিন্তু ভারতীয় উচাঙ্গসঙ্গীতের কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে তাকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে সহজে, সরসে এবং সপ্রেমে নিজের সাংস্কৃতিক অভিরুচি মত রূপ দিয়ে দেশ ও কালোপযোগী করে প্রকাশ করবার প্রচেষ্টা বোধকরি দেবেন্দ্রনাথেরই প্রথম। তাঁর পুরোবর্তী রামমোহন-কৃত সঙ্গীতের ভিতর ছিল অনেকটা ক্লাসিক রীতির অনুবর্তন। দেবেন্দ্রনাথ এখানে যদিচ সেই অনুবর্তন থেকে ধীরে ধীরে মুক্তির পথ বের করে নিলেন; তবুও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের স্বীকার করতে হবে, যে, তাঁর সঙ্গীত রচনার ভাবধারা তাঁর আদর্শপুরুষ মহাত্মা রামমোহনেরই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এবং এই বিশেষ রীতিতে জোড়াসাঁকো-ঠাকুরপরিবারে সম্ভবত—প্রথম সঙ্গীতরচয়িতাই হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কারণ, তাঁর পিতা দ্বারকানাথ সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন বটে, গান করতেনও নিজে—কিন্তু গান লিখেছেন বলে তেমন খুব জানা যায় না।

দেবেন্দ্রনাথের বয়স যখন ২৯ তখন তাঁর পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যু হয় বিলেতে ১৮৪৬ সালে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, যে-দেবেন্দ্রনাথ অতি বাল্যকালে বিরাট পুরুষ রামমোহনের একটুখানি মাত্র সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, তিনিই কিনা পরিণত বয়সে নানা বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়ে রামমোহনের প্রারব্ধ কর্মধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান রামমোহন যেমন চাইতেন, সমাজে ধর্মবিষয়ক উচ্চমানের সঙ্গীত অনুশীলিত হউক, এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ তেমনি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপাসনার অঙ্গ হিসাবে সঙ্গীতকে সঙ্গে সঙ্গে সমমর্যাদায় সঞ্জীবিত করে তোলেন। দেশের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ গুণী গায়কদের সম্ভব হলেই দেবেন্দ্রনাথ সাদরে ব্রাহ্মসমাজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কিংবা তাঁদের নিযুক্ত করেছেন নিয়মিত সঙ্গীতানুষ্ঠানের কাজে। এমনি করে ক্রমশঃ একদিন তাঁর পারিবারিক সঙ্গীতচর্চাও এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে গাঁথা হয়ে যায়। অর্থাৎ, দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের গুণী গায়কদের তাঁর জোড়াসাঁকো নিজ ভবনেও গান গাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে লাগলেন এবং কারুকে কারুকে নিযুক্ত করলেন পারিবারিক সঙ্গীতশিক্ষক রূপে। দেবেন্দ্রনাথেরই এমনতর ঐকান্তিক উৎসাহে তাঁদের জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি অবশেষে সঙ্গীতচর্চার একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়—বিশেষ করে এই কলিকাতা নগরাঞ্চলে। ভারতের নামকরা উত্তম সঙ্গীতজ্ঞ গুণীরা এসে সেখানে যোগ দিতে থাকেন।

মহর্ষির সাদর আমন্ত্রণে সেই সময়কার বাংলার বিখ্যাত গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদুভট্ট,

রাধিকা গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিশ্র এবং বরোদার মৌলাবক্স প্রমুখ গুণিজনেরা জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে থেকে সঙ্গীতের অনুপ্রচারে যত্নবান ছিলেন বলে জানা যায়।...এসব ছাড়াও নিজের বাড়ীর ছেলেমেয়েদের অন্তর যাতে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের রসে ছোটবেলা থেকেই যথাযথ শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে সেই দিকেও দেবেন্দ্রনাথের সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাঁর পুত্রগণমধ্যে—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এঁরা তো ওস্তাদদের আওতায় থেকে থেকে রীতিমত হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন ; 'গীত-রচয়িতা' বলেও খ্যাতি আছে ওঁদের।

এখানে উল্লেখ্য,—এ বিরাট বঙ্গভূমিতে কিন্তু তখন কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবার নিজ বাড়ীর মেয়েদের গানবাজনা চর্চার পক্ষপাতী ছিলেন না মোটেই। অথচ দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেদের গান শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মেয়েদেরও ঐ বিদ্যায় অভিষিক্ত হবার সুযোগ দিয়েছিলেন প্রচুর। আজ একথা কেই বা না জানে, যে প্রকাশ্য সভায় সংগীতাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবার কাজে তৎকালীন অখণ্ড বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত সমাজে কলিকাতা জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারের মেয়েরাই ছিলেন অগ্রণী।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা এবং সঙ্গীতপ্রীতির অ-সাধারণত্ব সম্পর্কে তাঁর মেজছেলে সত্যেন্দ্রনাথ নিজের 'বাল্যকথা'য় লিখেছেন: "ছেলেবেলায় আমরা বাবা-মহাশয়ের কাছে বড় ঘেঁসতাম না।...আমাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষার বেলায়। ব্রাহ্মধর্ম পড়াবার ভার তিনি নিজের হাতে নিয়েছিলেন। তাছাড়া প্রত্যহ আমাদের পারিবারিক উপাসনা হত সঙ্গীতে;—তাতে আমরা সকলে যোগ দিতুম"। মহর্ষির বড় মেয়ে সৌদামিনী দেবীও ১৩১৮ সালের ফাল্গুন-চৈত্রমাসের প্রবাসীতে তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে অনুরূপ আরেকটি চিত্র এঁকে জানিয়েছেন: "বাড়ির মধ্যে আমাদের প্রাত্যহিক উপাসনার একটি ঘর ছিল।...পিতা সকালে আসিয়া প্রথমে আমাদিগকে লইয়া সেই ঘরে উপাসনা করিয়া আমাদিগকে ব্রাহ্মধম পড়াইতেন,—কোনো কোনো দিন আমাদিগকে লইয়া গ্রহ-নক্ষত্রের বিষয় আলোচনা করিতেন। এইরূপে যে-সকল উপদেশ দিতেন, আমাদিগকে তাহা লিখিতে হইত।...তাঁহার আদেশ আমাদের পক্ষে দেববাক্য ছিল। ...বুধবারে সমাজে উপাসনার পর ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ির দালানে যখন সকলে মিলিয়া গান ধরিতেন 'সবে মিলে মিলে গাওরে, তাঁর পবিত্র নাম',—তখন কী উৎসাহে আনন্দেই না আমাদের মন উদ্বোধিত হইয়া উঠিত,...বাড়ির দালানে রাত্রিতে উপাসনা-সভা বসিত—তখন আমরা ছেলেমানুষ—কিন্তু উপদেশে, গানে, বক্তৃতায় ঈশ্বরের প্রেমরসে মানুষের মন যে কেমন করিয়া অভিষিক্ত হইত তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই।"

বিক্ষিপ্তভাবে পরিবেশিত ইত্যাকার উক্তিগুলি আগ্রহসহকারে পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার বোঝা যায়, রাজা রামমোহন রায়-প্রবর্তিত ধর্মসভা ও উপাসনার সুযোগ্য

উত্তরাধিকারী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অভিভাবকত্বে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গীতচর্চার ভিতর ব্রহ্ম-মন্ত্রের যে বীজ একদা উপ্ত হয়েছিল—তা থেকেই আসল অংকুরের উদ্‌গম এবং সেই অংকুর পরবর্তীকালে মহর্ষির সন্তানসন্ততিদের মধ্যেও স্বাভাবিক রীতিতেই নানা রূপ নিয়ে ফলে-ফুলে-পল্লবে বিকশিত হয়ে ওঠে। সহজ ব্যাবহারিক ভাষায় বলা চলে,—গানবাজনা এ-বাড়িতে আর এতদ্দেশীয় অন্যান্য সঙ্গতিপন্নদের মতন নিছক বড়মানুষী শৌখিনব্যাপার রইল না। শুধু শুধু প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে সঙ্গীতের সুর-তাল-মান নিয়ে নয়,—মানব-ধর্ম বিকাশের অনুকূলে গভীর তত্ত্বকথাদি নিয়েও জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়িতে উচ্চমানের শুভ্র সুরুচিপূর্ণ সাঙ্গীতিক পরিবেশটি গঠন করলেন কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, এবং কালক্রমে এরই সার্থক রূপদানে ব্রতী হলেন তাঁর পুত্রকন্যাগণ—নিজ নিজ প্রতিভার দীপ্তিতে—সে প্রসঙ্গ পরে যথাস্থলে আলোচনা করা যাবে।

তবে বর্তমান অধ্যায়ের উপসংহারে এইটুকু বলি, খানিক আগে উল্লেখিত হয়েছে—তৎকালীন প্রখ্যাত সঙ্গীতবিদ বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদুভট্ট প্রমুখ গুণিজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাড়ির গায়ক হয়ে এসেছিলেন। এঁদের সান্নিধ্যে এসে দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিকগণ যখন নানা রকম হিন্দী বা অন্যান্য বিচিত্র ধরণের গান থেকে সুরাদি আহরণ করে বাংলাভাষায় সঙ্গীত-রচনার নূতন নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন, আর তাঁদেরই স্বরচিত গান দিয়ে বাড়ির যাবতীয় উৎসব-উপাসনাদির কাজ সাধিত হচ্ছিল—সঙ্গে সঙ্গে জনগণেরও তেমনি অবকাশ মিলছিল ঐ একই রসে তাদের চিত্তাকাশ রস-প্লাবিত করে নেবার,—মোটকথা গান-বাজনার নির্মল আবহাওয়ায় ঠাকুরবাড়ি যখন পূর্ণমাত্রায় পবিত্র ও আমোদিত—সেই সাঙ্গীতিক পরিবেশের মধ্যেই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশের প্রথম ভাগে বঙ্গমাতার ক্রোড়ে এসে আবির্ভূত হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে সঙ্গীতের প্রভাব ও তাঁর গুরুপরম্পরা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন: "আমাদের পরিবারে গানচর্চার মধ্যেই শিশুকাল হইতে আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না।...বাল্যকালে গাঁদাফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলায় অনুকরণের আর-আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন ছিল, কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না। এই খেলায় ফুল দিয়া সাজানো একটা টেবিলের উপরে বসিয়া আমি উচ্চকণ্ঠে 'দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে' গান গাহিতেছি, বেশ মনে পড়ে।" আবার অন্যত্র বলেছেন: "আমাদের বাড়িতে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের খুব চর্চা হত সে কথা তোমরা সবাই জানো। অথচ আশ্চর্য্য, এবাড়ির ছেলে হয়েও আমি কোনদিনও ওস্তাদিয়ানার জালে বাঁধা পড়িনি। আড়ালে-আবডালে থেকে যেটুকু শুনেছি

সেটুকুই আমার শেখা। বারান্দা পার হতে গিয়ে কিংবা জানালার ওপাশে বসে থাকার-কালে যে-সব সুর ভেসে আসতো কানে, সেগুলোই মনের ভিতর গুঞ্জরণ করে ফিরত প্রতিনিয়ত। তার থেকেই পেয়েছি আমি গানের প্রেরণা"—(তীর্থঙ্কর, পৃ ১৫০)।

কবিগুরুর এই উক্তিগুলির যথার্থ তাৎপর্য গভীর ভাবে অনুধাবন করে সারাক্ষণ মনেতে এঁকে রাখা—রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার্থী এবং আলোচনাকারী মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজন,—বিশেষ করে এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে 'প্রভাব' শব্দটি যে কোন্ বা কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—সেটা উপলব্ধি করার জন্যেও আরো।

রবীন্দ্রনাথ খুব ছেলেবেলা থেকেই তাঁর অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং সোমেন্দ্রনাথ এই বিশেষ কয়জনকে* ওস্তাদ গায়ক শিক্ষকদের অধীনে যথানিয়মে সঙ্গীত-অনুশীলন করতে দেখেছেন, সুতরাং এঁদের সাঙ্গীতিক প্রভাব রবীন্দ্রমানস গঠনেও যে স্বাভাবিক রীতিতে বেশ কিছুটা সাহায্য করেছিল তা বললে ভুল হবে না। সেই বিবেচনায় উল্লিখিত রবীন্দ্রাগ্রজদের বিষয়ে মোটামুটি ভাবে এখানে কিছু আলোচনা করা সমীচীন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬): মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র। বহুমুখী ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি। নানা শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথ বলেন: "বড়দাদার কবি-কল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এইজন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন। সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গ-সাহিত্যের একটি সাজি ভরিয়া তোলা যাইত।...তাঁহার তখনকার এই কাব্য-রসের...সব কি আমরা বুঝিতাম! কিন্তু লাভ করিবার জন্য পুরাপুরি বুঝিবার প্রয়োজন করে না। সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কি না জানি না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না, কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম; তাহারই আনন্দ-আঘাতে শিরা-উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত"—(জীবনস্মৃতি পৃ ৬৮)। অন্যত্র বলেছেন: "বড়দাদার একটি অভ্যাস ছিল চোখে পড়বার মতো, সে তাঁর সাঁতার কাটা। পুকুরে নেমে কিছু না হবে তো পঞ্চাশবার এপার-ওপার করতেন। পেনেটির বাগানে যখন ছিলেন তখন গঙ্গা পেরিয়ে চলে যেতেন অনেক দূর পর্যন্ত। তাঁর দেখাদেখি সাঁতার আমরাও শিখেছি ছেলেবেলা থেকে।"—(রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ম খণ্ড, পৃ ১৫৯)

---

* প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞাতব্য,—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রকন্যাদি ছিলেন পনেরো জন। (১) কন্যাসন্তান (২) দ্বিজেন্দ্রনাথ (৩) সত্যেন্দ্রনাথ (৪) হেমেন্দ্রনাথ (৫) বীরেন্দ্রনাথ (৬) সৌদামিনী (৭) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (৮) সুকুমারী (৯) পুণ্যেন্দ্রনাথ (১০) শরৎকুমারী (১১) স্বর্ণকুমারী (১২) বর্ণকুমারী (১৩) সোমেন্দ্রনাথ (১৪) রবীন্দ্রনাথ (১৫) বুধেন্দ্রনাথ—[জীবনস্মৃতি: বংশলতিকা। পৃঃ ২৩৬]

যৌবনে দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বদেশীমেলার একজন বিশেষ উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁর মধ্যে ধর্মনিষ্ঠতা এবং স্বাদেশিকতা বিরাজিত ছিল পূর্ণমাত্রায়—যেমন ছিল তাঁর পিতৃদেবের মধ্যে। যদিও বিশিষ্ট গায়ক বলে দ্বিজেন্দ্রনাথের খ্যাতি ছিল না—তবু সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁর প্রতিভা ছিল অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'বড়দাদা বিলিতি বাঁশি বাজাতেন—কিন্তু সে গানের জন্য নয়, অঙ্ক দিয়ে এক-একরাগিণীতে গানের সুর মেপে নেবার জন্য'। বস্তুতপক্ষে বাঁশি, অর্গেন ইত্যাদি বাজাবার ভাল হাত ছিল তাঁর। আজ আমরা যে আকারমাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতি ব্যবহার করছি—এটা তৈরি করার পথ কিন্তু শোনা যায় দ্বিজেন্দ্রনাথই প্রথম দেখিয়েছিলেন; পরে অবশ্য একে পরিমার্জিত রূপ দিয়ে সর্বত্র প্রবর্তনেব উপযোগী করে তোলেন তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায়, শুধু কাব্যসাহিত্যে কিংবা নিছক সঙ্গীতকলায় নয় বিজ্ঞানের প্রতিও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন বলেই সঙ্গীত লিপিবদ্ধ কবার প্রণালী উদ্‌ভাবনার কাজে এতটা মন দেওয়া দ্বিজেন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। বহুগুণেব অধিকারী দ্বিজেন্দ্রনাথকে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, কবি, সঙ্গীতবিদ্ সবই বলা যেতে পারে। মোটামুটিভাবে আমরা দেখতে পাই,—দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও গীতকুশলতার মিলিত প্রবাহটি ক্রমে ক্রমে তাঁর অনুজ সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ—এঁদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল খুব স্বাভাবিক রীতিতেই। অতঃপর সর্বকনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথেব সঙ্গীতমানসের প্রস্তুতিপর্বও যে এই পটভূমির উপর নির্ভরশীল—একথা অস্বীকার করা যায় না। দ্বিজেন্দ্রনাথের চেয়ে ২০।২১ বৎসরের ছোট ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাহলেও বড়দাদার সঙ্গীতচর্চার রীতি বালক রবির মনে যে গভীর রেখাপাত করেছিল—সেটা ধরা পড়ে রবীন্দ্রনাথেব শেষ বয়সের উক্তিতে;—বলেছেন এক জায়গায়, যে, তাঁর বড়দাদা সেজদাদারা গান শিখতেন দরজা বন্ধ করে তানপুরা কাঁধে নিয়ে ওস্তাদ গাইয়েদের মতন। তিনি সেখানে যেতে পারতেন না—কী জানি তাঁদের সঙ্গীতচর্চায় যদি কোনো ব্যাঘাত ঘটে, কারণ নিজে তখন ছেলেমানুষ। তাহলেও দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পেতে যেটুকু শুনতেন—তাতেই তাঁর মনে থাকত সব। এমনি কবে বড়দাদা, সেজদাদাদের সঙ্গীত-অনুশীলনের ক্ষেত্রে একটি অংশ নিয়েছিলেন তিনিও।

জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়িতে মহর্ষির উৎসাহে তাঁর ছেলেদের ভিতর দেশীসঙ্গীতের চর্চা তো চলতই,—তা সত্ত্বেও বিলাতীসঙ্গীতকে জানবার শেখবার আগ্রহ একবার দেখা দিয়েছিল ওঁদের মধ্যে। পরিবারের বড় দুই ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ একাজে প্রথম উদ্যোগী হন। বাড়ির উপাসনাসঙ্গীতে বিলেতী 'অর্গেন' যন্ত্র বাজাবার নিয়ম প্রবর্তন করেন সত্যেন্দ্রনাথ। সে যন্ত্রটি দ্বিজেন্দ্রনাথও বাজাতেন,—পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। যখন তাঁদের বাড়িতে শখের থিয়েটার করার রীতি ছিল—সেখানে যে কনসার্ট বাজানো

হত তার গৎ তৈরি করে দিতেন তাঁদের সঙ্গীতশিক্ষক বিষ্ণু চক্রবর্তী। বেহালা, ক্ল্যারিওনেট, ঢোল, করতাল, বাঁয়া-তবলা এবং মন্দিরা এসব বাজানো হত তখন—হারমোনিয়ম সঙ্গত করতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। আর দ্বিজেন্দ্রনাথ অংশ নিতেন বিলেতী বাঁশি বাজাবার। রবীন্দ্রনাথের তখনও এসবে সক্রিয় অংশ নেবার মত বয়স হয়নি যদিও,—তবু তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি নিশ্চয় কখনও তা এড়িয়ে যেত না, ফলে তাঁর সঙ্গীতমানস, তাঁর জ্ঞাতে কিংবা অজ্ঞাতে এসবের দ্বারা কিছু না-কিছু প্রভাবিত তো হয়েইছিল।

এই সঙ্গীত-প্রসঙ্গ ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলবার আছে অনেক, কিন্তু এখানে স্থান সংকীর্ণ। তাঁর বিশেষ গুণাসক্ত ছিলেন দীনবন্ধু সি এফ্‌-এন্‌ড্রুজ, পিয়ার্সন সাহেব, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মনীষীরা। কিন্তু এত বড় হয়েও দ্বিজেন্দ্রনাথ আবার ছিলেন শিশুর মত আত্মভোলা। বনের পশুপাখী পর্যন্ত তার বশ মানত, তাঁর গায়ের উপর দিয়ে নির্ভয়ে হেঁটে চলে যেত কাঠবেড়ালি। মোটকথা দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বজীবপ্রিয়। তাঁর সৃষ্ট, সাহিত্যকাব্য বিশেষত অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত চিরআদরণীয়। তিনি লিখেছিলেন :

'কর তাঁর নাম গান—যতদিন রহে দেহে প্রাণ'!

তাঁর এই শাশ্বতবাণী সংবলিত গানটি আজও শান্তিনিকেতনে ভক্তিমিশ্রিত সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হতে শোনা যায়—বিশেষ করে পৌষ উৎসবে—সেখানকার মালতীলতায় আচ্ছন্ন ছাতিমতলাকে প্রদক্ষিণ করে।

সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩) : মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র। ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম সিভিলিয়ন্‌। তাহলেও তাঁর লেখনী থেকেই বেরিয়েছিল :

"মিলে সব ভারতসন্তান—একতান মনপ্রাণ—
গাও ভারতের যশোগান"

এমনিতর এক জোরালো জাতীয়সঙ্গীত এবং সেটাও সম্ভবত ভারতে ছিল সর্বপ্রথম। এই গান সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন : "এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। পূর্ব-পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক"—(বঙ্গদর্শন ১২৭৯, চৈত্র)। সে-যুগে উচ্চ রাজকর্মচারীর পদে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যে-সঙ্গীতে সত্যেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক অনুরাগ কখনও ক্ষুণ্ণ বা ব্যাহত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের জবানি থেকে জানা যায় যে, তিনি তখন শিশু, যখন তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ সিভিলিয়ন্‌ হয়ে দেশে ফিরেছেন। পরে ঐ মেজদাদারই উৎসাহে ১৭ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম বিলেত যান। প্রকৃতপক্ষে বহির্বাংলার ও বহির্ভারতের যাবতীয় কৃষ্টির সঙ্গে—রবীন্দ্রনাথের সেই বয়সে যোগাযোগের সূত্রপাত সত্যেন্দ্রনাথেরই প্রচেষ্টায়।

বিলেতে গিয়ে বিদেশীয় সংগীত শিখবার অনুপ্রেরণাটিও পান তাঁরই সাহচর্যে। তাছাড়া সিভিলিয়ানী কর্মে সত্যেন্দ্রনাথ যখন বোম্বাই-আমেদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে, তখন রবীন্দ্রনাথও ঐসব জায়গায় গিয়ে,—থাকতেন প্রায়ই। রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্প ও গান রচনার ইতিকথা সেই সময়কার স্মৃতিবিজড়িত।

সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-প্রীতি ছিল সুগভীর। নিজের যে একমাত্র কন্যাকে দেশী-বিদেশী গানে সুশিক্ষিতা করে তুলেছিলেন,—তিনিই ত হলেন পরবর্তীকালে স্বনামখ্যাতা রবীন্দ্রসঙ্গীত পারদর্শিনী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। সত্যেন্দ্রনাথ রচিত অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত আছে—সেগুলি হৃদয়স্পর্শী। তাঁর অনুজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়,—সত্যেন্দ্রনাথ রচিত গান লোকেরা খুব ভালবাসতেন, কেননা তাঁর রচনায় এমন একটা সহজ কবিত্ব ছিল এবং সুরের সঙ্গে ভাবের এমন একটা মাখামাখি ছিল যে তা সকল শ্রোতার মনকেই স্পর্শ করত। বাড়িতে আগত ওস্তাদ সঙ্গীতশিক্ষকদের কাছে—হিন্দীগান শুনে এবং শিখে সেই সুর ভেঙ্গে বাংলা ব্রহ্মসঙ্গীত লেখবার রীতি শুরু করেন সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম। অতঃপর কার্যোপলক্ষে বাংলার বাইরে চলে গেলে তাঁর গানরচনার এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এঁরা। পরে সর্বকনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথও আপনা থেকেই এঁদের আরব্ধ কাজে যোগ দিলেন, এবং অসাধারণ প্রতিভার গুণে হিন্দীভাঙ্গা ব্রহ্মসংগীত যে সব রচনা করলেন তা হয়ে উঠল সমগ্র বাংলার অপূর্বসম্পদ। অবশ্য এটা অনেক পরের ঘটনা—কিন্তু এর আগে, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে বেদমন্ত্রধ্বনির সাহায্যে উপাসনা এবং সঙ্গীতে যে ১১ই মাঘের উৎসব সম্পন্ন হত—তা রবীন্দ্রনাথ একেবারে বাল্যকাল থেকেই দেখে আসছিলেন। সেই উৎসব সাধারণত পরিচালিত হত—দ্বিজেন্দ্রনাথ নয়ত সত্যেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে। বালক রবীন্দ্রনাথকে সেখানে যোগ দেবার জন্য প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথও বোম্বাই অঞ্চলে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বসবাস করেছেন এবং সত্যেন্দ্রনাথের আনুকূল্যে সঙ্গীত শিল্পাদি চর্চার পেয়েছেন প্রচুর অবকাশ। সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ যত্ন নিয়েছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথকে সর্ববিষয়ে সুশিক্ষিত করে তোলার—সেই যত্ন তাঁর সার্থকও হয়েছিল। এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ইন্দিরা দেবী লিখেছেন: "জানিনে কোনসূত্রে কিন্তু বৃহৎ পরিবারের ভিতর ভাইদের মধ্যে রবিকাকা ও জ্যোতিকাকামোশায়ের সঙ্গে, এবং বোনদের মধ্যে স্বর্ণপিসীমার সঙ্গে বাবার বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল। জ্যোতিকাকামোশাই ছেলেবেলায় মা-দের সঙ্গে বোম্বে চলে যান এবং রবিকাকা তো বাবার সঙ্গেই বিলেত যান।"—(আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৬)।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে,—স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা এবং স্ত্রীজাতির সর্বপ্রকার

উন্নতির পক্ষপাতী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ,—এই আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসাবে তাঁর নামের সঙ্গে তাঁর সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নামটিও আমাদের স্মরণযোগ্য।

হেমেন্দ্রনাথ (১৮৪৪-১৮৮৪) : মহর্ষির তৃতীয় পুত্র। ইনি কিছুকাল মেডিক্যাল কলেজে পড়েছিলেন। সাহিত্য সঙ্গীতাদি চর্চায় তাঁর স্বাভাবিক অধিকার থাকলেও বিজ্ঞানের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা থেকে আমরা জানি, তাঁর অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথ প্রায় সব সময় সংস্কৃত কাব্য নাটকাদির আলোচনায় নিযুক্ত থাকতেন এবং আপনমনে সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করতে ভালবাসতেন, ফরাসী ভাষাও উত্তমরূপে শিখেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অপরিণত বয়সে হেমেন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হন। এই করুণসুরটি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র পৃষ্ঠায় এইভাবে ধরা আছে :

> "যখন চারিদিকে খুব কষিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে, তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,—সেই আমার স্বর্গগত সেজদাদার উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।"

বস্তুতপক্ষে কাবর বাল্যজীবনে তাঁদের বাড়িতে যাবতীয় শিক্ষা ও কৃষ্টির উন্নতির মূলে হেমেন্দ্রনাথের চেষ্টা ও যত্নের আন্তরিকতা ছিল অনেকখানি,—এবং তাঁরই এই বিশেষ গুণের উত্তরাধিকারী হিসাবে আমরা দেখতে পাই তাঁর অনুজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেও। সে প্রসঙ্গ পাব পরে যথাস্থলে। তবে হেমেন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় ইত্যাকার তথ্যগুলি হয়ত অনেকের অজানা। তাই তাঁর পারিবারিকগণেরই প্রাসঙ্গিক আরো উক্তি কিছু এখানে তুলে দিলাম, তা পড়লে পাঠকরা বিষয়টা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।

সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী লিখেছেন তাঁর স্মৃতিকথায় : "বিয়ের পর সেজ দেয়র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইচ্ছে করে আমাদের পড়াতেন। আমরা মাথায় কাপড় দিয়ে তাঁর কাছে বসতুম আর এক এক বার ধমকে দিলে চমকে উঠতুম। আমার যা কিছু বাংলা শিক্ষা মেজঠাকুরপোর কাছে পড়ে। মাইকেল প্রভৃতি শক্ত বাংলা বই পড়াতেন, আমার খুব ভাল লাগত।"—(জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ২১২)। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "আমাদের বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্যে সেজদাদার বিশেষ উৎসাহ ছিল।...সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশুনোর জাতাকল চলছেই ঘর্ঘর শব্দে। এই কলে দম দেওয়ার কাজ ছিল আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে। তিনি ছিলেন কড়া শাসনকর্তা" —(রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ম খণ্ড, পৃ ১৪১)। ঐ একই বিষয়ে আলোকপাত করে তাঁদের ভাগিনেয়ী সরলাদেবী বলেছেন : "সেজমামা হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভাদিদি ও তাঁর ভাইবোনেরা পড়াশুনা ও সঙ্গীত অভ্যাসের নিয়মনিগড়ে একেবারে বদ্ধ থাকতেন। নিয়ম থেকে একটু বিচ্যুত হলে সেজমামার হাতে উত্তম-মধ্যম পেতেন"—(জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ১৫)।

হেমেন্দ্রনাথকে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধক বলা যায়। ভাইদের মধ্যে তিনিই ওস্তাদদের কাছে বিশেষভাবে সঙ্গীতে তালিম নিয়েছিলেন এবং তার চর্চাও করতেন তেমনি। শুধু একা নয়,—তাঁর কনিষ্ঠাভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "এক্ষণে সেজদাদা মহাশয় তাঁহার পত্নীকে ওস্তাদের নিকট গান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গানবাজনা লেখাপড়া সর্বরকমে বেশ ভাল করিয়া শিক্ষা পাইতে লাগিল। দিদিরা পর্য্যন্ত ঘরে থাকিয়া ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন" —(জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ২:৩)। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন: "সেজদাদা তাঁর বড়ো মেয়ে প্রতিভাকে বিলিতি সঙ্গীতে পাকা করে তুললেন। তাতে করে তাকে দিশিগানেব পথ ভুলিয়ে দেওয়া হয়নি।...তখনকার দিনে ভদ্রপবিবারে হিন্দুস্থানীগানে তার সমান কেউ ছিল না।" প্রতিভাদেবীর লেখা স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়: "তখনকার কালে মেয়েদেব গান বাজনা করিবার প্রথা ছিল না। আমার পিতাই কেবল তাহা মানেন নাই। আমাকে উৎসাহিত করিতেন, শিখাইতেন। ...সেদিনে বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন বাড়ির গায়ক। তাঁহাব নিকট ছোটো খেয়াল শিখিতাম। ...বাড়িতে তখন বিদ্বজ্জনসমাগম হইত। সৌরীন্দ্রমোহন ইত্যাদি আসিতেন। সে সময় আমি ও ভ্রাতা হিতেন্দ্র উভয়েই সকলেব সামনে গাইতে বাধ্য হইতাম"—(রবীন্দ্রসঙ্গীত-I, পৃ ৩৬)।

ইতিহাসেব তথ্যসন্ধানীরা অবশ্য জানেন যে, সে-যুগে বাংলার অন্তঃপুরের নিভৃতচারিণী গৃহস্থ মেয়েদের ওস্তাদ শিক্ষকের অধীনে রেখে, গানবাজনা শেখাবার দৃষ্টান্ত বড় একটা পাওয়া যায় না। অথচ কলকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে হেমেন্দ্রনাথের যত্ন ও উৎসাহে তাঁর কন্যা প্রতিভাদেবী, অভিজ্ঞাদেবী—এঁরা কিন্তু ওস্তাদের কাছে গান শিখে সেদিনেই বিশিষ্ট গায়িকা বলে বাইরে পরিচিত হয়েছিলেন। হেমেন্দ্রনাথেরই এই সৃষ্ট পথটি পরে অনুসরণ কবেছিলেন তাঁব কনিষ্ঠ সহোদর জ্যোতিবিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ—যার ফলে আজ আমাদের দেশের সর্বত্রই মেয়েদেব মধ্যে গানচর্চার উপায়টি এত সহজলভ্য হতে পেরেছে। অবশ্য এই সকল ক্ষেত্রে তাঁদের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেব ঔদার্য এবং সহযোগিতার কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

হেমেন্দ্রনাথও উত্তম শ্রেণীর ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করে গেছেন। তাঁর প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে যে কনিষ্ঠভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-জীবনে অনেকখানি কার্যকর হয়েছিল তা অবশ্য স্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন: "বাইরে সেজদাদা বিষ্ণুর কাছে গান শিখিতেন, তাহারই দুই-একটা পদ আমি যাহা শুনিয়া শিখিতাম তাহাও কোনো কোনো দিন গলা ছাড়িয়া দিয়া মাকে আসিয়া শুনাইতাম।" একেবারে শেষ বয়সেও সে স্মৃতি ভোলেন নি রবীন্দ্রনাথ,—আমাদেরও স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছেন এই বলে: "বাল্যকালে আমি গান শিখিনি—এত সহজে তা শেখা যায় না, শিখতে কষ্ট হয়—সেই কষ্ট আমি নেই নি। সেজদাদা শিখতেন বটে—তিনি সুর ভাঁজছেন তো ভাঁজছেনই, গলা

সাধছেন তো সাধছেনই—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। ⋯খুব মনে পড়ে⋯বড়দাদা সেজদাদারা দরজা বন্ধ করে গান শিখতেন। আমি ছেলেমানুষ, আমার তথায় প্রবেশ ছিল না। কারণ, তখনকার দিনে ছেলেমানুষের অনেক অপরাধ ছিল। তানপুরোর কান মুড়ি নি কখনো, তবু দরজার পাশে কান দিয়ে শুনেছি, সেটা হয়তো মনে রয়ে গেল। এমনি করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যা শিখেছি—তাই তোমাদের কাছে আওড়ালাম। তোমাদের যা দিয়েছি—এই ছুঁয়ে ছুঁয়ে মাত্র যা শিখেছি তা-ই।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫): মহর্ষির পঞ্চম পুত্র, এন্ট্রান্স পাস করে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা বিভিন্ন কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। চিত্র ও সঙ্গীতকলার প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ থাকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কলেজের পড়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বিদ্যাচর্চা তিনি ছাড়েন নি মোটেই,—তার প্রমাণ, নিজ চেষ্টায় ফরাসী, মরাঠি প্রভৃতি ভাষা শিখে তা থেকে অগণ্য রত্নরাজি এনে তিনি পরিণত বয়সে বাংলাসাহিত্যের পুষ্টি সাধন করে গেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বোম্বাই গিয়ে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে সঙ্গীত-অনুশীলনে মনোযোগী হন। অতঃপর কলকাতায় ফিরে এসে সর্বসাধারণের মধ্যে সঙ্গীত-চর্চার বিশেষ আয়োজন করেন। তাঁর এইকাজে তৎকালীন গোঁড়া সঙ্গীতবিদ্‌দের সমর্থন ছিল না, সুতরাং এইজন্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে বিস্তর বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনতে হয়েছিল। তিনি তা মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেন নি—পরন্তু তাঁরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলেন একদিন তাঁর সর্বকনিষ্ঠ সহোদর রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতি গ্রন্থে লিখেছেন: "তখন আমার অল্প বয়স, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না; তখন বাড়িতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর—সংগীতের অবিরল বিগলিত ঝরণা ঝরিয়া তাহার শীকরবর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রঙ ছড়াইয়া দিতেছে⋯তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় করিতেছি, নিজেকে সকল দিকেই প্রচুরভাবে ঢালিয়া দিতেছি⋯সেদিন এই-যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন উদ্দাম উৎসাহে দৌড় করাইয়াছিলেন, তাহার সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদা।⋯সকল পুরণো কায়দার ভিড়ের মধ্যে জ্যোতিদাদা এসেছিলেন নির্জলা নূতন মন নিয়ে।⋯ সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন।⋯আমি [১২ বৎসরের ছোট হইলেও] অবাধে তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম; তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না।⋯এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা [যখন] নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন, প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত—আমি [তখন] তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপেই আমার আরম্ভ হইয়াছিল।"

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে আবিষ্কার করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথই। সেই হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে আরো কত বড় প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তা এই সংকীর্ণ পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। অতি সংক্ষেপেও বলতে গেলে বলা যায়, যে তিনি একাই ছিলেন একটা ইন্‌স্টিটিউশনের মতো,—অর্থাৎ সকল বিষয়েই তাঁর উদ্যোগ ও আগ্রহ ছিল সমান। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের বাল্যবয়সে তাঁদের বাড়িতে যত কিছু আনন্দ উৎসবের পরিচয় আমরা পাই—খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এসবের সৃষ্টি কিন্তু একমাত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ব্যক্তিগত জীবনে—সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী, চিত্রশিল্পে মানবচরিত্র বিশ্লেষক, নট ও নাট্যকার—কি না ছিলেন তিনি! মাসিক পত্রিকা 'ভারতী' তাঁরই উদ্যোগে প্রকাশিত হয়,—পশ্চাতে প্রেরণাদাত্রী ছিলেন তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী দেবী। কিশোর রবীন্দ্রনাথ-এর কাব্যপ্রতিভা বিকাশের ঢালাও বন্দোবস্ত হয়েছিল এই পত্রিকারই মাধ্যমে। কিছুটা প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটলেও এখানে জানিয়ে রাখাতে ক্ষতি নেই, —প্রথমে যদিও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রীস্বাধীনতার বিপক্ষে ছিলেন, কিন্তু (তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরে আসার) পরে তিনি এর এতবড় পক্ষপাতী হয়ে উঠেন, যে, তিনি ও তাঁব স্ত্রী পাশাপাশি ঘোড়ায় বসে প্রত্যহ কলকাতা গড়েব মাঠে সবেগে ঘোড়া ছুটাতেন। এইদৃশ্য তখনকার দিনে যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি ছিল দারুণ বিস্ময়কর। সর্বজনীন জাতীয় পোশাক প্রবর্তনের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ছিল তাঁর—শুধু শুধু মুখের কথায় নয়, সদৃষ্টান্তে। তাঁর এমনতর স্বাধীনতার মনোবৃত্তি তিনি রাজনীতি এবং শিল্পোন্নতির মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট করান। 'সঞ্জীবনী সভা' এর একটি উত্তম নিদর্শন। এছাড়া শিল্পোন্নতির চেষ্টায় বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করে অনেক কিছু কাজে হাত দিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু কোনটাই চলে নি বেশি দিন। বিশেষত জাহাজ কিনে স্টিমার-কোম্পানীর কারবার চালানোটা কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনে এক অপূর্ব অবিস্মরণীয় কীর্তি !

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেমন কল্পনাপ্রিয় ছিলেন তেমনি কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার উদ্যমও ছিল তাঁর অফুরন্ত। তাঁর প্রচেষ্টায় অনেকগুলি সভা, সম্মিলনী স্থাপিত হয়। 'ভারত সঙ্গীত সমাজ' যখন স্থাপন করলেন তখন তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ সেই প্রতিষ্ঠানে হাজাব টাকা চাঁদা দিয়ে পুত্রকে উৎসাহিত করেছিলেন। জাহাজ-কারবারের যখন শখ মিটল তখন আবার সংগীতে মনোনিবেশ করলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। কী ভাবে গানের স্বরলিপি সহজ ও সরল প্রণালীতে হতে পারে—এ দিকেই সকলের আগে তাঁর নজর পড়ল। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম প্রথম সাংখ্যমাত্রিক স্বরলিপিতে গান ছাপাতে থাকেন। পরে শিক্ষার্থীদের কাছে, এ বিদ্যাটি যাতে আরো সহজে বোধগম্য হয়—সেই উদ্দেশ্যে 'আকার মাত্রিক স্বরলিপি'র প্রবর্তন করলেন তিনি,—অবশ্য এ বিষয়ে প্রারম্ভিক পথটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন শোনা যায় তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ। 'বীণা-বাদিনী' নামে কেবলমাত্র সঙ্গীত ও স্বরলিপি বিষয়ক এক মাসিকপত্রও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

প্রকাশ করেছিলেন। বৎসর দুই বাদে এটি বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর ত্রিপুরার মহারাজার অনুরোধে ও আনুকূল্যে 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' নমে বের করলেন আরেকটি মাসিক পত্রিকা। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক থাকাকালীন ব্রহ্মসঙ্গীতের স্থায়িত্ব ও প্রসারের উদ্দেশ্যে 'আদিব্রাহ্মসমাজ সঙ্গীতবিদ্যালয়' খোলেন। ঐ বিদ্যালয়ে যদুভট্ট ছিলেন অন্যতম শিক্ষক। সেখানে ছাত্রদের উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত শেখানো হত—বিনা বেতনে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে 'আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি'র প্রবর্তন করেছিলেন—সেটাও শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন নিজে—এমনকি পত্রযোগেও শেখাবার অঙ্গীকার ছিল তাঁর, সেই অঙ্গীকার তিনি সযত্নে রক্ষা করতেন। এমনি করে স্বরলিপি নির্মাণ ও সর্বসাধারণের মধ্যে তা প্রচারকার্যে তাঁর উদ্যম যে কত আন্তরিক ছিল—সে সব কথা বলে শেষ করা যায় না ;—শুনে শুধু শ্রদ্ধায় অভিভূত হতে হয়।

ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অসাধারণ গুণপনার ইতিহাস সঙ্গীতজ্ঞ মহলে সুবিদিত,—কিন্তু তাঁর স্বভাব প্রচলিত ওস্তাদদের মত সংস্কারাচ্ছন্ন ছিল না। তাঁর রচিত গানগুলির সুর নিয়ে গবেষণা করলে আজও একথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যায়। তিনি এসেছিলেন 'নির্মলা নূতন মন নিয়ে'—সঙ্গীতবিদ্যাটিকে সর্বসাধারণের মধ্যে সহজলভ্য সহজবোধ্য করবার প্রচেষ্টায় নূতনের পথে চলতে গিয়ে সঙ্গী করেছিলেন ছোট ভাই রবীন্দ্রনাথকে। সেই প্রচেষ্টার ফলেতেই যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পরবর্তী জীবনে এমনতর এক সার্থকসঙ্গীতরচয়িতা হিসাবে পেয়েছিলাম—তা বললে ভুল হবে না একটুও।

রবীন্দ্রনাথও শেষ বয়সে তাঁর জ্যোতিদাদার কথা স্মরণ করে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে জানিয়েছেন : "জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনো বাঁধন পরান নি।···তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্ত-বিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার 'পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন তাহলে ভেঙ্গে-চুরে তেড়ে-বেঁকে যা-হয়-একটা কিছু হতুম, সেটা হয়ত ভদ্রসমাজের সন্তোষজনকও হত, কিন্তু আমার মতো একেবারেই হত না।"—(রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ম খণ্ড, পৃ ২০৯)।

সোমেন্দ্রনাথ—(১৮৫৯-১৯২২) : মহর্ষির সপ্তম পুত্র। ভাল গাইতে পারতেন। বাড়ির ওস্তাদ শিক্ষকদের কাছে সঙ্গীতে যথারীতি তালিম নিলেও নিজ বাড়ীর আত্মীয়দের লেখা গানই গাইতেন বেশি, তাছাড়া নিধুবাবুর টপ্পাগান জানতেন অনেক,—গাইতেনও। তাঁর গান শুনে প্রখ্যাত শিল্প-সমালোচক শ্রীযুক্ত ও-সি-গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : "রবীন্দ্রনাথের 'সমুখেতে বহিছে তটিনী' সমস্ত গানটি একদিন সোমবাবু হস্ত সঞ্চালন করে, আঙুল দিয়ে ব্যাখ্যা করে 'অ্যাকশন্ সং'-এর মত করে গেয়েছিলেন। 'লুটিয়া' শব্দটি উচ্চারণের সময় তিনি নিজে ফরাশের উপর গড়িয়ে পড়ে ঘুরপাক খেয়ে

বায়ু কীরূপে পরিমল লুণ্ঠন করে তা হাতে-কলমে ব্যাখ্যা করে আমাদের দেখালেন।··· বললেন, রবির এগান গাইলে আমি বড় একসাইটেড হয়ে পড়ি। সেদিন আর তাঁর গান গাওয়া হল না। তারপরে—আবার যেদিন এলেন, আমাদের বাড়ির ছেলেরা তাঁকে সেই অ্যাকশন্ সং-টি গাইতে অনুরোধ করলে তিনি বললেন, 'ও-গান গাইলে আমার খুব এক্সাইটমেণ্ট হয়। আমি গাইব না।' অনেক অনুরোধের পর আর একবার মাত্র সেই গানটি গেয়েছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অতি মধুর। কিন্তু আমাদের কাছে তখন তাঁর হস্তসঞ্চালনই হোত বেশী আকর্ষণীয়। তাঁর হাতের মুদ্রা ছিল খুব ওরিজিন্যাল।"—এই প্রসঙ্গে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জানাচ্ছেন : [জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ির] একতলার দক্ষিণের যে ঘরে বসতেন আমার পিতা, সেই ঘরে থাকতেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র সোমেন্দ্রনাথ,—আমাদের সোমদাদা। পুরণো কত গান যে গাইতেন তার অন্ত নেই। ···রবীন্দ্রনাথের বাল্যেব লেখা অপ্রকাশিত দু'তিনটি কবিতা তাঁর মুখেই শুনেছিলুম। তখন লিখে নেওয়ার কথা মনে হয়নি, তাঁর সঙ্গেই সে কবিতাগুলো লোপ পেয়েছে। আমি ছিলাম তাঁর আদরের নাতি। ঘরের একধাবে তাঁর খাট থাকতো,—প্রায়ই শুয়ে থাকতেন। মাথায় মাখতেন ফুলন তেল, বালিশে সেই মিঠে তেলের গন্ধে পিঁপড়ে এসে জুটতো। আমিও তাঁর পাশে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে তাঁর গল্প শুনতুম। তাঁর গায়ের রঙ ছিল চাঁপাফুলের মত, হাতেব তেলোয় যেন ডালিম ফুলের রঙ।···দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বহুপূর্বে তিনি হাসির গান রচনা করেন।···সকলের ঘরে ঘরে সোমদাদার যাওয়া ছিল; বৌরা নাতি-নাতনী, নাতবৌরা যে যখন ধরতো তখনই তিনি গান শোনাতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকেব গানগুলি, ববীন্দ্রনাথের গান, নিধুবাবুব টপ্পা তাঁর বহু জানা ছিল।···তাঁর মৃত্যুর পর জোড়াসাঁকোব বাড়ির একতলার সেই দক্ষিণেব ঘরের ঝরণাতলা শুকিয়ে গেল"—(যাত্রী, পৃ ১৭-১৯)।

ছোটভাই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে দাদা সোমেন্দ্রনাথের গর্ব ছিল খুব। তা সম্যক অনুভব করা যায় রবীন্দ্রনাথেরই উক্তিতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতির 'কবিতা-রচনারম্ভ' অধ্যায়ে লিখেছেন : "হরিণশিশুর নতুন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে-সেখানে গুঁতো মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্‌গম লইয়া আমি সেইরকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম। বিশেষত, আমার দাদা আমার এই সকল রচনায় গর্ব অনুভব করিয়া শ্রোতা-সংগ্রহের উৎসাহে সংসারকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। মনে আছে, একদিন একতলায় আমাদের জমিদারি-কাছারির আমলাদের কাছে কবিত্ব ঘোষণা করিয়া আমরা দুই ভাই বাহির হইয়া আসিতেছি, এমন সময় তখনকার 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রের এডিটার শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র সবেমাত্র আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ দাদা তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া কহিলেন, 'নবগোপালবাবু, রবি একটা কবিতা লিখিয়াছে,—শুনুন না।' শুনাইতে বিলম্ব হইল না। কাব্য-গ্রন্থাবলীর বোঝা তখন ভারি হয় নাই।

কবি-কীর্তি কবির জামার পকেটে পকেটেই তখন অনায়াসে ফেরে। নিজেই তখন লেখক, মুদ্রাকর,প্রকাশক—এই তিনে-এক একে-তিন হইয়া ছিলাম। কেবল বিজ্ঞাপন দিবার কাজে দাদা আমার সহযোগী ছিলেন।" অন্যত্র ঐ জীবনস্মৃতির খসড়াতেই আরো লিখেছেন: "পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া 'বনফুল' নামে যে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম সেটি বোধকরি জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হইয়াছিল। এবং বছর তিন-চার পরে দাদা সোমেন্দ্রনাথ অন্ধ পক্ষপাতিত্বের উৎসাহে এটি গ্রন্থ আকারে ছাপাইয়াও ছিলেন।"

মোটের উপর ইত্যাকার বর্ণনা থেকে বেশ বোঝা যায়, রবীন্দ্র-প্রতিভার অগ্রগতির প্রথমযুগের গোড়া থেকেই তাঁর কাব্যচর্চার এবং সঙ্গীতসাধনার প্রধান ও আন্তরিক উৎসাহদাতা ছিলেন দাদা সোমেন্দ্রনাথ।

এখন, এই অধ্যায়ের আরম্ভে কবিগুরুর লেখার যে উদ্ধৃতি দিয়েছি—সেটা পড়লেই বোঝা যাবে, কেন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না।"—আর বস্তুতপক্ষে যদিও অন্যান্যদের মত ওস্তাদিয়ানার জালে তিনি বাঁধা পড়েন নি—গান শিক্ষার ব্যাপারে কোনো কষ্টসাধ্য কৃচ্ছ্রসাধনা ছিল না তার,—তবুও তাঁর জীবনে সংগীতপ্রতিভা বিকাশের প্রধান ও উত্তম সহায়ক ছিল তাঁর এই পারিবারিক সাঙ্গীতিক পরিবেশ। তার উপরে, বাড়িতে নিত্য আমন্ত্রিত হতেন বড় বড় ওস্তাদ-গায়করা—অনেকে আবার বাড়ির গৃহশিক্ষক হিসেবেও নিযুক্ত ছিলেন—এসব তো কোনো মতেই প্রতিভাধর বালক কবি রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য এড়িয়ে যেতে পারে না। তাঁদের সান্নিধ্যও তিনি পেয়েছিলেন কিছু-না-কিছু—সেটাই এবার আমরা দেখব।

১৯২১ সালের কোনো একসভায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "বাল্যকালে স্বভাবদোষে আমি যথারীতি গান শিখি নি বটে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে গানের রসে আমার মন রসিয়ে উঠেছিল। তখন আমাদের বাড়িতে গানের চর্চার বিরাম ছিল না। বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন সংগীতের আচার্য, হিন্দুস্থানী সংগীতকলায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন। অতএব ছেলেবেলায় যে-সব গান সর্বদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল, সে শখের দলের গান নয়;—তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা-আপনি জমে উঠেছিল। রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে যাঁরা অত্যন্ত শুচিবায়ুগ্রস্ত, তাঁদের সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না, অর্থাৎ সুরের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি সম্বন্ধে কিছু-কিছু ধারণা থাকা সত্ত্বেও আমার মন তার অভ্যাসে বাঁধা পড়ে নি—কিন্তু ওই কালোয়াতি সঙ্গীতের রূপ এবং রস সম্বন্ধে একটা সাধারণ সংস্কার ভিতরে-ভিতরে আমার মনের মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল"—(সবুজপত্র ১৩২৮ ভাদ্র)। আজ একথা অনেকেই জানেন যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতজীবনের প্রথম গুরু—এই বিষ্ণু চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন আদিসমাজের বৈতনিক গায়ক, স্বয়ং

বিষ্ণু চক্রবর্তী

রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক সেখানে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে নিজ বাড়ির গৃহশিক্ষক হিসাবে আমন্ত্রণ জানান। বিষ্ণু চক্রবর্তী হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতে বড় ওস্তাদ হয়েও, গৎ বাঁধা-নিয়মে শুধু শুধু সা-রে-গা-মা অভ্যাসের দ্বারা যাতে শিশুচিত্ত সঙ্গীতের প্রতি বিমুখ না হয়ে ওঠে সেইজন্যে, - পাড়াগেঁয়ে ছড়াতে সুর বসিয়ে সহজ-সহজ তাল সহযোগে বাংলা গান শেখাতে শুরু করেন প্রথম জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের। সে সব পুরনোদিনের মনোরম ইতিকথাই কবি নিজে লিখেছেন তাঁর শেষ বয়সে : "বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকে। গানের এই পাঠশালায় আমাকেও ভর্তি হতে হল।...শিশুদের মন-ভোলানো প্রথম সাহিত্য-শেখানো মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে,—শিশুদের মন-ভোলানো গান-শেখানোর শুরুও সেই ছড়ায়—এইটে আমাদের উপর দিয়ে পরখ করানো হয়েছিল।...যে কয়দিন আমাদের শিক্ষা দেবার কর্তা ছিলেন সেজদাদা, ততদিন বিষ্ণুর কাছে আনমনা ভাবে ব্রহ্মসঙ্গীত আউড়েছি। কখনো কখনো যখন মন আপনা হতে লেগেছে তখন গান আদায় করেছি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে।"—(রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ম খণ্ড, পৃ ১৪২-১৪৩)।

যদিও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তখন তিনি শিশু—তবু আমরা দেখতে পাই, তাঁর প্রতিভাদীপ্ত জীবনে ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের অন্তর্নিহিত রসটি কিন্তু প্রথম জেগে উঠেছিল ঐ ওস্তাদ গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তীরই সাহচর্যে—এবং একে পরে আরো সুন্দর ও সমৃদ্ধতর করে তোলেন গায়ক যদুভট্ট। সে-কথা একটু বাদেই যথাস্থলে আসছে,—তবে এর কিঞ্চিৎ আগে-পরে সেই বালক বয়সেই এক চমৎকার বৃদ্ধ বন্ধু লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ,—তখন কবিতা পড়ে শোনাবার জন্যে তার মত এমন উপযুক্ত শ্রোতা-বন্ধুও তিনি বড় পাননি। বন্ধুটির মাথাভরা টাক, চোখদুটো অবিরামহাস্যে সমুজ্জ্বল,—মুখের ভিতরে দাঁতের কোনো বালাই ছিল না। তাঁর নিত্যসঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, আর কোলের ভিতর একটি সেতার, কণ্ঠে অবিরাম গান। নাম তাঁর শ্রীকণ্ঠ সিংহ। তাঁরই মুখে শোনা কোনো এক হিন্দীগানের সুর ভেঙে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন 'অন্তরতর, অন্তরতম তিনি যে, ভুলো না রে তাঁয়।' "এই গানটি"—রবীন্দ্রনাথ বলেন : "শ্রীকণ্ঠবাবু পিতৃদেবকে শোনাইতে শোনাইতে আবেগে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন। সেতারে ঘন ঘন ঝংকার দিয়া একবার বলিতেন, 'অন্তরতর অন্তরতম তিনি [illegible] পালটাইয়া লইয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া বলিতেন, 'অন্তরতর অন্তরতম তুমি যে।' এই বৃদ্ধ...টি যেমন আমার পিতার, তেমনি দাদাদের, তেমনি আমাদেরও বন্ধু ছিলেন— আমাদের সকলেরই সঙ্গে তাঁহার বয়স মিলিত।" তিনি ছিলেন রায়পুরের সিংহ পরিবারের প্রখ্যাত লর্ড এস্-পি-সিংহের জ্যেষ্ঠতাত। এই বৃদ্ধ শ্রীকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাওয়া যায় কবির জীবনস্মৃতি-তে,

শ্রীকণ্ঠ সিংহ

তবে বিশেষ করে তাঁর গান যে, কবির মনের উপর কী অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করেছিল কেবল এই সম্পর্কে কবি নিজে যা বলেছেন তা-ই শোনা যাক: গান সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম। তাঁর একটি গান—'ময় ছোড়োঁ ব্রজকি বাসরী', এই গানটি আমার মুখে সবাইকে শোনাবার জন্যে তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টেনে নিয়ে বেড়াতেন। আমি গান ধরতাম, তিনি সেতারে ঝংকার দিতেন এবং যেখানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক্ 'ময় ছোড়োঁ',—সেখানটাতে মেতে উঠে তিনি নিজেই যোগ দিতেন. ও অশ্রান্তভাবে সেটা ফিরে ফিরে আবৃত্তি করতেন এবং মাথা নেড়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে সবার মুখের দিকে চেয়ে যেন সবাইকে ঠেলা দিয়ে ভালো-লাগায় উৎসাহিত করে তোলার চেষ্টা করতেন।…আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত তলিয়ে থাকতেন ঐ গানের মধ্যে।…বারান্দায় বসে বসে চামেলির তেল মেখে স্নান করতেন; হাতে থাকত গুড়গুড়ি, অম্বুরি তামাকের গন্ধ উঠত আকাশে;— গুন্‌গুন্ গান চলত—ছেলেদের টেনে রাখতেন চারদিকে। তিনি ত গান শেখাতেন না, গান তিনি দিতেন;—কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না।

আসলে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন একটি সুন্দর কবি-মন নিয়ে,—যে মনের মুক্তি ও বিকাশ ঘটে অবাধ স্বাধীনতায়—কোনো বাঁধাধরা নিয়মের গণ্ডীর ভিতর তা সম্ভব নয়। কিন্তু যাঁরা সাধারণ, তাঁরা এ-সব বুঝবেন কী করে,—অথচ রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন নিজেকে; তাই তাঁকে বলতে শুনি: "যখন আমার কিছু বয়স হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড় ওস্তাদ এসে বসলেন যদুভট্ট।…ছেলেবেলায় আমি [এই] একজন বাঙালী গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজমর্যাদায় ছিল —কাষ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দারবানের মত তাল ঠোকাঠুকি করত না।…যদুভট্ট, আমাদের গানের মাষ্টার, আমাদের বাড়ির সভাগায়ক,—একটা মস্ত ভুল করলেন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই। কিন্তু আমাব একটা গুণ আছে… কোথাও মাষ্টারির ভঙ্গী দেখালেই দৌড় দিয়েছি। আমি তাঁর ঘরের সামনে দিয়ে দৌড় দিতাম।…ছোটবেলায় আমার গলা খুব ভাল ছিল। তিনি কত চেষ্টা করেছেন আমাকে গান শেখাবার জন্যে, কিন্তু মেরেকেটেও আমাকে বাগ মানাতে পারেন নি। সে-ধাতের ছেলেই আমি নই। কোনো রকম শেখার ব্যাপারে আমার টিকিটিও খুঁজে পাবার যো ছিল না।…আমি অত্যন্ত 'পলাতক' ছিলুম বলে কিছু শিখি নি, নইলে কি তোমাদের কাছে আজকে খাতির কম হত!…আড়ালে-আবডালে থেকে যেটুকু শুনেছি—সেটুকুই আমার শেখা।…যদুভট্টের কাছ থেকেও তেমনি কিছু-কিছু সংগ্রহ করেছিলুম লুকিয়ে-চুরিয়ে। ভাল লাগল কাফি সুরে 'রুমঝুম বরখে আজু বাদরওয়া'—রয়ে গেল আজ পর্যন্ত আমার বর্ষার গানের সঙ্গে দল বেঁধে।… তার থেকেই পেয়েছি আমি গানের প্রেরণা। বর্ষার দিনে, ভিতরে ভূপালী সুরের আলাপ

যদুভট্ট

চলছে, আমি বাইরে থেকে শুনছি। আর কী আশ্চর্য,…পরবর্তী জীবনে আমি যত বর্ষার গান রচনা করেছি তার প্রায় সবকটিতেই অদ্ভুতভাবে এসে গেছে ভূপালীর সুর। কাজেই সংগীতশিক্ষাটা আমার সংস্কারগত,—ধরাবাঁধা রুটিনমাফিক নয়”—(তীর্থংকর)।

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিগুলি পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায়, যে, যদুভট্টের শিষ্যত্ব তিনি গ্রহণ করেন নি কিংবা বিষ্ণু চক্রবর্তী হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকলায় একজন বড় ওস্তাদ হওয়া সত্ত্বেও—তাঁর কাছ থেকেও নেন নি উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের কোনো পাঠ। তবে এঁদের প্রতিভার একজন বিশিষ্ট সমঝদার ছিলেন প্রতিভা-সমুজ্জ্বলিত কবি রবীন্দ্রনাথ,—তাঁদের প্রতি মনে-প্রাণে শ্রদ্ধাবানও। বিশেষ করে যদুভট্টের গান তাঁকে সারা জীবন প্রেরণা যোগিয়েছে—এ কথা তিনি সর্বত্রই বিনতচিত্তে ঘোষণা করেছেন,—যদুভট্ট রচিত গানের সুর ও তালের হুবহু অনুকরণে নিজেও লিখেছেন কয়েকটি গান।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যদুভট্ট আমন্ত্রিত হবার আগে বালক রবীন্দ্রনাথ এক নাম-না-জানা গায়কের সংস্পর্শে আসেন। ঐ গায়ক সম্বন্ধে অতি সামান্য বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর স্মৃতিকথায়ঃ "অচেনা অতিথি একদিন লেপ-মোড়া তম্বুরা কাঁধে করে, তার পুঁটুলি খুলে, বসবার ঘরের একপাশে পা ছড়িয়ে দিলেন।…সেই অজানা গাইয়ে আপন ইচ্ছে মত রয়ে গেলেন কিছুদিন। কেউ কোনো প্রশ্নও করলে না। ভোরবেলা মশারি থেকে টেনে বের করে তাঁর গান শুনতেম। নিয়মের শেখা যাদের ধাতে নেই, তাদের শখ অনিয়মের শেখায়। সকালবেলার সুরে চলত—'বংশী হমারি রে'।"—(রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ম খণ্ড, পৃ ১৪৩-১৪৪)।

নাম-না-জানা গায়ক

এইখানে নিজের মনোভাবের বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ এই বলে যে, 'নিয়মের শেখা যাদের ধাতে নেই, তাদের শখ অনিয়মের শেখায়',—আর বস্তুতঃ এমনতর অনিয়মের মধ্যেই গান শিখতে গিয়ে তাঁকে আমরা উৎসাহ পেতে দেখি—তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বন্ধু অক্ষয় চৌধুরী এবং কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাছ থেকেও। এই দু-জনের সাহচর্য, গান রচনার ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথের বালকচিত্তে যে কী গভীর রেখাপাত করেছিল তা এঁদের সম্পর্কে রবীন্দ্ররচিত সামান্য প্রশস্তিগুলো পড়লেই যে কেউ বুঝতে পারবেন। সে সবের কিয়দংশ এখানে উদ্ধার করছি। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'-তে লিখেছেন অক্ষয় চৌধুরীর কথা: "বাংলা কত উদ্‌ভট গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল। সে-গান সুরে-বেসুরে যেমন করিয়া পারেন, একেবারে মরিয়া হইয়া গাহিয়া যাইতেন। সে-সম্বন্ধে শ্রোতারা আপত্তি করিলেও তাঁহার উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকিত।…গান এবং খণ্ডকাব্য লিখিতেও ইহার ক্ষিপ্রতা অসামান্য ছিল। অথচ নিজের এই-সকল রচনা সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র মমত্ব ছিল না। কত ছিন্নপত্রে তাঁহার কত পেন্সিলের লেখা ছড়াছড়ি যাইত, সেদিকে খেয়ালও করিতেন না।…ইহার অনেক গান লোককে গাহিতে শুনিয়াছি, কে যে তাহার রচয়িতা

অক্ষয় চৌধুরী
বিহারী চক্রবর্তী

তাহা কেহ জানেও না।"—অক্ষয় চৌধুরীর লেখা বহুগান তাঁর বন্ধু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত 'স্বরলিপি-গীতি-মালা'য় সন্নিবিষ্ট আছে। প্রায় ঐ একই সঙ্গে বিহারীলাল সম্পর্কে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ: "তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। দিনে-দুপুরে যখন-তখন তাঁহার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম।...আমি বালক হইলেও এমন একটি উদার হৃদ্যতার সঙ্গে তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া লইতেন যে, মনে লেশমাত্র সংকোচ থাকিত না। তাহার পরে ভাবে ভোর হইয়া কবিতা শুনাইতেন, গানও গাহিতেন। গলায় যে তাঁহার খুব বেশি সুর ছিল তাহা নহে, একেবারে বেসুরাও তিনি ছিলেন না...সুরে যাহা পৌঁছিত না—ভাবে তাহা ভরিয়া তুলিতেন।...তাঁহার গানে সুর বসাইয়া আমিও তাঁহাকে কখনো-কখনো শুনাইতে যাইতাম"—(জীবন স্মৃতি, পৃ ৭৩)। অধিকন্তু "বাল্মীকি-প্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল-সঙ্গীতের দুই এক স্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে"—এ-তথ্যও ত কবি স্বয়ং আমাদের জানিয়েছেন তাঁর জীবনস্মৃতিতেই। এরও আগে, ছেলেবেলার কথা মনে করে এমনি অনিয়মের শেখা সম্পর্কে অন্য অধ্যায়ে লিখেছেন তিনি: "আমার পিতার অনুচর কিশোরী চাটুর্জে একদিন পাঁচালির দলের গায়ক ছিল। সে আমাকে পাহাড়ে থাকিতে প্রায় বলিত, 'আহা দাদাজি, তোমাকে যদি পাইতাম তবে পাঁচালির দল এমন জমাইতে পারিতাম, সে আর কী বলিব।' শুনিয়া আমার ভারি লোভ হইত—পাঁচালির দলে ভিড়িয়া দেশদেশান্তরে গান গাহিয়া বেড়ানোটা মহা একটা সৌভাগ্য বলিয়া বোধ হইত। সেই কিশোরীর কাছে অনেকগুলি পাঁচালির গান শিখিয়াছিলাম—'ওরে ভাই, জানকীরে দিয়ে এসো বন', 'প্রাণ তো অন্ত হল আমার', 'রাঙাজবায় কী শোভা পায় পায়'...এই গানগুলিতে আমাদের আসর যেমন জমিয়া উঠিত এমন সূর্যের অগ্নি-উচ্ছ্বাস বা শনির চন্দ্রময়তার আলোচনায় হইত না"—(জীবনস্মৃতি, পৃ ৫৮-৫৯)। আমরা আরো জেনেছি রবীন্দ্রনাথেরই উক্তি থেকে, যে তাঁর বাল্যকালে তাঁদের ঘরে ওস্তাদের অভাব ছিল না;—সেই সুদূর অযোধ্যা, গোয়ালিয়র ও মোরাদাবাদ থেকে পর্যন্ত ওস্তাদরা আসতেন। তাছাড়া ঘরেও বাঁধা ছিলেন বড় বড় ওস্তাদ,—কিন্তু এঁদের সবার বিস্তারিত বর্ণনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নির্ভুল ভাবে পাওয়া সম্ভব নয় বলেই—ওস্তাদ গায়ক হিসাবে এখানে আপাততঃ সর্বজনবিদিত বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদুভট্ট প্রমুখের নামই কেবল বিশেষভাবে উল্লেখ করা হল। বাংলার বাইরের ওস্তাদদের মধ্যে বরোদার তৎকালীন প্রসিদ্ধ গায়ক মৌলাবক্স এসে কিছুদিন ছিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে।—সর্বশেষে এসেছিলেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও শ্যামসুন্দর মিশ্র। ততদিনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যজীবন উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। উক্ত রাধিকা গোস্বামী (১৮৬১-১৯২৫) ব্রাহ্মসমাজেরও

কিশোরী চটুর্জে

মৌলাবক্স
রাধিকা গোস্বামী
শ্যামসুন্দর মিশ্র

গায়ক ছিলেন। গীতসন্ন্যাসী দিলীপকুমার রায়ের বিবৃতিতে জানা যায়: "রাধিকাবাবু সারা বাংলায় গোঁসাইজি বলেই বিশ্রুত। বিংশ শতকে বাংলায় এত নামডাক আর কোনো ধ্রুপদীর হয় নি।…মিশ্রদের ঘরানা-ধ্রুপদ, মুসলমানি-ধ্রুপদ, খাণ্ডারবাণী-ধ্রুপদ, গৌরহারবাণীর ধ্রুপদ, বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ—আরো কতরকম ধ্রুপদের পুঁজিই যে তাঁর ছিল।… পণ্ডিত ভাতখণ্ডের বিশেষ ইচ্ছা ছিল তাঁর কাছ থেকে বহু অপ্রচলিত রাগের ধ্রুপদ তুলে নেওয়ার। দুর্ভাগ্যবশত সে-শুভ যোগাযোগ হয়ে ওঠেনি লক্ষ্ণৌয়ে আমি এঁদের দুজনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও। পণ্ডিতজি আমাকে বলতেন যে ধ্রুপদে এমনতর বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য তিনি খুব কমই দেখেছেন সারা ভারতে।…গোঁসাইজির স্বভাবগত মাধুর্য ছিল অবর্ণনীয়। তাঁব বাংলা গানেও এ মাধুর্য বিকীর্ণ হত"—(সাঙ্গীতিকী, পৃ ১৬০)। রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'বিমল আনন্দে জাগোরে'—এ বাংলা গানটি তিনি সেকালে গ্রামোফোন-রেকর্ডে গেয়েছেন—তাঁর স্বকীয় ভঙ্গিমায়। এর স্বরলিপি বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছেন স্বরবিতান ৪৫ খণ্ডে। এই গুণী গায়ক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন একজায়গায়: "অন্যান্য গায়কদের মধ্যে যদুভট্টর কাছেও তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন।…সকলেই জানেন রাধিকা গোস্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগরাগিণীর রূপজ্ঞান ছিল তা নয়, তিনি গানের মধ্যে বিশেষ একটি রস সঞ্চার করতে পারতেন। সেটা ছিল ওস্তাদের চেয়ে কিছু বেশি। সেটা যদি না-ও থাকত তবু তাঁকে আমরা ওস্তাদ বলেই গণ্য করতুম, এবং ওস্তাদের কাছ থেকে যেটা আদায় করবার তা আমরা আদায় করতুম—আমরা আদায় করেও ছিলুম। সে-সব কথা সকলের জানা নেই"—(প্রবাসী, ১৩৩৫ অগ্রহায়ণ)।

মোটের উপর জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়িতে আগত যাবতীয় গায়ক শিল্পীদের গান একেবারে শৈশবকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ শুনে এসেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে এবং এঁদের কাছ থেকেই পেয়েছেন ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতেব নানা পদ্ধতির সন্ধান—কিন্তু কাবো শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নয়—কেবলমাত্র শোনার মধ্য দিয়েই,—এই মন্তব্যটির সমর্থনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই একটি উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য মনে করি। রবীন্দ্রনাথ কোনো এক প্রকাশ্য সভায় বলেছিলেন: "বাল্যকাল থেকে আমি সকল বিদ্যালয়েরই পলাতক ছাত্র;—সঙ্গীত-বিদ্যালয়ও আমার হাজিরা-বই দেখলে দেখা যাবে আমি সেখানে অধিকাংশ কালই গরহাজির ছিলেম"—(সবুজপত্র, ১৩২৮ ভাদ্র)।

সুতরাং উপরে বর্ণিত রীতি অনুসারে সঙ্গীতসম্পর্কীয় জ্ঞানলাভ একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল তাঁর অসামান্য দিগ্‌বিজয়ী প্রতিভার গুণেতে;—এই মূল কথাটি 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে সঙ্গীতের প্রভাব' নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপলব্ধি করার যেমন প্রয়োজন আছে,—তেমনি এ-ও আমাদের মনে রাখতে হবে, যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে চিনতে পেরেছিলেন যিনি (বিশেষতঃ যখন সেই প্রতিভা ছিল

অন্তরে একাত্ম) এবং তা চিনে সর্বদা নিজের সঙ্গে সঙ্গে রেখে কবির জীবনের লক্ষ্যকে সচেতন করে দিয়ে কেমন সুন্দর ও সার্থক করে তুলেছিলেন, তিনি আর কেউ নন— রবীন্দ্রনাথেরই অগ্রজ শ্রদ্ধেয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। কারণ একমাত্র তাঁরই কাছে অনুগত শিষ্যের মত বসে সঙ্গীতের শিক্ষানবিসি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে। শিক্ষানবিসিটা ত প্রচলিত প্রথা মত শুধু শুধু গান করা কিংবা কণ্ঠসাধনার ব্যাপার ছিল না— সেটা ছিল, সঙ্গীত-রচনা এবং সঙ্গীতে উল্লেখিত ভাষার ভাব অনুযায়ী সুর-সৃষ্টি কিংবা বিবিধ সুরের অন্তর্নিহিত ভাব অনুযায়ী গানের কথার সংযোজন কী ভাবে করতে হয়—এই ধরনের কাজেতেই রবীন্দ্রনাথকে অধিক উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছিলেন সংস্কারমুক্ত সঙ্গীতজ্ঞ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ,—যা অন্য কোনো তথাকথিত ওস্তাদের দ্বারা সম্ভব হত না কোনো কালেই। কাজেই এর পরিপ্রেক্ষিতে এইটুকু বলা যায়,— যদি না কবিগুরু, সংগীত-সৃষ্টির প্রেরণা তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছ থেকে উপরোক্ত রীতিতে লাভ করতেন তাহলে আমরাই কি আর তাঁকে এমন সংগীত-রচয়িতা হিসাবে পেতাম কখনও—তা কে জানে!

রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি ও শিল্পীর স্বতন্ত্রতা

'স্বরচিত গানে কিংবা কবিতায়, এদের ভাব ও অর্থ অনুযায়ী বরাবর সুর আরোপ করতেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই—এ-কথাটা আমরা মোটামুটিভাবে সকলেই জানি; কিন্তু সেই আরোপিত সুর যে কীভাবে রক্ষিত হয়ে আসছে—তার স্পষ্ট ধারণা হয়ত অনেকের নেই। এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে এটুকু জানা প্রয়োজন যে,—গানে কিংবা কবিতায় সুর দেওয়া মাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়তেন এমন কারুর জন্যে, যে তাঁর গানে আরোপিত সুরটি সঙ্গে সঙ্গে ধরে রাখতে পারে। কিন্তু তা শুধু-শুধু কানে শুনে

কবির উদ্বেগ

আমাদের দেশীয় চালিত প্রথামত কেবলমাত্র স্মৃতিতে ধরে রাখলে ত চলবে না; তাহলে যে আবার কালের স্রোতে সেই তাৎক্ষণিক আরোপিত সুরটি ভুলে যাবার এমন কি বিকৃত হবারও আশংকা থেকে যায়—এনিয়েও কবির দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না।

পাশ্চাত্যসঙ্গীতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল বাল্যাবধি। তিনি জানতেন, সেই দেশের সুরকারদের সুর স্থায়িভাবে ধরে রাখার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটা যে কি;—এর সমর্থনে বলতেনও: "পাশ্চাত্যসঙ্গীতের একটা সুবিধা এই যে তাকে ষ্টাফ্‌নোটেশান্‌ দিয়ে একেবারে পাকা করে বেঁধে দেওয়া হয়। তার উপরে আর কেউ কলম চালাতে পারে না। বড় বড় কন্‌ডাক্‌টররা সেই জিনিসই একরকম করে রূপ দেন এবং তার চেয়ে কম প্রতিভা যাদের তারা অন্যরকম করে প্রকাশ করে। কিন্তু মিউজিকটা কায়েমী করে লিখে দেওয়া হয় বলে তার স্থায়িত্ব চিরকালের। যেমন একই কবিতাকে

কেউ খারাপ করে পড়ে—কেউ ভাল করে পড়ে, কিন্তু কবিতাটা [অর্থাৎ কবিতার অক্ষর বা শব্দগুলো] তো তাতে বদল হয়ে যায় না। বিঠ্‌হোভেনের মিউজিকের উপরে কলম চালাতে কি কেউ ভরসা করবে ?”— (সুরধুনী ১৩৭২ আশ্বিন। শ্রীনির্মল-কুমারী মহলানবিশ রচিত 'পুরোনো স্মৃতি')।)

এই বক্তব্যের ভাবধারাটাই ছিল কবিগুরুর গানের স্ব-আরোপিত সুরকে অবিকৃত ভাবে বাঁচিয়ে রাখার অন্যতম আদর্শ। শুধু গানের সুরই বা বলি কেন,—নিজের প্রতিটি সৃষ্টিকে যে-কবে হোক পাকা করে বেঁধে রাখার দিকেই যে তাঁর ঝোঁক ছিল বরাবর, এদের উপর অন্য কারোর কলমচালানোর ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি— এর সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর নিজ উক্তিতেই :

“রচনা যে করে, রচিত পদার্থের দায়িত্ব একমাত্র তারই; তার সংশোধন বা উৎকর্ষসাধনের দায়িত্ব যদি আর-কেউ নেয় তাহলে কলাজগতে অরাজকতা ঘটে। …সাহিত্যে সঙ্গীতে এমন একদিন ছিল যখন রচয়িতার সৃষ্টিকে একান্তভাবে রচয়িতার অধিকার দেওয়া দুরূহ ছিল। আল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে নিজের নিজের রুচি অনুসারে সর্বসাধারণে তার উপরে হস্তক্ষেপ করে এসেছে।…আজকালকার দিনে ছাপাখানা ও স্বরলিপি প্রভৃতি উপায়ে নিজের রচনায় রচয়িতার দায়িত্ব পাকা করে রাখা সম্ভব,—তাই রচনা-বিভাগে সরকারী যথেচ্ছাচার নিবারণ করা সহজ এবং করা উচিত”—(প্রবাসী, ১৩৩৪ কার্তিক)।

এই উক্তি ১৩৩৪ সালের,—কিন্তু এরও বহু আগে ১২৮৮ সালের মাঘ মাসে 'ভারতী' পত্রিকাতে সঙ্গীত সম্পর্কিত এক সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

“আমাদের দেশে ভালো স্বরলিপি ছিল না, রাগ-রাগিণীর নাম অসম্পূর্ণরূপে স্বরলিপির কার্য্য সাধন করিত। কিন্তু এখনো সেই অসম্পূর্ণ সুবিধার জন্য সম্পূর্ণ অসুবিধা ভোগ করিবার কোনো কারণ দেখিতেছি না। ইংরাজি স্বরলিপি গ্রহণ কবিতে দোষ নাই—তা, না হয় তো নূতন স্বরলিপি নির্মাণ করা হউক।”

পুনশ্চ ১৯২০ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে বিদেশ থেকে কোনো একটা উপদেশমূলক চিঠিতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ লিখছেন তখনকার শান্তিনিকেতন-আশ্রমের ছাত্র শ্রীঅনাদি কুমার দস্তিদারকে : “বিশেষ যত্ন করে স্বরলিপি শিখো। স্বরলিপি এমন শেখা চাই যাতে দেখে-দেখে বই পড়ার মত গান গাইতে পার—এদেশে অনেকেই তা পারে, সুতরাং এ কেবল অভ্যাসসাপেক্ষ।…দিনুর কাছ থেকে ইংরেজি সঙ্গীতের **staff notation**ও শিখে নিয়ো। ঐ নোটেশনই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষের সঙ্গীতকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করবার জন্যে ঐ নোটেশনের দরকার হবে।… স্বরলিপি যদি তোমার আয়ত্ত হয় তাহলে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ থেকে লৌকিক সঙ্গীত তুমি সংগ্রহ করে আনতে পারবে—সেই একটি মস্ত বড় কাজ আমাদের সামনে রয়েচে, এই কাজের ভার তুমি

নেবে বলে সংকল্প কর"—(ইন্দিরা সঙ্গীত-শিক্ষায়তন কর্তৃক প্রকাশিত 'শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার' নামীয় স্মারকগ্রন্থ, পৃ ১৪)।

মোটের উপর স্বরলিপির মাধ্যমে সুর-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং এর গুরুত্ব কবিগুরু যেমন নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই অনুভব করেছেন নানা দিক থেকে নানা অবস্থায়,—তেমনি অন্যদেরও এ বিষয়ে সচেতন করে দিতে তাঁর আগ্রহের ও যত্নের কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু যুগপৎ বিস্ময় ও বেদনা বোধ না করে পারি নে, যখন দেখি সঙ্গীত-চর্চার ক্ষেত্রে স্বরলিপির ভূমিকা ও উপযোগিতা সম্পর্কে আমাদের অনেকের ধারণা আজো বড় অস্পষ্ট! এই অস্পষ্টতার কারণটি আজ হতে প্রায় ৮০।৯০ বৎসর কাল আগে কবিগুরুর পুরোবর্তী সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় সুস্পষ্ট ভাষায় বিশ্লেষণ করে গেছেন তাঁর 'গীতসূত্রসার'* গ্রন্থে,—তা পড়ে যদি নিজেদের শুধরে নেবার কোনো অবকাশ মেলে সেই একান্ত প্রত্যাশায়—সেখান থেকে প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি—

"ভারতবর্ষে স্বরলিপির ব্যবহার কখন ছিল না; মুখে মুখেই চিরকাল সঙ্গীত শিক্ষা হইতেছে। সেইজন্য ভারতীয় সঙ্গীতবেত্তারা স্বরলিপির উপকার অবগত নহেন। স্বরলিপিদ্বারা সকল প্রকার গানের সুর তাল বিশুদ্ধরূপে লিখা যাইতে পারে, ইহা তাঁহারা বিশ্বাসও করেন না। তাঁহারা বলেন যে, হিন্দুসংগীত অলিখনীয়; কারণ তাঁহারা এই আপত্তি করেন, যে স্বরলিপিদ্বারা যদি বিশুদ্ধরূপেই গান লিখা যাইতে পারে, তবে স্বরলিপি শিখিয়াই লোকে তদ্দৃষ্টে গান রীতিমত গাইতে পারে না কেন? অনেক কৃতবিদ্য লোকেও এই তর্কের ভ্রমজালে নিপতিত হন। স্বরলিপির সংকেতাবলি চিনিতে, ও তাহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেই যে গান গাওয়ার ক্ষমতা জন্মে, —এরূপ মনে করা উচিত নহে। স্বরলিপি দেখিয়া দুই-এক বৎসর নিরন্তর অভ্যাস করিলে, তবে লিপি দৃষ্টিমাত্র নূতন গান বিশুদ্ধরূপে গাওয়া সম্ভব হয়। অতএব স্বরলিপি-প্রণালীর দোষ দেওয়া, কিম্বা সংগীত লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব মনে করা, অজ্ঞতার ফল। লিখিত ভাষা সম্বন্ধে এরূপ কেহই মনে করেন না যে, ভাষা লিখার সংকেত—বর্ণমালা—এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু কেবল অক্ষর নির্ভরেই কি সব পাঠ করা যায়? কখনই নহে। বালকে নাটক পড়িতে পারে না; বালক কেন, অস্মদ্দেশীয় ভদ্রসন্তানের মধ্যে অনেক বয়স্থ লোকেও নাটক পড়িতে পারেন না।

---

* 'গীতসূত্রসার' রচিত হয় ১৮৯৭ সালে। এই গ্রন্থটি পড়বার উৎসাহেই, শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায়ের কাছে শুনেছি,—লাখনৌ ম্যারিস কলেজ অব মিউজিকের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী বাংলা শিখেছিলেন এবং পরে সমগ্র গীতসূত্রসার তাঁর মাতৃ মরাঠী ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশও করে গেছেন। প্রসঙ্গত আমাদেরও জেনে রাখা উচিত, যে 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থ ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক পরম বিস্ময়কর সৃষ্টি—সঙ্গীতজগতে অমূল্য সম্পদ। গ্রন্থটি তথ্যসিন্ধু তো বটেই।

তজ্জন্য যে-অক্ষরে নাটক লিখিত হয়, তাহার দোষ কেহই দেন না ;—সে পাঠকেরই দোষ। কেননা যাঁহার সংস্কার ও অভ্যাস অধিক, তিনি অনায়াসেই পড়েন। অতএব সকল কার্য্যেই সাধনা ও সংস্কার,—দুই এরই বিশেষ প্রয়োজন। ভাষার অর্থনির্বিশেষে অসংখ্য প্রকার উচ্চারণের প্রয়োজন হয়—কিন্তু বর্ণমালায় তাহার শতাংশের একাংশ সংকেতও নাই। আর তাহা করাও অসম্ভব। তাহা করিলেও অক্ষরের জটিলতা দোষে কেহ কখন লিখিত ভাষা সহজে শিক্ষা করিতে পারিত না। অভ্যাস ও সংস্কার বলে সংকেতের ঐ অভাব আপনা হইতেই পরিপূরিত হইয়া যায়। অনেক সাহেব ইংলণ্ড হইতে হিন্দী ও বাঙ্গলা ভাষা উত্তম শিক্ষা করিয়া আইসেন ;—কিন্তু প্রথমতঃ তাহার বাঙ্গলা ও হিন্দী কথা এ দেশীয় লোক কেহই বুঝিতে পারে না। তাহাতে কেহ এরূপ মনে করে না, যে ঐ সকল ভাষা অলিখনীয়। পুস্তক দেখিয়া যেমন শিক্ষা করিতে হয়, তেমনি প্রথম প্রথম লোকের মুখেও সর্ব্বদা শুনিতে হয়,—তাহা হইলে সংস্কার শীঘ্রই জন্মে। ভাষার ন্যায় সংগীতেরও অনেক কার্য্য সংকেতদ্বারা লিখিয়া প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। ইহাতেও সংস্কার ও অভ্যাস দ্বারা সেই সকল অভাব পরিপূর্ণ হয়। ভাষাপেক্ষা সংগীত লিখা বরং সহজ,—কেননা ইহা কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মেরই অধীন। সেই নিয়মের অনুধাবন হইলেই, সঙ্গীত লিখা যাইতে পারে। যাহারা সঙ্গীত লিখার চর্চ্চা করে নাই, তাহাদের তাদ্বিষয়ে অবিশ্বাস হওয়া অসম্ভাবিত নহে।"

স্বরলিপি প্রসঙ্গে উপরের উদ্ধৃতিটি প্রত্যেক সঙ্গীতানুশীলনকারীরই পড়া অবশ্যকর্তব্য এবং তা মনোযোগ সহকারে পড়তে পারলে বোঝা যাবে, যে, আমাদের যাবতীয় সাহিত্যের ন্যায় সঙ্গীতকেও স্থায়িত্বের অধিকারী করে নেওয়া সম্ভব,—তার গতানুগতিক 'কালধর্মী' নামটি ঘুচিয়ে তাকেও করা যায় সবকালের। আর সত্যিই ত, বিশেষ বিশেষ যুগের সাহিত্যচিন্তাকে যদি ভাষালিপির* মাধ্যমে আমরা স্থায়িভাবে ধরে রাখতে পারি, তাহলে বিশেষ বিশেষ কালের সঙ্গীতচিন্তাকেই বা কেন ধরে রাখতে পারব না স্থায়িভাবে—স্বরলিপির মাধ্যমে ?

স্বরলিপি, কথালিপি বা ভাষালিপি

এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের উপমা টানলে হয়ত বিষয়টি, রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিক্ষানুরাগীদের কাছে স্পষ্টতর হতে পারে।

['অন্ধজনে দেহো আলো'—এ গানটি যতদূর জানা যায় রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন ১৮৯৬ সালের কাছাকাছি। সেই হিসাবে তাঁর বয়স তখন চল্লিশের নীচে। এই গানে

* আমাদের কণ্ঠনিঃসৃত ভাষা ও সুর দুটোই কানে শোনার জিনিস। কিন্তু যখন এদের আমরা লিখিতভাবে একটা পাকাপাকি রূপের মাধ্যমে চোখে দেখার জিনিসও করে তুলি কতকগুলি বিধিবদ্ধ সাংকেতিক চিহ্ন ও লিপির সাহায্যে,—তখন এদের নাম দিই যথাক্রমে "ভাষালিপি" ও "স্বরলিপি।"

তিনি কবে যে সুরারোপ করেন ঠিক বলতে পারব না,—তবে তাঁর আরোপিত সুরের স্বরলিপি প্রকাশিত হয় কাঙ্গালীচরণ সেন-কৃত ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপিগ্রন্থে বাংলা ১৩১১ (ইং ১৯০৪ ?) সাল নাগাদ [এরও আগে এ গান "১৩০৮ সালে সালের ভাদ্র-সংখ্যা-'সঙ্গীত প্রবেশিকা'র ১৪৬ পৃষ্ঠায় কাঙ্গালীচরণ সেন-কৃত স্বরলিপি সমেত প্রকাশিত" হয়েছিল (দ্রঃ বিশ্ববীণা, ১৩৭৩ শ্রাবণ-আশ্বিন, পৃ ১৯২)]—বলাবাহুল্য ওই প্রকাশিত স্বরলিপিতে কবিগুরুর তাৎক্ষণিক সঙ্গীতচিন্তাটা বিশেষভাবে ধৃত এবং পরিলক্ষিত। এই 'অন্ধজনে দেহো আলো' গানটাই রবীন্দ্রনাথ অনেক বৎসরকাল পরে (সম্ভবত তাঁর ৬৪ কি ৬৫ বৎসর বয়সে) যখন গ্রামোফোন-রেকর্ডে গাইলেন তখন দেখা গেল—এর সুরের উপর, কথার উপর তাঁর পরিণত বয়সের ব্যক্তিগত দরদ আবেগ ও স্বাক্ষর তিনি ফুটিয়েছেন অপূর্ব ভঙ্গীমায়—যা তাঁর ৪০ বৎসর বয়সের আগের দেওয়া সুরে তিনি ফোটান নি। এই পরবর্তীকালে রেকর্ডে গাওয়া সুরটিও লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করা হয়েছে বিশ্বভারতী-স্বরবিতান-২৭শ খণ্ডে; এবং সুবিধার বিষয় যে, এর মধ্যে কাঙ্গালীচরণ সেনের পূর্বকৃত স্বরলিপিটিও পুনরমুদ্রিত এবং সংযোজিত আছে।

এখন,—উক্ত দুইটি ভিন্ন-ভিন্ন স্বরলিপির মাধ্যমে একই গানের উপর কবির জীবিতকালের ভিন্ন-ভিন্ন দুই সময়ের যে ভিন্ন-ভিন্ন সঙ্গীতচিন্তার ও হৃদয়াবেগের পরিচয় আমরা পেলাম—সেটা পাওয়া সম্ভব হ'ত না কখনও—যদি না তা সুর রচনার সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে স্বরলিপিবদ্ধ হয়ে থাকত। কাজেই স্বরলিপির মাধ্যমে কোন সুরকারের সঙ্গীতচিন্তার ঐতিহাসিক মহিমাও যে উপরে বর্ণিত সাহিত্যেরই মতন সুরক্ষিত হতে পারে--এইটুকু বোঝাবার জন্যই আমার এই দৃষ্টান্তের অবতারণা। এমনতর দৃষ্টান্ত আরো খুঁজে দেওয়া যায়,—কিন্তু এখানে স্থান অপ্রচুর।

(তবে স্বরলিপিতে কারর 'গায়কি' অর্থাৎ গাইবার ঢঙ, এবং মনের ভাবধারাটি যথাযথ ধরা পড়ে না—একথা মেনে নিয়েও বলব,—কৈ ভাষালিপিতে কিংবা কথালিপিতে তো কারুর 'কথকি' অর্থাৎ কথা বলার ঢঙ্‌ এবং মনোভাবের যথার্থ রূপটি ধরা পড়ে না,—তাই বলে কি ভাষালিপির সঙ্গে আমরা সবাই আড়ি করে বসে আছি ?—আমরা কি কেউ অনুযোগ করে বলি যে, ভাষালিপিতে কথকের 'কথকি' তথা কণ্ঠস্বরের চরিত্র কিছুই যখন ধরা পড়ে না—সুতরাং এটাকে ব্যবহারের অযোগ্য করে ফেলে রাখা হউক !

গায়কি, কথকি

না,—তা হয় না কোনো কালেই, কোনো দেশেও।

আসলে ভাষালিপি ত্রুটিপূর্ণ হলেও এর ব্যবহারে আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ অভ্যস্ত এবং সংস্কারাবদ্ধ। এ বিষয়ে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বউদ্ধৃত উক্তির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবার বলি,—ভাষা লেখবার সংকেতাবলী কিন্তু মানবসমাজে আজও অসম্পূর্ণ। ভাষার অর্থ নির্বিশেষে যে অসংখ্য প্রকার উচ্চারণ আবশ্যক হয়—সেই

অনুপাতে সন্তোষজনক সংকেত আর ভাষালিপিতে কোথায়? তথাপি সারা বিশ্বের চলিত এবং গত, এমন কি বিস্মৃতপ্রায় যাবতীয় তথ্যাদি কে না অবগত হচ্ছেন ঐ ভাষালিপিরই সাহায্যে। কাজেই-ভাষালিপি পদ্ধতি তার অসম্পূর্ণতা নিয়েই আমাদের কাছে যেমন আদরণীয়, তেমন প্রয়োজনীয়। অথচ অন্যদিকে স্বরলিপির কদর আমাদের কাছে কতটুকুই বা—শুধু তো ঐ এক গানের বেলায়! তাও আবার এরদ্বারা গায়কের 'গায়কি' তথা কণ্ঠস্বরের চরিত্র ঠিক ধরা যায় না এই তুচ্ছ অজুহাত দেখিয়ে স্বরলিপির প্রতি বিমুখতার ভাব পোষণ করেন তথাকথিত দায়িত্বশীল সঙ্গীতবেত্তারাই বেশি—এইটাই বড় দুঃখের বিষয়। এবং এর পরিণতিতে আমরা কি পাই? সত্যের খাতিরে বলতে হয়: সংগীত এবং সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে একটা অতলস্পর্শী বিশৃঙ্খলার আবর্তন! প্রত্যেকেই শান্তমনে বিচার করে দেখুন,—আমাদের দেশে অতীতে স্বরলিপি-পদ্ধতি অজ্ঞাত ছিল বলেই তো প্রাচীনকালের বহু গুণী সঙ্গীতসুরস্রষ্টাদের কত অমূল্য সৃষ্টিই আমরা হারিয়েছি। যা-ও বা কিছু গুরুপরম্পরা হিসাবে গায়কদের কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে ধরা আছে বলে অনেকে অনেক সময় গর্ব বোধ করেন, তা-ও কি আর যথার্থ অবিকৃত? মোটেই না। এছাড়া স্বরলিপি-পদ্ধতি প্রবর্তিত হবার পরেও দেখা যায়,—প্রামাণ্য স্বরলিপির অভাবে কত বিশিষ্ট সুরকারেরই সুরকে আমরা যদৃচ্ছভাবে ব্যবহার করছি—এমনকি নিজ নিজ মনগড়া রূপ দিয়ে সাজিয়ে সেটা পুনরায় তাঁদেরই নামে চালিয়ে দেবার অপচেষ্টাও কি কম হচ্ছে;—আর এই নিয়ে এক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আরেক বিশেষজ্ঞের চলছে অনবরত কত না মতবিরোধ! এমনতর সব লোকশানের কি কোনো হিসাব আছে?

কিন্তু বলছিলাম,—'কথকি' কিংবা 'গায়কি'র ধর্ম যা,—ভাষালিপি কিংবা স্বরলিপির ধর্ম তা নয়। প্রথমটি অর্থাৎ 'কথকি' ও 'গায়কি' হল শ্রাব্য—কানে শোনার জিনিস; আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ 'ভাষালিপি' এবং 'স্বরলিপি' হল পাঠ্য—চোখে দেখার জিনিস। এই মূল পার্থক্যের তাৎপর্য বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে যথাযথ বুঝতে পারলে এ সম্পর্কীয় সমস্যার সমাধান অমনিতেই হয়ে যাবার সম্ভাবনা—এ ক্ষেত্রে অযথা তর্ক নিষ্প্রয়োজন। প্রসঙ্গত মনে পড়ল কবিগুরু একবার বলেছিলেন:

> "গান গাওয়াকালীন সব সময় স্বরলিপি হুবহু মেনে চলাটা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না—বিশেষ করে আমাদের দেশের গানগুলিতে। তার কারণ, আমরা সাধারণতঃ গান শিখি কানে শুনে, চোখে দেখে নয়। শুধু কানে শুনে গান শেখাটাই আমাদের দেশের সঙ্গীতশিক্ষার চলতি পদ্ধতি—সুতরাং অনভ্যস্ততার দরুন, স্বরলিপি সামনে থাকলেও চোখের কাজ সমান তালে চলতে পারে না অনেকের। এই অবস্থায় স্বরলিপি মেনে চলতে গেলে...গানের সুর অনড়-অচল হয়ে দাঁড়ায়, একথা একেবারে মিথ্যে নয়। কিন্তু...পশ্চিমের ওরা দু'টোতেই অভ্যস্ত। তাই মনে হয়, যদি ওদের মত

করে তোরাও স্বরলিপির বই সামনে রেখে গান করার অভ্যাসটা স্বভাব-দুরস্ত করে ফেলতে পারিস তাহলে বোধহয় গানের সুর পরিবেশনে তত খারাপ শোনাবে না কখনও।···বিশ্বভারতী কর্তৃক মুদ্রিত স্বরলিপিগুলিকে বিশুদ্ধ ভাবে অনুসরণ করাই তোদের পক্ষে বিধেয়।"—(মাসিক বসুমতী, ১৩৫৪ আষাঢ়)।

মোটের উপর স্বরলিপির আবশ্যকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই সচেতন ছিলেন এই কথা বর্তমান নিবন্ধের শুরুতেই বলেছি; এখনও ফের বলছি, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন তিনি এর গুরুত্ব। তাঁর গানকে একমাত্র স্বরলিপিরই সাহায্যে বংশপরম্পরায় অবিকৃত রাখা সম্ভব এটা বুঝেছিলেন বলেই নিজে উদ্যোগী হয়ে একেবারে গোড়া থেকে তাঁর গানে স্ব-আরোপিত প্রত্যেকটি সুর সুযোগ্য স্বরলিপিকারদের দিয়ে যথানিয়মে লিপিবদ্ধ করিয়ে রেখে যেতে তিনি ভোলেন নি একটুও—এর প্রমাণ: বিশ্বভারতী প্রকাশিত একাধিক স্বরলিপি-গ্রন্থমালিকা। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বরলিপি করতে এবং পড়তে জানতেন*—কিন্তু একাজ তাঁর অভ্যাসের মধ্যে ছিল না। কাজেই তাঁর কণ্ঠানঃসৃত সুর লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব নিয়েছেন,—আমরা স্বরলিপিগ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বরলিপিকারেরা,—তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

যেহেতু স্বরলিপিই হল কোনো বিশেষ সুরকার-প্রদত্ত গানের সুরের নির্ভুলতা যাচাই করবার একমাত্র প্রামাণ্য মাপকাঠি সুতরাং একবার প্রকাশিত তথা প্রচারিত, বিশেষ করে স্বয়ং সুরকার কর্তৃক অনুমোদিত স্বরলিপির পরিবর্তন কিংবা সংশোধন, সুরকারের অবর্তমানে, কোনোকালেই যুক্তিযুক্ত কিংবা বৈধ বলে বিবেচিত হতে পারে না। হলে এর দ্বারা স্বরলিপি-আনুগত্যকারীদের চিত্তের যেমন নিশ্চিতরূপে বিভ্রান্তির পথে যাবার সম্ভাবনা থাকে, তেমনি স্বরলিপি তৈরী করার আসল উদ্দেশ্যের মূলেও আঘাত পড়ে বিস্তর। এই ব্যাপারটা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করতে গেলে বলতে হয়,—পূর্বতন কোনো স্বরলিপিকার-কৃত স্বরলিপি যদি কোনো কারণে সহসা অস্পষ্ট তথা অবোধ্য হয়ে পড়ে,

* রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর রচিত গানের স্বরলিপি করেছেন এবং তাঁরই স্বহস্তালখিত স্বরলিপির ফোটো-ষ্টাট্ কপি ১৩৪৯ সালের 'বিশ্বভারতীপত্রিকা' ভাদ্রসংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে দ্রষ্টব্য। তাছাড়া কাব-কৃত অন্য কোন স্বরলিপি অধিকতর দ্রষ্টব্য আকারে আছে বলে জানা যায় না। তবে ভারত স্বাধীনতা লাভের কিয়ৎকাল পরেই মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশানুযায়ী বিশ্বভারতী, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গানের স্বরলিপি তৈরি করে ১৯৪৭ সালের যুগান্তর এবং অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করাকালীন তার শিরোনাম দেন: "Vandemataram Swaralipi Set By Rabindranath Tagore" (!) এবং এরও বহুকাল পরে ১৯৬৪, ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৬৮, ১৯৭১ সালে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-জন্মোৎসব' নামীয় বিশ্বভারতী-গ্রন্থনবিভাগের পুস্তক-তালিকাগুলির মধ্যে বিজ্ঞাপিত দেখা যায়: "বন্দেমাতরম॥ রবীন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি॥ •'৩•"—বিষয়টি, ঈষৎ ভ্রান্তিকর এবং তা লেখক-কর্তৃক সংশ্লিষ্টজনের নজরে এলে, অধুনা: "বন্দেমাতরম॥ সুর: রবীন্দ্রনাথ॥ •'৩•"—এই আখ্যায় পরিবর্তিত হয়েছে অথচ এমন পরিবর্তনের পিছনে কোন বিধিসম্মত কারণ দর্শানো হয়নি, এ-ও গবেষণাকারীদের অবশ্য দ্রষ্টব্য।

এমনকি স্বরলিপিতে আবদ্ধ সুরের ভিতরেই যদি কালের পরিবর্তনহেতু সন্দেহজনক ভাবে কোনো গরমিল পাওয়া যায়,—তাইজন্যে উক্ত লিপির উপর কলম চালিয়ে তাকে নূতন আকাবে সংশোধন কিংবা অদল-বদল করে নেওয়া কারো পক্ষেই শোভন নয়, সমুচিতও নয়। বরং প্রয়োজন পড়লে একে ব্যবহারের অযোগ্য বলে বাতিল করে দিয়ে সেই জায়গায় নূতন কাগজে নূতনভাবে পৃথক স্বরলিপি তৈরি করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ, স্বরলিপি হল লিপিবদ্ধ জিনিস। যে কোনো লিপিবদ্ধ জিনিসকে অদল-বদল কিংবা সংশোধন করতে গেলে তার মধ্যে ধৃত-লিপি সমূহের আদি অর্থাৎ মূল রূপটিকে তো আর যথার্থ আকাবে অবিকৃত রাখা যায় না—সেটা কিছু-না-কিছু damaged হয়ই. এবং সেই অবকাশে তা আবাব অনেক সময় নানা দুর্বিপাকে বেশ ভেজালও হয়ে দাঁড়ায়।

যেমন ধরুন—আপনি আজ আপনার একখানা ফোটো তুললেন। কিছুকাল বাদে যখন আপনার চেহারা বদলে যাবে তখন নিশ্চয় এই ফোটোতে তোলা চেহারাটা আপনার বদলাবে না। তবে কোনো চিত্রকর স্বীয় কৃতিত্ব দেখাতে গিয়ে যদি এর উপর তাঁর রং তুলি বোলান এবং চেহারাও কিঞ্চিৎ বদলে দিতে পারেন আপনার চাহিদা মত, তাহলেও তো ফোটোটা damaged হবেই—টাটকা নির্ভেজাল থাকবে না তা। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে আপনার এই বদলে যাওয়া নূতন চেহারাকে নির্ভেজাল ভাবে ধরে রাখতে হলে আপনাকে কিন্তু আবার নূতন ফোটোই আরেক খানা তুলতে হবে। ঠিক তেমান—কোনো গানেব পুবনো সুব বদলে সেই জায়গায় যদি একান্তই নূতন সুর দেবার দরকার হয়, তাহলে এই নূতন দেওয়া সুরের নূতন স্বরলিপি তৈবি করাই সর্বতো-ভাবে বাঞ্ছনীয়,—পুবনো স্বরলিপিটাকে তাইজন্যে কোনো সুযুক্তিতেই একটু-আধটু বদলে উপরে বর্ণিত ফোটোগ্রাফের অনুরূপ damage করে দেওয়া যেতে পারে না। কেননা, স্বরলিপিটাও তো সুররচয়িতা-সৃষ্ট তাঁর তাৎক্ষণিক সুরের একটা ফোটোগ্রাফই।

কাজেই দেখা যাচ্ছে,—কালের আবর্তে গান পারবেশনকালীন গায়ক গায়িকাদের কণ্ঠে, কখন-সখন সুরের একটু এদিক-সেদিক হয়ে গেলেও—স্বরলিপিতে আবদ্ধ করে রাখা সুরটি কিন্তু চিরকালের জন্যেই অপারবর্তিত থেকে যায়। এই অত্যাবশ্যকীয় মূল্যবান কথাটা যথাযথ উপলব্ধি করার অভাবে আবাব দেখা যায় অনেক গীতশিক্ষার্থী, বিশেষ করে যারা কোনো বিশিষ্ট সুরকারের বাঁধা সুরের অনুগত হয়ে চলতে উৎসাহী অথচ স্বরলিপি লিখন-পঠনে অক্ষম তাঁরা, বড়ো ধাঁধায় পড়েন এবং সুরকারের প্রামাণ্য সুর নিয়েও নানা রকমের প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হন অনেক সময়। তখন তাঁদের জানা এবং বোঝা দরকার,—সুরকার প্রদত্ত সুরের প্রামাণ্য স্বরলিপি পেলে তার প্রামাণ্য সুরটিও পাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব। আর, স্বরলিপি যদি প্রামাণ্যই না-হয় তাহলে তো সুরকারদের প্রদত্ত লিপিবদ্ধ সুরের প্রামাণিকতা তথা নির্ভুলতা যাচাই করা নিয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, স্বরলিপিবিহীন গানের সুরগুলি সাধারণত 'গুরুমুখী'।

গুরুরা ইচ্ছামত সুরের পরিবর্তন করতে পারেন,—করেনও। এই অভ্যাস তাঁদের চিরাচরিত। গীতকলা চর্চার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গুণীমহলে এটা বিশেষ এক গৌরবময় কাজ হিসাবেও স্বীকৃতি পায়; তাই হয়ত ঐ গুরুগণের শিষ্যপ্রশিষ্যবৃন্দ সেদিকে সহজে বেশি আকৃষ্ট হন। কিন্তু যথার্থ প্রতিভার অভাবে এইরূপ গুরুমুখী বিদ্যার ফল কখন-সখন আবার ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ারও অবকাশ থাকে। তবে স্বরলিপিতে সুর বাঁধা থাকলে কারো পক্ষে সে-কাজ করা তেমন সহজ হয় না, কারণ এটা নিশ্চিত, যে, এক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আরেক বিশেষজ্ঞের যখন ঐ সুর নিয়ে মতানৈক্য ঘটে তখন ব্যাপারটা জটিল ও অপ্রীতিকর হয়ে দাঁড়ায় এবং এমনতর পরিস্থিতিতেই সুরের প্রামাণিকতা বিচারের উদ্দেশ্যে—প্রামাণ্য স্বরলিপিটিরও খোঁজ নিতে আমরা বিশেষ করে বাধ্য হই। তবে "প্রামাণ্য" শব্দটির অর্থ সম্পর্কে সকলের জ্ঞান স্পষ্ট কিনা তা বিচারের জন্য এখানে সামান্য এক উপমা রাখছি।

মনে করুন আপনি গানেব সুরকার—গানে যখন সুর দিচ্ছেন তখন আপনার সামনে রামবাবু ও যদুবাবু নামে দুইজন বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদ্ উপস্থিত। রামবাবু আপনার সুর শুনে তা তৎক্ষণাৎ কাগজে লিখে নিলেন অর্থাৎ স্বরলিপি করলেন। তারপর ঐ স্বরলিপি আপনাকে দেখিয়ে আপনাকে দিয়ে যথানিয়মে অনুমোদনও করিয়ে নিলেন তিনি। যদুবাবু কিন্তু এসবের কিছুই করলেন না,—শুধুমাত্র গানের সুরটা কানে শুনে রাখলেন। এই ঘটনার অনেক কাল পরে—আপনি যখন পৃথিবীতে নেই এবং রামবাবুও স্থানান্তরে, তখন আপনার দেওয়া সুরটার আমাদের প্রয়োজন পড়ল। আমরা অগত্যা যদুবাবুর দ্বারস্থ হলাম। একথা তো ঠিক যে যদুবাবু একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ এবং রামবাবুরই মত তিনিও একসঙ্গে বসে বহুকাল আগে আপনার মুখ থেকে ঐ একই গান শুনেছিলেন। সেই বিশ্বাস নিয়ে যদুবাবু, আমাদের অনুরোধে, আপনার গানটির দ্বিতীয় স্বরলিপি করলেন,—কেবলমাত্র তাঁর স্মৃতিতে যে সুর গাঁথা ছিল এর উপর নির্ভর করে। এর মধ্যে সুরের ভুলত্রুটি কিছু হল কিনা—সে বিষয়ে যদুবাবু কোনো চিন্তা করলেন না। যদুবাবুর করা এই দ্বিতীয় স্বরলিপিটি ইতিমধ্যে সর্বত্র চালু হয়ে গেল। এরপর একদিন রামবাবু ফিরে এলেন এবং আমরা তাঁর করা সেই প্রথম স্বরলিপিটিও পেয়ে গেলাম। তখন দেখা গেল, রামবাবুর এবং যদুবাবুব স্বরলিপিতে বেশ কিছু-কিছু অমিল আছে।

'প্রামাণ্য স্বরলিপি' শব্দের ব্যাখ্যান

এখন প্রশ্ন হল: কোন স্বরলিপিটা প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে—রামবাবুর করা প্রথমটা—না যদুবাবুর করা দ্বিতীয়টা?

এর একমাত্র জবাব: রামবাবুর করা প্রথম স্বরলিপিটাই প্রামাণ্য স্বরলিপি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, বিশেষত এটা যখন সুরকারের সামনে বসে সুর আরোপণের সঙ্গে সঙ্গেই নির্মিত এবং স্বয়ং সুরকার কর্তৃক অনুমোদিতও।

বস্তুতপক্ষে প্রামাণ্য স্বরলিপি সম্পর্কিত বিচারের কাজ কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায়*।

সুতরাং এরই প্রেক্ষিতে এ মন্তব্যও করা যেতে পারে, যে, প্রামাণ্য স্বরলিপি না পেলে কোনো সুরকার-প্রদত্ত (বিশেষ করে যে সুরকার সাক্ষাৎরূপেতে অনুপস্থিত, তাঁর) যে-কোনো সুরের প্রামাণিকতা নিয়ে আলোচনায় শুধু শুধু এক বিচারকের সঙ্গে আরেক বিচারকের বাক্‌বিতণ্ডা ঘটানোই সম্ভব,-- এর দ্বারা আলোচ্য বিষয়ের সুষ্ঠ সমাধান কখনও ঘটে না। এবং ইত্যাকার পরিস্থিতিতে "প্রামাণ্য" শব্দের ব্যবহারও সকলের কাছে একেবারে অর্থহীন একটা প্রহসন হয়ে থাকে মাত্র।

উপরোক্ত উপমা-সংবলিত বিবৃতিটুকু এক্ষেত্রে উল্লেখের বিশেষ প্রয়োজন পড়ল এই মনে করে, যে, শোনা যায় বর্তমান যুগে নাকি ভেজালের সংমিশ্রণ ঘটে থাকে সর্বত্রই,—এবং অনেক সময় অনেক খাটি দ্রব্য-সংরক্ষককেও আদর্শচ্যুত হয়ে নানা দুর্বিপাকে উক্ত দ্রব্য-সংহারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়! যদি রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে প্রমাদবশতঃ ঐ রকমের কোনো দুর্ঘটনা কখনও না ঘটে, তাহলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় যে স্বরলিপিকারদের স্বরলিপি স্বয়ং অনুমোদন করে নিজেরই তত্ত্বাবধানে প্রকাশ ও প্রচার করে গেছেন (১৯৪১ সালের আগে পর্যন্ত)—একমাত্র সেগুলিই যে সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য এবং রবীন্দ্রসুরের বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রামাণ্য হিসাবে চিরকাল নির্দ্বিধায় গৃহীত হবে—সে কথা এক্ষেত্রে অতিরিক্তভাবে বুঝিয়ে বলা বাহুল্য বোধ করি।

সর্বশেষে রবীন্দ্রসঙ্গীত-স্বরলিপি ব্যবহারকারীদের প্রতি একটি নিবেদন,—ভাল গান গাইতে পারলেই যে স্বরলিপি লিখন-পঠনের বিদ্যাটি অনায়াসে উপার্জিত হয়ে যাবে তা যেন কখনো কেউ না ভাবেন। যাঁদের স্বাভাবিক সুর-বোধ আছে তাঁদের পক্ষে কানে শুনে গান শেখা তেমন কঠিন কিছু নয়—বিশেষতঃ এই রীতিতেই যখন গান শেখার কাজটি আমাদের মধ্যে বহুকাল আগে থেকেই চলে আসছে,—এমন কি এরই ভিতর সুষ্ঠ ও সুশিক্ষার পরিণতিতে শ্রুতির সাহায্যে সুরের স্বরগ্রামগুলিও যখন অনেক শিক্ষার্থীরা নির্ভুলভাবে কণ্ঠে উচ্চারণ করতে পারেন—তাও বহুক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু মুশকিল হল,—কণ্ঠে উচ্চারিত সেই স্বরগ্রামগুলি কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ করতে গেলেই যে তাদের সমূহ বিপদ। কেননা. এখানে লেখাপড়া জানার প্রশ্ন এসে পড়ে। আর প্রকৃতপক্ষে স্বরগ্রাম লিপিবদ্ধ করার কাজই যে লেখাপড়ার কাজ, এবং সুর একটিবার লিপিবদ্ধ হলেই ত সেটা চোখে দেখে পড়বার জিনিসও হয়ে দাঁড়াল—অর্থাৎ হল স্বরলিপি। স্বরলিপি লেখার জন্য আবার হস্তলিপিটাও কিন্তু পরিষ্কার ও সুশ্রী হওয়া চাই। সোজাকথায়

* এর পরেও যে এই কাজের মধ্যে কোন্ প্রণালীতে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে এই নিয়ে, ১৯৭৫ সালের ১লা জানুয়ারী কলিকাতা টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট-আয়োজিত 'রবীন্দ্রসাহিত্যসম্মেলনে'র সঙ্গীত-অধিবেশনে গ্রন্থকার-কর্তৃক এক লিখিত প্রবন্ধ পঠিত হয়। বিষয়টি রবীন্দ্রসঙ্গীত-গবেষণানুরাগীদের অনুসন্ধেয়। এর আরো বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে আমার 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রামাণ্য সুরপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে।

—স্বরলিপি ব্যবহার করতে গেলে—প্রত্যেক স্বরলিপি-ব্যবহারকারীর লেখাপড়ার প্রতিও থাকতে হবে সমান প্রীতি, শ্রদ্ধা ও নৈপুণ্যবোধ। যদি বলি, চোখে দেখে অর্থাৎ স্বরলিপি পড়ে গান শেখার কাজ আয়ত্তে আনা,—'স্কলার'-মনোবৃত্তিসম্পন্ন যে সব গীতার্থী—শুধুমাত্র তাঁদেরই দ্বারা সম্ভব—তাহলে আশাকরি ভুল বলা হবে না। বিষয়টা সকলকেই ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। তদুপরি ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় যে বলেছিলেন: "স্বরলিপির সংকেতাবলি চিনিতে, ও তাহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেই যে গান গাওয়ার ক্ষমতা জন্মে, এরূপ মনে করা উচিত নহে। স্বরলিপি দেখিয়া দুই-এক বৎসর নিরন্তর অভ্যাস করিলে তবে লিপি দৃষ্টিমাত্র নূতন গান বিশুদ্ধরূপে গাওয়া সম্ভব হয়।"—এই কথাগুলি যথাযথ সমঝে নিয়ে স্বরলিপি-অনুশীলনকারীরা নিজেদের কাজেতেও অবশ্য ব্যবহার করবেন। বিশেষকরে ঐ "নিরন্তর অভ্যাসের" জন্য যারা সময় দিতে অক্ষম—তাঁদের পক্ষে স্বরলিপির সাহায্যে গান তোলার চেষ্টা পরিহার করাই বোধকরি শ্রেয়। অভ্যাস নিরন্তর না হলে কোনো সাধনাই খাঁটি হয় না—ফলে যে-অভ্যাসটি আয়ত্তে আসে—সেটা চাঞ্চল্যেরই রূপান্তর। আর এই চাঞ্চল্যের অনুগত হয়ে স্বরলিপি ব্যবহারে প্রবৃত্ত হলে যে হিতে বিপরীত ঘটবে—সে কথা কে না বোঝেন! কাজেই এসব বিবেচনায় মনে হয়,—স্বরলিপি শিখবার কাজে নিরন্তর অভ্যাসে যারা অসমর্থ তাঁদের পক্ষে উচিত—'গান গুরুমুখী বিদ্যা' এই বাক্যটিকেই শিরোধার্য করে নেওয়া। অর্থাৎ গান মূলতঃ শিখবেন তাঁরা গুরুর মুখ থেকে শুনে শুনে—আর স্বরলিপি থাকবে শুধু তাঁদের ভুল নিবারণের উপায় হিসাবে।

পক্ষান্তরে—যাঁরা স্বরলিপি-বিদ্যা অনুশীলনে একান্তভাবে আগ্রহী ও ব্রতী তাঁরা লক্ষ্য রাখবেন, স্বরলিপি লেখার কাজ যেমন দ্রুত,—এর পাঠটিও যেন তাদের তেমনই সম্পূর্ণ সাবলীল হয়। সাবলীল বলছি এই অর্থে—'আমরা' যেমন একেবারে ছেলেবেলা থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল দিনে-রাতে অপরিসীম একাগ্রতার সঙ্গে শুধু অক্ষর-পাঠাভ্যাস করার ফলে চিঠি কিংবা পুস্তকাদি অনায়াসে পড়তে পারি, এমন কি—পড়বার সময় এর আভ্যন্তরীণ ভাব প্রকাশেরও কোনো ত্রুটি ঘটে না—ঠিক তেমনি করে স্বরলিপি পড়তে পারা চাই। অর্থাৎ একাজের মধ্যেও পাঠকের সারাজীবনব্যাপী সঞ্চিত পাঠাভ্যাসের অনুরূপ নিরবচ্ছিন্ন একাগ্রতা থাকতে হবে বৈকি। মোটকথা, শুধু চোখে দেখামাত্র কোনো আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য না-নিয়ে লিপিবদ্ধ সুরটি যেদিন আপনি গলায় তুলতে পারবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সুর সংবলিত গানের কথার ভাবটিও পারবেন প্রকাশ করতে—সেদিনই আপনার স্বরলিপিবিদ্যা আয়ত্ত করার শিক্ষাটি হবে সার্থক,—পাঠও হবে সাবলীল!

উপরোক্ত সমগ্র আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসংশয়ে এই মন্তব্য করা যায়, যে, শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই গান নয়—সব রকম গান শিখবার ব্যাপারেই স্বরলিপির আবশ্যকতা

ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজী একবার কথাপ্রসঙ্গে গীতসন্ন্যাসী দিলীপকুমার রায় মহাশয়কে বলেছিলেন :

"আমি সারা ভারতবর্ষটা ঘুরে বড় বড় ওস্তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করে তবে বলছি··· রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ আমাকে রচনা করতে হল—ওস্তাদরা স্বরলিপির ধার ধারেন না, রাগসঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ধার-পাশ দিয়েও যান না বলে।···হ্যাঁ ওস্তাদদের আছে রেয়াজ। অসাধারণ তাঁদের সাধনা। আশৈশব ঐ-ই করেছেন তো। গলা একেবারে পোষ মেনে গেছে—যা হুকুম কর তামিল করবে। যেখানে ইচ্ছে চালাও চলবে,থামাও থামবে। শুনে শুনে ছাপ বসে গেছে—সব জড়িয়ে। কিন্তু তা'বলে বিশ্লেষণের কিছুই জানেন না,—কারণ স্বরলিপিজ্ঞান নেই।···অবশ্যি দু-একজন ব্যতিক্রমের কথা ছেড়ে দিতে হবে।···ভালো গাওয়া যার একমাত্র আদর্শ, তার বিশ্লেষণ নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে। কিন্তু যদি সহজে অপরকে নিজের শিক্ষার ফল দিতে চাই তাহলে স্বরজ্ঞানের কাছে হাত পাততেই হবে। এতে করে যে কতখানি শ্রম লাঘব হয় তা স্কুল করতে গিয়ে আমি চাক্ষুষ করেছি"—(ভ্রাম্যমান পৃ ১১০-১১১)।

আমার বলার কারণও প্রায় ওই এক, যে,—বিশেষভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুশীলনেই যাঁরা একান্ত ইচ্ছুক তাঁরা সকলে যখন দীর্ঘকাল ধরে ওস্তাদি পদ্ধতিতে গান শিখে ওস্তাদ হচ্ছেন না বড় একটা—বরং গান অল্পসময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সহজে শিখে নিয়ে নিজেদের শিক্ষার ফল অপরকেও দিয়ে চলেছেন অকৃপণধারে (অধুনা রবীন্দ্রসঙ্গীতের বহুলপ্রচারই তো এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ) তখন এই শিক্ষালব্ধ গানের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণাদি নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার তো বেশি রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিক্ষানুরাগীদেরই,—এবং এর সার্থক রূপায়ণেব জন্যে বিধিসম্মত ভাবে স্বরলিপি পাঠাভ্যাসও তাঁদেরই পক্ষে অতি অবশ্য শিক্ষণীয়।

প্রসঙ্গত বলা ভাল,—রবীন্দ্রসঙ্গীতের কেন,—যে কোনো সঙ্গীতেরই প্রাণবস্তু কিংবা তার সজীব ভাবদেহটিকে স্বরলিপি ধরে এনে দিতে পারে না, স্বরলিপি হল সুরের প্রাণহীন কংকালমাত্র—ইত্যাকার মন্তব্যগুলি সর্বজনবিদিত এবং আংশিক সত্য,—এরমধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। তবু এর সূত্র ধরে কথার পর কথা সাজিয়ে বিতর্কের জাল বুনতেও সুখ পান অনেক তার্কিকগুণিজন। কিন্তু এই ধরণের বিতর্কশোভিত বাক্‌আড়ম্বরের মোহ থেকে স্বরলিপি শিক্ষাব্রতীদের বুদ্ধিকে সব সময় নির্মুক্ত রাখতে হবে ;—শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের এইটে বুঝতে হবে যে, স্বরলিপি করার-কাজে বিশেষজ্ঞব্যক্তিরাই স্বরলিপিতে. স্বরের মাত্রানুসারে গানের কথার অক্ষরগুলি এমনভাবে বসিয়ে রাখেন যা ঠিক ঠিকভাবে গ্রহণ করতে প্রথম প্রথম অনেকের পক্ষে কিছুটা অসুবিধা কিংবা অস্বাভাবিক মনে হলেও—যথানিয়মে তা অনুশীলন করে নিয়ত কঠিন ধৈর্যের সঙ্গে অভ্যাস তথা রেওয়াজ করতে পারলে—এটাই

যে-কোন-গানে আরোপিত সুরের নির্ভুলতা বিচার

একদিন স্বাভাবিক সৌন্দর্যে পরিণত হয়। তবে শিক্ষার সামান্য একটু ভান করেই তা সম্পূর্ণ শেখা হয়ে গেছে এমনতর আত্মবঞ্চনার অনুশীলনটিও কিন্তু এক্ষেত্রে আবার শিক্ষার্থীদের জীবনে নিশ্চিতরূপে বিপরীত ফল টেনে আনে এটাও সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার—যা এই প্রবন্ধেরই ২৯ থেকে ৩২ পৃষ্ঠার মধ্যে আগে একবার বুঝিয়ে বলা হয়েছে বিশেষ করে। তাছাড়া সর্বকালে সর্বদেশে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীর যোগ্যতা নিরপেক্ষভাবে দেখতে হলে কিন্তু তা ঐ স্বরলিপি-পাঠের দক্ষতার উপরেই একমাত্র বিচার্য। আর একথা কোন বিবেচকই বা না বোঝেন, যে,—এই বিশ্বসংসারে কোনো কিছুরই সঠিক বাস্তববিচার কেবলমাত্র ভাববিলাসের কিংবা মৌখিক তর্কের চাতুরী দ্বারা সাধিত হয় না—তার জন্যে উপযুক্ত দলিলপত্রের প্রয়োজন পড়ে; এবং গানের মধ্যে বাঁধা-সুরের অন্যতম দলিলপত্রই হল 'স্বরলিপি'।

এখানে বিশেষ প্রয়োজনবোধে আবার বলতে বাধ্য হচ্ছি—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত সুরগুলি তাঁর অবর্তমানে যাতে সকলে অবিকৃতভাবে পেতে পারে এর সব রকম ব্যবস্থা করে গেছেন—নিজেরই উদ্যোগে স্বরলিপির মাধ্যমে সেগুলি ছাপিয়ে—প্রকাশ ও প্রচার করে। আজ যদি কোনো গায়ক বা গায়িকা ঐসব প্রকাশিত ও প্রচারিত স্বরলিপিগুলির প্রতি বিমুখতা দেখিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর নিজের খুশিমত এদিক-সেদিক করে গেয়ে তা রবীন্দ্রনাথেরই নামে চালিয়ে দেবার বাহাদুরী নেন—তবে সেটা যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টি ও প্রচেষ্টার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানো হয়—তা বোধকরি আর ব্যাখ্যা করে বোঝাবার প্রয়োজন পড়ে না। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে, গানের প্রকাশভঙ্গীতে গায়কে-গায়কে পার্থক্য থাকেই—সেটা সব সময় গীত-রচয়িতার ইচ্ছা-অনুরূপও হতে পারে না (এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় আমরা আসব—একটু পরে পৃথক ভাবে),—তাই বলে গায়কেরা, গানের সুর-রচয়িতার সুরের যে-স্বরটি বিশেষভাবে স্বরলিপিতেই আবদ্ধ, সেই সুরকে সামান্যতম এদিক-সেদিক করবেন কোন যুক্তিতে—যদি সঙ্গীতবিদ্যা তাঁদের যথার্থই আয়ত্তে থাকে? বলতে খারাপ লাগে তবু নিরুপায়ের মত বলতেই হয়,—যে-কোনো গানের সুরের বাঁধা স্বরলিপি থাকা সত্ত্বেও সেই বাঁধা স্বরলিপিটির উপর মনোযোগ না দিয়ে স্বরলিপিবদ্ধ গানকে নিজের খেয়ালখুশিমত এদিক-সেদিক করে গাইবার কাজটি—গায়কদের পক্ষে শুধু তো অশালীনতা নয়—তাঁদের অজ্ঞতা এবং অসংযমতারই পরিচায়ক। রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর এমনতর অপ্রিয় দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে সেদিকে যদি রবীন্দ্রগীত-ভক্তেরা ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের যাবতীয় অনুরাগীবৃন্দ সতর্ক দৃষ্টি রাখেন তাহলে দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায়,—রবীন্দ্রসঙ্গীত কোনোকালে কোনো অবস্থাতেই কোনো রকমের পক্ষপাত দুষ্টে দূষিত হবে না,—স্বমহিমায় চিরবিশুদ্ধ ও পবিত্র থাকবে। এবং বিশেষ করে সঙ্গীতে এই পবিত্রতাটুকু অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যেই আমার ব্যক্তিগত অভিমত: স্বরলিপিকেই

রবীন্দ্র-রচিত সুরের দলিল

রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার ও চর্চার সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম বলে আমাদের মধ্যে সর্বত্র মেনে নেওয়া উচিত।

*　　　*　　　*

এবার রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিল্পীর স্বতন্ত্রতা নিয়ে আলোচনার প্রারম্ভে একটি কথা স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে, 'স্বতন্ত্রতা' কিংবা 'স্বাধীনতা' এই জাতীয় শব্দগুলি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বেশ একটু অস্পষ্ট ও গোলমেলে,—মূল আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ী এদের প্রয়োগ করা হয় না বলেই বোধকরি। যেমন,—শোনা যায় রবীন্দ্রসঙ্গীত নাকি এমন একটা ব্যাপার, তার মধ্যে গায়কদের নেই কোনো স্বাধীনতা'! স্বাধীনতা বলতে যদি (waywardness) উচ্ছৃঙ্খলতা কিংবা যথেচ্ছাচারিতা মনে করি তাহলে বলব সে জিনিস রবীন্দ্রসঙ্গীতে কেন—কোনো সঙ্গীতেই নেই।

সংগীতামোদী মাত্রেরই জানা আছে, যে, ভারতীয় গানের ধারায় গায়কেরা সুর-বিস্তারের কাজে অনেকটা স্বাধীনতা পান। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, সেই স্বাধীনতা কি ভারতীয় শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের চিরাচারিত ঐতিহ্যের নিয়মকানুন ও আদর্শকে লঙ্ঘন করে কোথাও প্রতিপালিত হয়?—হয় না নিশ্চয়। বরং যদিও বা কোথাও দৈবাৎ কোনো-না কোনো কারণে এর বাঁধা নিয়মের উপর অতি সামান্যতম ব্যতিক্রম ঘটে,—তক্ষুনি কি গায়কে-গায়কে বাধে না সংঘর্ষ? এমনতর ঘটনা ত প্রত্যক্ষ করাব সুযোগ জুটে কোনো কোনো শ্রেণীর ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতজ্ঞদের আসরেই বেশি। সংঘর্ষকারীদের মধ্যে সাধারণতঃ নিজ নিজ জ্ঞান-গরিমার উদ্দীপনায়, একে-অন্যের কাছে কেউ সহজে পরাভব স্বীকার করতে চান না;—ফলতঃ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ "এ-নিয়ে সংসারে প্রায়ই পণ্ডিতে পণ্ডিতে এমন দ্বন্দ্ব বাধে যার সমাপ্তি হয় অপঘাতে। অনেক সময় তম্বুরা গদার কার্য করে—সুরাসুরের এমন যুদ্ধ বাধে যা প্রায় ইউরোপের মহাযুদ্ধের সমকক্ষ"—(আনন্দবাজার পত্রিকা ১২ পৌষ ১৩৪১)। এই যদি স্বাধীনতার নমুনা আমরা পাই তাহলে পাঠকেরা বিচার করুন,—এমনতর স্বাধীনতার সার্থকতাই বা কিসে!

(এমনটি ঘটে কেন এবং এই ত্রুটির মূলই বা কোথায়—সে নিয়ে সংশ্লিষ্ট যোগ্যজনেরা আদৌ কিছু চিন্তা করেন কি, করেন না—তা আমার বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়।) আমি কেবল অনুরোধ করব,—উপরোক্ত বিবৃতি মতে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে গায়কদের কোনো স্বাধীনতা নেই'—এই ধরনের হালকা চালাও মন্তব্য লোক সমক্ষে পেশ করবার আগে মন্তব্যকারীরা যেন একটু ভেবে দেখেন 'স্বাধীনতা' শব্দটা তাঁরা কোন অর্থে প্রয়োগ করতে চান। কারণ শিল্পী মাত্রই স্বাধীনতার উপাসক,—অন্যের বাঁধা পথে পা ফেলে চলাতে তাদের প্রতিভার স্ফূরণ নেই—এ তো বিশ্ববিদিত স্বতঃসিদ্ধ উক্তি! তবু শিল্পীদের শিল্পসাধনায় নেই কোনো কঠোর সংযমের বাঁধন,—একথা ভুলক্রমে স্বীকার করতেও যে

মনে দ্বিধা জাগে। কেননা, ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে যেমন তার নিজস্ব বাঁধা নিয়ম কানুন আছে,—তেমনি আছে রবীন্দ্রসঙ্গীতেও,—প্রত্যেক সঙ্গীতেই আছে। সেগুলি যথাযথ মেনে চলার অক্ষমতাকে ত আর গায়ক শিল্পীদের স্বাধীনতা বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না কিছুতেই! সংযতহীন কাজকে স্বেচ্ছাচার আখ্যা দিতে পারি,—কিন্তু স্বেচ্ছাচার আর স্বাধীনতা কি একই জিনিস? বলাবাহুল্য প্রসঙ্গটি গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণসাপেক্ষ। (অবশ্য 'স্বাধীনতা'র সংজ্ঞা নিয়ে বিশ্লেষণ করতে বসলে বিরাট গ্রন্থও রচনা করা চলে। ঐ সব অন্যকথা—আপাতত থাক।)

কিন্তু বলা হচ্ছিল,—যে-সকল গায়কেরা কেবলমাত্র অন্য সুরকারের দেওয়া সুর আবৃত্তি করেই পরিতৃপ্ত—এরই ভিতর পরম সত্য ও আনন্দকে খুঁজেন, তাঁদের কেউ কখনও শিল্পী বলে সমাদর করল কি করল না,—এ-বিষয়ে বীতরাগ যাঁরা, তাঁরা তো নিঃসন্দেহে সেই বিশেষ সুরকারেরই অনুরাগীভক্ত মাত্র। এই ভক্তিমার্গের পথিকেরা যে স্বাধীনতার আলো উপলব্ধ করেন না—একথা কে-ই বা বলতে পারে? ভক্তির সঙ্গে অনুরাগের খুব বেশি অমিল নেই। সেইসূত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরাগীদের—রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভক্তও বলা যায়। সুতরাং রবীন্দ্রগীতভক্ত কিংবা অনুরাগীরা যদি এখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের গাইবার যাবতীয় নিয়ম-কানুন—যা তার স্বরলিপির ভিতর যথাসম্ভব বিধিসম্মত মতে প্রদর্শিত—তা কাঁটায় কাঁটায় মেনে নিয়ে ঐ সঙ্গীত-পরিবেশনে নিজ নিজ সংযম ও শৃঙ্খলাবদ্ধতার পরিচয় দেন এবং বিশুদ্ধ সুর-আবৃত্তির মাধ্যমেই সন্ধান পান তাঁদের পরমআনন্দের,—তাহলে কি বুঝতে হবে, যে, সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে এই শৃঙ্খলানুগত্য বোধটাই তাঁদের স্বাধীনতা ভোগের পরিপন্থী!

এখানে বলা অসঙ্গত হবে না,—যে-কোনো সুরকারই যখন তাঁর রচিত গানের সুরকে নিজে উদ্যোগী হয়ে স্বরলিপিবদ্ধ করেন কিংবা অন্যকে দিয়ে করিয়ে নেন, তখন ঐ বিশেষ স্বরলিপি-ব্যবহারকারী গায়কদের সাধারণবুদ্ধিতে এইটে বোঝা উচিত যে, ঐ গানের সুরটা স্বরলিপি অনুসারেই ব্যবহার করার ইঙ্গিত—কোনো মৌখিকভাবে নয়, লিখিত-ভাবেই—সুনির্দেশিত। এর পরেও যদি কোনো গায়ক আপন অবিমৃষ্যকারিতা বশতঃ সেই নির্দেশ অমান্য করে নিজ অভিরুচি মত ঐ সুরের উপর কোনো সংশোধন বা উৎকর্ষ-সাধনের কাজ আরোপ করতে প্রবৃত্ত হন তাহলে ধরে নিতে হবে, যে, হয় সুরকারপ্রদত্ত সুরটির প্রতি তিনি অননুরাগী আর নয়ত স্বরলিপি-ব্যবহারের বিদ্যাটি তাঁর অনায়ত্তে। তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে অবশ্য এই প্রসঙ্গে খোলাখুলি ভাবেই জানানো আছে,—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "তুমি কি বলতে চাও যে, আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনি ভাবে গাইবে? আমি তো নিজের কোনো রচনাকে সে-রকম ভাবে খণ্ড-বিখণ্ড করতে অনুমতি দেইনি"—(রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৯২৬)। পুনশ্চ, যাঁরা শিল্পকলায় অন্য-কৃত সৃষ্টির উপর

উৎকর্ষসাধকদের উদ্দেশে

উৎকর্ষসাধনে নিয়ত তৎপর তাঁদেরই বিশেষভাবে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন :

"এ-কথা নিশ্চিত যে, ওস্তাদ-পরম্পরার দুর্দম কণ্ঠতাড়নায় তানসেনের কোনো গানেই আজ তানসেনের কিছুই বাকী নেই। প্রত্যেক গায়কই কল্পনা করে এসেছেন যে, তিনি উৎকর্ষসাধন করছেন। রামের কুটীর থেকে সীতাকে চুলে ধরে টেনে নিয়ে রাবণ যখন নিজের রথের 'পরে চড়িয়েছিলেন তখন তিনিও সীতার উৎকর্ষসাধন করেছিলেন। তবুও রামের ভার্যারূপে বনবাসও সীতার পক্ষে শ্রেয়, রাবণের স্বর্ণপুরীও তাঁর পক্ষে নির্বাসন,—এই দাম্পত্য মূলনীতিটুকু প্রমাণ করবার জন্যেই সাতকাণ্ড-রামায়ণ। ললিত-কলাতেও ধর্মনীতির অনুশাসন এই যে,—যার যেটি কীর্তি তার সম্পূর্ণ ফল-ভোগ তার একলারই"—(প্রবাসী ১৩৩৪ কার্তিক)।

কবিগুরুর এমনতর সুন্দর সুন্দর উপমাসমৃদ্ধ উপদেশমূলক প্রাসঙ্গিক উক্তি আজকের দিনে কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীত-অনুশীলনকারীর অজানা আছে বলে আমি মনে করি না ;—তাছাড়া এ-নিয়ে নানা ভাবের আরো আলোচনা যখন হয়েছে এই গ্রন্থেরই অন্যত্র। কাজেই যে-সব গায়কেরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাঁধাসুরের আবৃত্তিকার মাত্র—তাঁরা, এই ক্ষেত্রে উক্ত সুরের উপর তথাকথিত স্বাধীনতার পক্ষবিস্তারে উৎসুক না হয়ে—একান্তভাবে যে কবি-প্রদত্ত সুরেরই অনুরাগী ও ভক্তিমান হবেন—এ-মন্তব্য তো আর কারুকে পৃথকভাবে দাগ কেটে বলে বোঝাবার প্রয়োজন করে না। তবে এটুকু বললাম এইজন্যে যে, উপরে বর্ণিত রবীন্দ্রসঙ্গীত-গায়কেরা যদিও আপাতদৃষ্টিতে নিছক স্বর-আবৃত্তিকার বলে কখন-সখন অভিহিত হন, তাহলেও—তাঁদের কঠোর সংযম শিক্ষাভ্যাসের মধ্যেও আছে স্বাধীনতা কিংবা স্বতন্ত্রতা প্রকাশের বিস্তর অবকাশ—তা যেন আমাদের, এই বর্তমান আলোচনা-প্রসঙ্গে বুঝতে, কারো ভুল না হয়।

এই অধ্যায়েরই প্রথমাংশে যুক্তিতর্কের সহায্যে বলেছি—রবীন্দ্রসংগীত শিখবার উৎকৃষ্ট অন্যতম মাধ্যম হল স্বরলিপি। সুতরাং স্বরলিপি লিখন-পঠনের বিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্তে থাকলে যে-কোনো গায়কের পক্ষে রবীন্দ্রসঙ্গীতচর্চা করা তেমন অসম্ভব ব্যাপার কিছু নয়। তবে কারো কারো অভিমত,—এ গান নাকি কেবলমাত্র শিক্ষিত সুরুচিসম্মত শিল্পী ও শ্রোতাদের জন্যে—এবং এও শোনা যায়, আজকের দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা বহুল পরিমাণে বাড়লেও তা সুষ্ঠুভাবে পরিবেশিত হচ্ছে কিনা—এ-রকম সংশয় প্রকাশেরও নাকি কারণ দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন স্থলে—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের গান সর্বসাধারণের জন্য রচিত হলেও—সর্বসাধারণ এ গানের চর্চা যথাযথভাবে করেন না, কিংবা করছেন না। ইত্যাকার অভিমতগুলি বহু বিতর্কমূলক সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি বলব,—ঠিক এই একই ধরণের অভিমত শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন, প্রত্যেক সঙ্গীতের শিক্ষার ক্ষেত্রেই তো প্রয়োগ করা যেতে পারে। এরই সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রশ্নও আসে :

এমনতর সব বিতর্কের সমাধান কোথায়? কেউ কি সুনির্দিষ্টভাবে বলে দিতে পারেন,—আগে যোগ্যতা অর্জন করে গান শেখার কাজে নামব—না গান শেখার কাজে নেমে যোগ্যতা অর্জন করব? বলুন দেখি, আগে সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যাক্‌, তারপর দেব—এমনতর কথা আকাশের সূর্যদেবও কি কখনও ঘোষণা করতে পারেন? বস্তুতঃ পৃথিবীকে আলো এ-সব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া বড় দুষ্কর।

তবে এখানে আমাদের আসল বক্তব্য হল: 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিল্পীর স্বতন্ত্রতা'* নিয়ে। বলাবাহুল্য—গায়কশিল্পীর ত থাকবেই স্বাতন্ত্র্যবোধ—এবং এই স্বতন্ত্রতা তাঁর কাজেতে প্রকাশ পাবে, গায়ন-বিদ্যা অধিগত হবার পরে,—আগে নয়। যতদিন কোনো গায়ক রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখবেন—ততদিন তিনি অবিমিশ্র শিক্ষার্থী, এ-কথা মনে রেখে তাঁকে স্বরলিপির ছকে বাঁধা নিয়মের দাগে দাগে পা ফেলে চলার ট্রেনিং নিতেই হবে—বিশেষকরে নিজেকে সংযত তথা শৃঙ্খলানুগত করে তোলার উদ্দেশ্যেই আরো। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের গানের সুর সবই তো স্বরলিপিতে বাঁধা—সেই স্বরলিপিগুলি পুস্তিকাকারে ছাপা হচ্ছে, তারপর বিক্রী হয়ে প্রচারিত হচ্ছে দেশদেশান্তরে—একাজ মোটেই নূতন নয়; বহুকাল আগে থেকেই হয়ে আসছে, যার মহৎ উদ্দেশ্য এই যে,—রবীন্দ্রগীতভক্তেরা এরই মাধ্যমে রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি, হয় কণ্ঠে, না হয় যন্ত্রে তুলে নেবেন। এসব কথা ত জানেন সকলেই। কিন্তু স্বরলিপির সাহায্যে গান তুললেই যে সে-গানের মধ্যে গায়কদের থাকে না কোনো স্বাধীনতা অর্থাৎ এ-গান গেয়ে গায়কেরা পান না তাঁদের সৃষ্টির আনন্দ, স্বরলিপি অনুসরণ করে গাইলে গান হয়ে যায় নিষ্প্রাণ অনড় অচল,—মনের এমনতর সব ধারণা কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নির্ভুল নয়। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথের উক্তির কিয়দংশ এখানে উদ্ধারযোগ্য মনে করি। তিনি বলছেন:

"স্বরলিপিকে কেবল মাত্র নিছক যন্ত্রবৎ অনুসরণ করলে ভাব-সম্পদের অভাব ঘটে বই কি কিছুটা,—কিন্তু যাদের ভিতর রস আছে—আছে ভাষার, ও গানের সুরের প্রতি প্রেমপূর্ণ অনুভূতি—তারা কি আর এইভাবে শুধু শুধু দাগা বুলিয়ে চলতে পারে কখনও?...স্বরলিপি দেখে গান করতে করতে গানটাকে ধাতস্থ—অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করে নাও—ডুবে যাও ওর ভিতরে—যেমন করে সেই নুনের পুতুল সাগরে গিয়ে ডুব দিয়েছিল জল মাপতে—তেমনি করে,—দেখবে তখন, তোমার দরদ সেখানে না এসে পারেই না। দরদ, ভাবরস এ সমস্তই হল ভিতরের জিনিস—ভিতরেই ফোটে—বাইরে থেকে কী আসে কখনো!—ফুলকে জোর করে কেউ ফোটায় নাকি আবার?...এই যে সংস্কৃত স্তোত্র মন্ত্রাদি পাঠ করি আমরা—প্রথম প্রথম কত কঠিন কত নীরস মনে হয়—তার মানেই বা বোঝে ক'জন? কিন্তু

* উল্লেখ্য যে,—'স্বতন্ত্রতা' এবং 'স্বাধীনতা' আভিধানিক অর্থ কখন-সখন যৎকিঞ্চিৎ তফাৎ বলে মনে হলেও এই বর্তমান প্রবন্ধে কিন্তু শব্দ দুইটি বরাবর ব্যবহৃত হয়েছে একই অর্থে।

ধৈর্য ধরে বার বার আবৃত্তি করলে সেই স্তোত্র সেই মন্ত্রই কত না সরস হয়ে ওঠে—অর্থও মেলে বই কি তার! আপনা থেকেই মেলে। তাহলে সুর বসানো বাংলা গানের কথা, প্রাণ পাবে না কেন,—যদি তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় তেমনি ভাবে! একাজে ত্রুটি ঘটে যদি সেজন্য স্বরলিপির তো আর অপরাধ নয় কিছু!"—(রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ ১৩৭২ বৈশাখ)।

এই উদ্ধৃতিটি মন দিয়ে পড়লে,—স্বরলিপি যে গায়কদের স্বাধীনভাবে গান গাইবার অন্তরায় এ ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হবে বলে বিশ্বাস রাখি। তাছাড়া আগেই বিবৃত হয়েছে,—যে-কোনো রচয়িতার গানের সুরকে স্বরলিপিবদ্ধ করে রাখার মূল উদ্দেশ্যই হল—তৎসংশ্লিষ্ট সুরকারের নিজস্ব সুরের রূপটিকে নিখুঁতভাবে বহাল রাখা। এই উদ্দেশ্য কোন-না-কোনো অজুহাতে উপেক্ষিত হলে স্বরলিপি করার কাজটা নেহাৎ প্রহসনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়! অন্যথায়, স্বরলিপির কাজে যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করলে বলতেই হয়, স্বরলিপিবদ্ধ গানের উপরে তথাকথিত স্বাধীনতার দোহাই পেড়ে গায়কদের অতিরিক্ত কোনো কৃতিত্ব দেখাবার প্রবণতাটা ত শুধু হাস্যকর নয়—অত্যন্ত গর্হিত, লজ্জাকরও। মন্তব্যটা, পুনরাবৃত্তি যদিচ, তবু আরো খোলাখুলিভাবে এখানে বুঝিয়ে বলা দরকার। যেমন, কোনো একটি গানের কথা এবং সুর দুই ই রচনা করে তার স্বরলিপিটি পর্যন্ত তৈরি করে দিলেন আপনি, অর্থাৎ আপনার গান যে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তার সকল রকম নির্দেশ আপনি নিজেই সাধ্যমত ছকে-কেটে দিয়ে দিলেন। তাসত্বেও আমি একজন বিশিষ্ট গায়ক হিসাবে আপনার গানটি যদি নিজ মর্জি মতো অদল-বদল করে গেয়ে, নানা সুযোগে, সর্বত্র আপনার সুনামের অপপ্রচার করতে থাকি,—মোটের উপর আপনার অনভিপ্রেত কাজটাই যদি আমি করি আমার ব্যক্তিগত তুচ্ছ স্বার্থসিদ্ধির মৎলবে,—আবার অন্যদিকে স্বরচিত গানের প্রতি স্বীয় মমত্ববোধটুকু বিসর্জন দেওয়াও যখন আপনার পক্ষে এই জায়গায় একেবারে অসম্ভব মনে হয় (কারণ, সেটাই তো স্বাভাবিক তখন ভাবুন দেখি,—আমার করা উপরোক্ত কাজটা আপনার কাছে কেমন লাগবে!

অনেকটা এই প্রসঙ্গই সঙ্গীতসাধক দিলীপকুমার রায় একবার তুলেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে, জানতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরের **variation** করবার স্বাধীনতা গায়কদের দিলে কেমন হয়! রবীন্দ্রনাথ জবাব দিয়েছিলেন :

"যে রূপ-সৃষ্টিতে বাইরের লোকের হাত চালাবার পথ আছে তার এক নিয়ম, আর যার পথ নেই তার অন্য নিয়ম।...হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকার, তাঁদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা যে চেয়েছিলেন।...কিন্তু আমার গানে ত আমি সে-রকম ফাঁক রাখিনি যে, সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।"—

(রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪শ খণ্ড, পৃ ৯২৬)

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কখনও কোনো অস্পষ্টতা রাখেন নি এইটুকু বোঝাতে, যে, তাঁর গানে তাঁর স্ব-দত্ত সুরের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন কিংবা বিকৃতি তিনি অপছন্দ করতেন অর্থাৎ এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দস্তুরমত রক্ষণশীল। আমরাও তা ভাল করেই জানি। কিন্তু আরেকটি বিষয় অনেকেই জানি না, যে, তাঁর গান গাইবার সময় গায়কদেরও ঠিক তাঁরই মত করে গাইতে হবে সে-গান, কিংবা তাঁর গান গাইবার জন্যে বিশেষ এক ধরনের 'গায়কি'র প্রয়োজন আছে গায়কদের,—এমনতর বিস্ময়কর নির্দেশ তিনি দেন নি কোথাও। বিভিন্ন গায়কের রুচি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে—সেটা স্বাভাবিক, এবং গানের মর্যাদাও, সকল রকমের গায়ক কিংবা শ্রোতা একই আদর্শ মতে সকল দিক থেকে সকল অবস্থায়, রক্ষা করেন না—এ সবের খবর রবীন্দ্রনাথ সবার চেয়ে বেশি জানতেন ও বুঝতেন। সুন্দর এক উপমা সহযোগে তাঁকে বলতেও শোনা যায়: "বসন্তে যে-ফুল ফোটে সে-ফুল তো সকলেরই জন্যে—কিন্তু সকলেই তার মর্যাদা সমান বোঝে এ কথা কেমন করে বলব?"—সত্যই তো মর্যাদাবোধ সকলের এক রকমের হয় না। ফুলের সৌন্দর্য কেউ উপভোগ করেন ফুলকে তার গাছের মধ্যে রেখেই,—আবার কেউ বা গাছ থেকে ছিঁড়ে টেনে নিয়ে নিজের অঙ্গস্পর্শে পেতে চান এর সৌন্দর্যের অনুভব। মূলতঃ স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী সৌন্দর্যের অমর্যাদা কিন্তু করেন না কেউই। গানের মর্যাদাবোধের বিচারও অনেকটা ঐ একই পদ্ধতিতে করা সম্ভব—করা হয়ও। কেননা, ফোটাফুল যেমন সকলের জন্যে,—তেমনি প্রকাশিত গানও তো সকলেরই জন্যে। এ বিষয়টি সামান্য মনোযোগ দিলে এখানেই পরখ করতে পারেন যে-কেউ। দেখুন, একই গানের স্বরলিপিবদ্ধ সুর নিখুঁত ও বিশুদ্ধ আকারে সকলের কণ্ঠে একই ভাবে উচ্চারিত হলেও গায়কদের নিজ নিজ রুচিভেদে গানের স্বরূপ কোনো কোনো সময়ে কিন্তু অনেকখানিই বদলে যায়। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন উপলক্ষে বলা কয়েকটি উক্তি এখানে তুলে দিচ্ছি:

"গান নানা লোকের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলেই গায়কের নিজের দোষ-গুণের বিশেষত্ব গানকে নিয়তই কিছু-না-কিছু রূপান্তরিত না করেই পারে না।"—(রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪শ খণ্ড, পৃ ৯২৭)।

"আরেকটা কথা। গানের গতি অনেকখানি তরল, কাজেই তাতে গায়ককে খানিকটা স্বাধীনতা তো দিতেই হবে, না দিয়ে গতি কী?...তাই, আদর্শের দিক দিয়েও আমি বলি নে যে, আমি যা ভেবে অমুক সুর দিয়েছি তোমাকে গাইবার সময়ে সেই ভাবেই ভাবিত হতে হবে। তা যে হতেই পারে না। কারণ, গলা তো তোমার এবং তোমার গলায় তুমি তো গোচর হবেই; তাই এক্‌স্‌প্রেশনের ভেদ থাকবেই"—(তীর্থংকর, পৃ ১৫৮)।

সেইজন্যে আমিও* বলছিলাম,—রবীন্দ্রনাথ এমন কোনো নির্দেশ কোথাও দিয়ে

বাননি যে, গায়কদের ঠিক তাঁরই মত করে গাইতে হবে তাঁর গান। তবে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গিয়ে গায়কদের এক্সপ্রেশনের তথা প্রকাশভঙ্গীর যে ভেদ থাকবেই কবি বলেছেন,—এই কথাটা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্তে একটু বাস্তব দৃষ্টান্ত এখানে নেওয়া যাক।

মনে করুন, কোনো স্কুলের সামান্ত লেখাপড়া জানা অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের একটি রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে শেখালেন আপনি, আবার ঐ একই গান আপনার কাছ থেকে শিখে নিয়ে কোনো কলেজের উচ্চশিক্ষিত বয়স্ক ছেলেমেয়েরা যদি গায়, তাহলে কি উভয়ের প্রকাশভঙ্গী এক হবে কখনও—ভাবে, কিংবা অর্থে, কিংবা অনুভূতিতে? গানের সুর আগাগোড়া একই রকমের সঠিক থাকলেও তাদের প্রকাশভঙ্গী, বয়স ও অভিজ্ঞতার তারতম্য হেতু, কখনও এক হয় না,—হতে পারে না। তেমনি, যে-সব দক্ষ জনপ্রিয় গীতশিল্পীরা অভিনয়ে কিংবা সিনেমায় কিংবা জলসায় পেশাদারী গান করে অভ্যস্ত—তাঁরাও যখন আপনার কাছ থেকে তালিম নিয়ে ঐ একই গান নিজেদের পেশার প্রয়োজনে ব্যবহার করেন,—নিশ্চিত দেখবেন এঁদের কণ্ঠে গানের রূপ গিয়ে দাঁড়িয়েছে অন্যরকম। (এমনিতর দৃষ্টান্ত দেখানো যায় আরো) অথচ বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখুন,—কবিগুরুর যেমন কথা তেমন সুরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য আছে বলেই তো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়াতে এঁদের সকলের এত আগ্রহ, এবং রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি মর্যাদাবোধ এঁদের কারুর চেয়ে কারুর কম নয়। সর্বোপরি এঁরা কিন্তু কেউই কবিগুরুর স্ব আরোপিত সুর, যা স্বরলিপির নিগড়ে আবদ্ধ তা অমান্য করেন নি এককণাও। এই ভাবে সুরের কাঠামোকে অবিকৃত রেখে নিটোল সংযমের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর স্বীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেবার জন্য আগ্রহশীল ভক্তিমান গায়কদের যে প্রতিভা ও বুদ্ধিদীপ্তির যোগ্য আরোপণ—সেটাই তো হল শিল্পীগায়কদের স্বাধীনতা!

গানের কথা এক, সুরও এক, তবু এর প্রকাশভঙ্গীতে ভেদের সৃষ্টি হয় কেন?

এত সব শোনার পরেও যদি আমাদের কারো কারো তর্কপ্রলুব্ধ অন্তরে সংশয় থেকে যায়, আমরা যদি বাইরের বিচিত্রতর অভিমত এবং প্রভাবের তাড়নায় অন্য গানের সঙ্গে তুলনা করে ভাবি,—রবীন্দ্রসঙ্গীত তো শুধু শুধু সুর দিয়ে কবিতা-আবৃত্তি মাত্র; কাব্যরসে অনভিজ্ঞ সাধারণগায়কেরা কি আর তেমন দরদ দিতে পারেন এতে! ইত্যাদি ধরণের সব নৈরাশ্যজনক সিদ্ধান্তও যদি পোষণ করি মনের মধ্যে,—তাহলে এমনতর ভাবনার মোকাবিলা করতে গিয়ে মানতেই হবে, যে,—আবৃত্তিকে আবৃত্তি বলে স্বীকার করে নেবার মধ্যে লজ্জার বা আপত্তির কিছু নেই। নিছক আবৃত্তি দ্বারা বহু কঠিন কাব্যকে পর্যন্ত আয়ত্তে আনা যায়—সেই অভিজ্ঞতাও হয়ত অনেকের আছে। আর বস্তুতপক্ষে, আবৃত্তিকে বাদ দিয়ে—কাব্যযুক্ত কিংবা কাব্যবিহীন কোনো সঙ্গীতেরই তো সার্থকরূপ দেওয়া চলে

আবৃত্তির মাহাত্ম্য

না। তদুপরি সঙ্গীতের তথা গানের মধ্যে গায়ক শিল্পীদের যথোচিত দরদ দেওয়া আর না দেওয়ার ক্ষতিত্বটা কিন্তু অনেক সময় গড়ে ওঠে ওই শুদ্ধ আবৃত্তিকেই অবলম্বন করে,—এ নিয়েও বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আলোচনা হয়ে গেছে। আসলে অপ্রয়োজনীয় তর্কাদিতে নিবৃত্ত থেকে সাম্প্রতিক আলোচকদের সুসংযত চিত্তে বোঝা দরকার,—সঙ্গীত অনুশীলনের ক্ষেত্রে 'আবৃত্তি' নামে অতি প্রাথমিক যে-সোপান, এর গোড়াতেই যদি গায়কদের অজান্তে কোনো-না-কোনো গলদ লুকিয়ে থাকে তাহলেই তাদের পরিবেশিত গান অনেকক্ষেত্রে নীরস নিস্প্রাণ মনে হয়। গায়করাও প্রত্যাশানুরূপ সুসঙ্গতির অভাবে একাজে ক্লান্তি বোধ করেন। আবার সঙ্গগুণে সমুচিত যত্নের দ্বারা এমনতর অবস্থারও নিরসন ঘটানো সম্ভব। সেই উদ্দেশ্যে গীতার্থীদের এইটুকু বুঝতে অনুরোধ করব, যে, গান শিখতে গেলে প্রথমেই সার্গমের সাতটি স্বর ভাল করে আয়ত্ত করতে হয় এবং তা শুদ্ধ আবৃত্তি ছাড়া কখনও আয়ত্তে আসে না। সুদীর্ঘকাল একটানা সাধনার পর সে-আবৃত্তিও কী আর সকলের কণ্ঠে সুন্দর সাবলীল হয়ে ওঠে? ওঠে না। পরীক্ষা করে দেখবেন, গীতার্থীরা সকলে সুকণ্ঠের অধিকারী হলেও—সকলের কণ্ঠস্বর কি একই রকমের শ্রুতিমধুর শোনায়? তাও না। অতি সহজ সার্গমের পর্দাগুলি একজনের কণ্ঠে মনে হয়—যেন কী রকম বড়ো রসহীন, অনেক সময় অসহ্য ঠেকে কানে, আবার অন্যজনের কণ্ঠে সেই একই সার্গম বড়ো সরস মধুর হয়ে ওঠে—সারাক্ষণ কান পেতে থেকে শুনতে ইচ্ছে করে! এমনটি হয় কেন? শুধুই কি গায়কের কণ্ঠের জন্যে? মোটেই না। কণ্ঠকে ছাপিয়েও তার বাইরে এমন কিছু আছে যা, ভাষায় বিশ্লেষণ করা বেশ কঠিন কাজ—একান্তই বর্ণনাতীত। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায়, অনর্গল আবৃত্তির পরিণতিতে আবৃত্তিকারের কণ্ঠস্বর মার্জিত হবার সুযোগ পায় প্রচুর একাগ্রতার অনুশীলন হয় তা'তে কোনো সন্দেহ নেই।

এখানে একটু থেমে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন,—কণ্ঠস্বর-মার্জনা প্রসঙ্গে নিষ্ঠাবান উৎসাহী গীতসাধকদের পক্ষে আরো কিছু অতি অবশ্যজ্ঞাতব্য, যে, "কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হইলেও, যথেচ্ছামত স্বরোচ্চারণ করিলে তাহা মিষ্ট হয় না। কোনো কোনো কণ্ঠ সুশিক্ষা ও সুসাধনা ব্যতীতও সুমধুর হয় বটে,—কিন্তু সে দৈবাৎ কখন উৎরাইয়া যায়। প্রত্যুত ধ্বনিবিজ্ঞান ও পদার্থতত্ত্ববিৎ সুনিপুণ কারিগরের নির্মিত প্রত্যেক যন্ত্রই যেমন সুললিত ধ্বনি বিশিষ্ট হয়; প্রত্যেক গায়কেরও সেইরূপ মিষ্ট স্বর হওয়া উচিত। কোন সুললিত মনোহর ধ্বনি আদর্শ স্বরূপ লইয়া তদনুকরণের চেষ্টায় সাধনা করিলেই, কণ্ঠস্বর মিষ্ট হইতে পারে।... কণ্ঠ গান গাইবার যন্ত্র বটে, কিন্তু অমার্জিত অবস্থায় নহে; উহাতে যন্ত্রের উপাদান সকল বর্তমান আছে মাত্র। সেই উপাদানসমূহ দ্বারা একটি উপযুক্ত সঙ্গীতযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইলে, তবে উত্তম গান হয়"—(গীতসূত্রসার, পৃ ৬-৭)। এ-ছাড়া

কণ্ঠমার্জনা

আমাদের সঙ্গীতজগতে চিরস্মরণীয় প্রায়স্ আদিপুরুষ স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়ালের পুত্র স্বনামধন্য সুরস্রষ্টা রাইচাঁদ বড়াল মহাশয়ও কোনো এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেছেন: "শুধু সা-রে-গা-মা-পা ধা-নি সাধলেই গলা সাধা হয় না। গলার চর্চা (ভয়েস্ কালচার) অতি যত্নে, গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হয়। বিলাতী মতে সঙ্গীত-শিক্ষকেরা আগে শিক্ষার্থীর গলা তৈরি করান,—তারপরে তাকে গান শেখান। আমাদের দেশে বহু জনপ্রিয় সঙ্গীতজ্ঞ, ওস্তাদ, পণ্ডিত গলার অনেক কসরৎ দেখাতে অভ্যস্ত,—কিন্তু তাঁদেরও সুর নিখুঁত হয় না। যন্ত্রের সঙ্গে পরীক্ষা করলেই ত্রুটি ধরা পড়ে। যার গলায় নিখুঁত সুর খেলে তার গলা, যন্ত্রের তানে আপনিই মিশে যায়"—(সিনেমা জগৎ ১৩৬৫ : শারদীয়া সংখ্যা)। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকেও বলতে আমরা শুনি: "বিলিতি সঙ্গীতের গুণ হচ্ছে—তাতে সুর সাধানো হয় খুব খাঁটি করে, কান দোরস্ত হয়ে যায়,—আর পিয়ানোর শাসনে তালেও ঢিলেমি থাকে না"—(রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ম খণ্ড, পৃ ১৪২)। ইত্যাকার মূল্যবান উক্তিগুলির তাৎপর্য বিশেষ যত্ন নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে অনুধাবন করে চললে সর্বশ্রেণীর যাবতীয় গীতি-সাধকেরা যে ব্যক্তিগতভাবেই উপকৃত হবেন বেশি—সে কথার পৃথক বিশ্লেষণ এখানে অনাবশ্যক।

এবার আগের বক্তব্যে ফিরে আসুন,—যেখানে বলা হচ্ছিল সুনিয়মিত ভাবে আবৃত্তি করতে পারলে গায়কের কণ্ঠস্বর মার্জিত হবার সুযোগ পায়। সেই মার্জিত স্বর-ক্ষেপণের সঙ্গে গায়কের দরদ মেশানো থাকলে পূর্বোক্ত অবর্ণনীয় রূপটি তথা ভাষায় বর্ণনা হয় না যে কণ্ঠমাধুর্যের—সেই মাধুরীটিও সুরের মধ্যে ফুটে ওঠে তেমনি। তাহলে সারকথাটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এই যে, সার্গমের ভিতর দরদ দিতে জানলে—ওই দরদ ক্রমশঃ সকল রকম গানের সুরেতেই দেওয়া যায়। সুরের মধ্যে, দরদ দেওয়া মানে, নিজেকে ঢেলে দেওয়া—অর্থাৎ নিজের ভিতরকে বাইরে এনে সামনে তুলে ধরা ঐ সুরের মাধ্যমে। এইটে হল সকল মানুষেরই 'অহং'-কে নিঃশেষিত করে দেবার অন্যতম সাধনা—আর দরদমগ্ন গায়কদের চরিতার্থতাও এইখানেই।

তাই বোধকরি রবীন্দ্রনাথও বলেছেন: "দরদটা বাইরের জিনিস নয়, ভিতরের জিনিস। বাইরের জিনিসের পরিমাপ আছে,—আদর্শে ধরে সেটা সম্বন্ধে দাঁড়িপাল্লার বিচার চলে। তার চেয়ে বড়ো যেটা সেটাকে কোনো বাইরের আদর্শে মাপা চলে না, সেটা হল 'সহৃদয় হৃদয় বেদ্য।' কে সহৃদয় আর কে সহৃদয় নয়,—বাইরে থেকে তারও তল পাওয়া যায় না"—(রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪শ খণ্ড, পৃ ১০১০)।

এতক্ষণ তো কেবলমাত্র সুরে দরদ দেবার বিষয়েই আলোচনা হল।

কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত তো শুধু সুরধর্মী নয়,—এর সুরের সঙ্গে যে আবার কথাও চলে পাশাপাশি সমান মর্যাদা নিয়ে। কাজেই এখানে সুর-আবৃত্তির অনুরূপ কথা-আবৃত্তির প্রতিও গায়কদের সমান মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু মুশকিল হল,—রবীন্দ্রনাথের গানের কথার যথাযথ অর্থ অধিগত হওয়া সকল শ্রেণীর গায়কের পক্ষে সকল সময়ে সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে ওঠেনা,—আবার অনেক গায়ক আছেন গানের কথার অর্থ জানার প্রতি একেবারেই উদাসীন। বলতে দ্বিধা নেই, হিসাব নিলে দেখা যাবে—সংখ্যায় সম্ভবত এঁরাই বেশি যাঁরা কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের সুরটা পেলেই খুশি থাকেন সব সময়। অথচ কথার অর্থ না বুঝলে গানের কথায় দরদই বা দেবেন কী করে তাঁরা! আবার রবীন্দ্রনাথ বলেন: "গানে যে দরদ সেটা বয়সের emotion এর সঙ্গে আসে। ওটা আগে-পিছে জোর করে হয় না"—(আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৪৫)। কাজেই এই চলন্ত মুহূর্তে গানের উপর যাঁরা সমুচিত দরদ দিতে অপারগ—সেই জাতীয় গায়কদেরে,—রবীন্দ্রসঙ্গীত-ব্যবহারের অনুপযুক্ত বলে নাকচ করে দেওয়া ঠিক নয়,—বরং বলব, এঁরা প্রত্যেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিষ্ঠাবান সুর-আবৃত্তিকার; এবং এঁদেরই কণ্ঠে (গানের বাণীর অর্থ যথাযথ অনুধাবন করার অক্ষমতায়) রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা যদিও বা কখন-সখন প্রাণহীন যন্ত্রবৎ শোনায়, তাহলে তো হতাশ হবার কিছু দেখি না। এঁদেরে নিরাশ কিংবা নিরুৎসাহী করাও কারো পক্ষে অনুচিত। কেননা রবীন্দ্রনাথের গান সর্বজনের—সর্বভাষাভাষীর; --বিশেষ করে এই অর্থে, যে,—পৃথিবীতে ভাল এবং সৎ যা' তার প্রতি জীবমাত্রেরই আকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক—তেমনি থাকে তার জন্মগত অধিকারও। রবীন্দ্রনাথের গানকে যদি শাশ্বতবাণী সংবলিত ভাল, সৎ, সুন্দর উপাদানে গঠিত জিনিস বলে আমরা স্বীকার করি এবং সম্মান দিই—তাহলে এর উপর আকর্ষণ ও অধিকারই বা থাকবে না কেন সকলের? তাছাড়া বড় ও মহৎ যা' তাকে বিকেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে, কারো পক্ষে সুযোগ পেয়ে কেন্দ্রীভূত করে তোলার প্রচেষ্টাও ত অশ্রদ্ধেয় *। মোটের উপর রবীন্দ্রসঙ্গীত কোনো বিশেষ সম্প্রদায় কিংবা গোষ্ঠীর সম্পদ বলে গ্রাহ্য হতে পারে না কোনো যুক্তিতেই—আরো এই জন্যে যে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপির বইগুলি দেশকাল এবং জাতিধর্ম নির্বিচারে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের কাছেই যখন খোদ বিশ্বভারতী-কর্তৃকই অবলীলায় বিক্রীত হয়ে আসছে চিরকাল।

কিন্তু যা বলছিলাম তা এই যে,—রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের মধ্যে যাঁরা একবার রস পেয়েছেন—তাঁরা যদি যথানিয়মে নিরন্তর রবীন্দ্রনাথের গানের কথারও আবৃত্তি করে যান তাহলে এই কথার মধ্যেও রস, ভাব, অর্থ সবই আপনা থেকে

---

* মহাত্মা গান্ধী একবার আমাকে বলেছিলেন: "কেবলমাত্র শহরে নয়, গ্রামের পল্লীতে-পল্লীতে ঘরে-ঘরে পৌঁছে দিতে হবে গুরুদেবের গান। একে যদি শুধু বিশেষজ্ঞদের সম্পদ করে রাখা হয়—সে লোকসান হবে সমগ্র জাতির"—(বিশ্ববীণা ১৩৭৭-৩য়সংখ্যা, পৃঃ ১৯০)। এ উক্তিটির তাৎপর্য এক্ষেত্রে সকলেরই অনুধাবনযোগ্য

খুঁজে পাবেন একদিন না একদিন—অবশ্য যদি না তাঁদের আবৃত্তির কাজে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে কখনও। আর সর্বোপরি 'আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাংবোধাদপিগরীয়সী'—এই সুপরিচিত বচনটির তাৎপর্য এবং গুরুত্ব তো সকলেরই জানা।

আসলে দেখা যাচ্ছে—রবীন্দ্রসঙ্গীতে আবৃত্তির আবশ্যকতা অনস্বীকার্য সর্বতোভাবে। উত্তম ও সার্থক আবৃত্তির মাধ্যমে গানের অর্থ, ভাব ও রস উপলব্ধি করে রবীন্দ্রসঙ্গীত-গায়কেরা কিংবা তথাকথিত বিশেষজ্ঞেরা রবীন্দ্রসঙ্গীতে যে প্রাণবন্ত রূপটি তাঁদের নিজ নিজ পরিবেষ্টন অনুযায়ী ব্যক্তিগত দবদ, গায়কি ও বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে ফুটিয়ে তোলেন —বলাবাহুল্য সেই রূপটাই হল—গায়কশিল্পীর স্বতন্ত্রতা। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন :

> "গানের প্রকাশ সম্বন্ধে গায়কের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা মানতেই হবে—অর্থাৎ গানের দ্বারা গায়ক নিজের অনুমোদিত একটা বিশেষ ভাবের ব্যাখ্যা করে,—সে ব্যাখ্যা রচয়িতার অন্তরের সঙ্গে না মিলতেও পারে ;—গায়ক তো গ্রামোফোন নয়"—(রবীন্দ্রায়ণ ২য় খণ্ড, পৃ ২৩৭)।

সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের সুর ও তাল-সৃজন প্রতিভা

রবীন্দ্রনাথের গান-রচনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়, তাঁর প্রথম জীবনের অনেকগুলি গান তিনি রচনা করেছিলেন,—বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদুভট্ট এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত রিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের আওতায় বসে। সুতরাং গানে তাঁর সুর-যোজনার কাজটিও তখন চলতো সেই অগ্রবর্তীদের প্রচলিত রীতি অনুসবণ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেন এবং যে-পদ্ধতি অনুসরণে গান-রচনায় উদ্বুদ্ধ হন, সেটা সম্পূর্ণভাবে তাঁর স্বকীয় প্রতিভার আলোকে সৃষ্ট। এই সৃষ্টির মাধ্যমেই আমরা পেলাম, যাকে বলে 'রবীন্দ্রনাথের নব-পর্যায়ের গীতাবলী'—সোজাকথায়, কবির সুর-সংযোজনার স্বকীয় সম্পদ। এটাই হল তাঁর সঙ্গীতে সুর-সৃজনী প্রতিভার মূল কথা।

সুরের মধ্যে বিচিত্র মিশ্রণ এনে গানকে নব নব রসে রসিয়ে তুললেন কবি রবীন্দ্রনাথ ; এটা, তিনি জাত-সুরজ্ঞ বলেই হয়ত পেরেছিলেন করতে। তাঁর সুরের সুরধুনী আপন অনিবার্যতার বেগে সমুখের দিকে ছুটে চলল, জাগল এতে অজানা ঝংকার,—অজানা ছন্দ ; কতক মিলল অতীতের সঙ্গে, আবার কতকটা নয়। যেটুকু মিলল না,—সেটুকুই ধাঁধিয়ে দিল অনেকের মন। বিশেষ করে যাঁরা সঙ্গীতশাস্ত্রের গতানুগতিক পথে চলে অভ্যস্ত তাঁরা কিছুটা আহত হলেন বৈকি! তাসত্ত্বেও কেউ কেউ শুনলেন, যে,—গুণী রসিক সমজদারদের মধ্যে একদল বলেছেন : কবির

গানের কথাগুলি খুবই ভালো, কিন্তু সুর তেমন কিছু নয়। ফের শোনা গেল অন্যদলের অভিমত: না, এই সুরের মধ্যেও অভিনবত্ব আছে,—আছে প্রচুর মুন্সীয়ানা। এমনিতর নানা কথা।

তাহলে কি এর সমস্তটাই একেবারে আকস্মিক উদ্ভাবন,—না অন্য নতুন কিছু? খুব সূক্ষ্ম ভাবে অনেকের সঙ্গে তুলনা করে করে বিচার করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথের এই মিশ্রণের কাজ কিন্তু ভারতীয় রাগরাগিণী এবং এর আনুষঙ্গিক রীতিনীতিবিবর্জিত কোনো নূতন বস্তু নয়,—অথচ নূতন বলেই যেন প্রতীতি জন্মে! গানের মধ্যে এই নূতনত্ব ও অপূর্বত্বের দানই হল কবিগুরুর বিশ্ববিজয়ী প্রতিভার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। মোটের উপর রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের চরম আলাপটি যে ভবিষ্যৎকে নিয়ে—এইটে অনেককাল আগেই বুঝতে পেরেছিলেন দেশের কোনো কোনো বিদগ্ধ রসিক সত্যদ্রষ্টা সঙ্গীতানুরাগীজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়,—যতদিন রবীন্দ্রনাথ বেঁচেছিলেন তাঁর এই সৃষ্টির নূতনত্বের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে কেন জানি আমাদের দেশীয় গুণী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতবেত্তারা অনেক সময় তাঁদের অনাগ্রহ এবং ঔদাসীন্যেরই পরিচয় দিয়েছেন বেশী, যার ফলে কেবলমাত্র শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে, আর নয় তো বাইরে লেখাপড়া জানা কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মধর্মভাবাপন্ন গীতানুরাগীদের মহলেই রবীন্দ্ররচিত গানের অনুশীলনটি ছিল সীমাবদ্ধ*। এর পরিণতিতে আমাদের লাভ কিংবা লোকসান কতটুকু ঘটল—সেটা এখানে আলোচ্য নয়। তবে এ তথ্যটি, নিষ্ঠুর হলেও—সত্য। ভবিষ্যতে যেন এমন তথ্যের কোনো বিকৃতি না ঘটে—তাই সেটিকে এখানে লিপিবদ্ধ রাখার বিশেষ যোগ্য মনে করলাম।

আজকের দিনে আমরা,—রবীন্দ্রতিরোধানের বহু বহু বৎসর কাল পরে যা প্রত্যক্ষ করছি তা এই,—রবীন্দ্রনাথের সুর-রচনার বৈশিষ্ট্যটি পরমশ্রদ্ধার সঙ্গে অনুশীলিত হচ্ছে সর্বত্র—সর্বস্তরের গায়ক ও শ্রোতৃবর্গের মধ্যে। এককালে যে সংগীতবেত্তারা পাণ্ডিত্যের অভিমান নিয়ে দূরে দাঁড়িয়েছিলেন—তাঁদেরই মধ্যে অনেককে প্রত্যক্ষ নয়ত পরোক্ষভাবে এখানে সক্রিয় অংশ নিতে শোনা যাচ্ছে;—নানা জায়গায় শিক্ষা-কেন্দ্রের উদ্বোধন করে রবীন্দ্রসংগীত-প্রচারের কাজেও তাঁরা ব্রতী—এই লক্ষণটি নিঃসংশয়ে শুভ; আরো বিশেষ করে এই জন্যে যে, কবিগুরুর বাণীর ধ্রুবতাকে রহস্যময় করে তুলেছিল তাঁর যে সুরের ইন্দ্রজাল—এরই ফলশ্রুতি হিসাবে নেহাৎ আনাড় সঙ্গীতানভিজ্ঞ নর-নারীরাও যখন আর এ বিষয়ে বেশি উদাসীন কিংবা

* কোনো বিশেষ বিধিসম্মত সঙ্গীতানুশীলনকারী ছাড়াও—এ-গান অর্বাচীন সুরে-বেসুরে গাইতেন আরো অনেকেই। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গের স্বদেশীগানগুলি যে বাঙালী আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে সর্বত্র কী দারুণ চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনার সঞ্চার করত—সেই ইতিহাস তো আজ কারো অজানা নেই। এ-সবের আলোচনা আছে—স্বতন্ত্র অধ্যায়ে।

নির্লিপ্ত থাকতে পারছেন না। তাঁদেরও এই সহযোগিতা অবশ্য অভিনন্দনীয়। সর্বোপরি ঋষিকবির অপূর্ব সব গীতিকথা তাঁরই রচিত একমাত্র সুরে, যেমন স্বদেশে তেমনি বিদেশের ঘরে-ঘরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করে তোলার যে বিবিধ আয়োজন চলছে—এটাও আমাদের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়।

এই সঙ্গে আরো ভাববার আছে—নিজের সৃষ্টি যদি ভাল ও সুন্দর হয়, তা সর্বত্র প্রচারিত পরিব্যাপ্ত হোক—এমন ইচ্ছা ইহজগতে কোন স্রষ্টার বা নেই? স্বয়ং বিধাতাই কি আর এই ইচ্ছার প্রতিপালক নন? তেমনি স্ব-রচিত সঙ্গীতসুধা কোনো একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাক—এমনতর নিষ্ঠুর, হীন কামনা বোধকরি কোনো কবি কোনো সঙ্গীত-রচয়িতাই কখনও করতে পারেন না; রবীন্দ্রনাথও করেন নি। তাঁর গান তাঁরই স্বদত্ত সুরে গাইতে, বাঙালী ত দূরের কথা—বাংলাভাষা মোটেই জানে না বোঝে না এমন সব গাইয়েদেরও তিনি নানা ভাবে উৎসাহিত করেছেন* নানা ব্যাপারে। এর একাধিক প্রমাণ বর্তমান লেখকের কাছেই আছে), চেয়েছেন তুচ্ছ ভেদাভেদ ভুলে সবাই তাঁর গানের কথা ও সুরের অন্তর্নিহিত রস থেকে আনন্দ লাভ করুক। পারিপার্শ্বিক শিক্ষা ও রুচিভেদে গায়কদের মধ্যে এর রূপের বিকাশে তারতম্য ঘটতে পারে—এটা বুঝবার ক্ষমতা নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের ছিল, তাই বলে তিনি তো কৈ এমন কোনো সম্প্রদায় গড়ে নির্দেশ দিয়ে যান নি যে, তাঁর গানগুলি, কেবলমাত্র ওই নির্দিষ্ট সম্প্রদায়েব মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকবে, অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। বরং হিন্দুস্থানী ক্লাসিক্যাল বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের পর্যন্ত তিনি বলেছিলেন; "আমার গান তোমরা যদি না গাও, তবে আমার গান স্থায়ী হবে না—বেসুরে ও বেতালে গাওয়া হলে আমার গানের উপর কারো শ্রদ্ধা থাকবে না"—(সঙ্গীতদর্শিকা ১ম খণ্ড, পৃ ২৩৪)। এছাড়া, বিশেষত বাঙালীরা নিজ-নিজ সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে—সকল অবস্থাতেই তাঁর গান গাইবে,—তা না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে এ গান তাদের গাইতেই হবে। এসব কথা যে রবীন্দ্রনাথ কতবার কত জায়গায় বলেছেন তা আশাকরি যাঁরা রবীন্দ্রতত্ত্ব অন্বেষক, তাঁরা সকলেই জানেন। কবির এই জনহিতকারী মহৎ মনস্কামটি আজ বহুলাংশে সার্থক বলা যায়। এখন যদি কেউ এর প্রগতির পথে কোনো ওজুহাতে সীমারেখা টানতে

কবিগুরুর মনোবাঞ্ছা

* একবার অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বলতে বাধ্য হয়েছিলেন: "আজ বাংলাদেশে গানে একটা খেলো ভাব এসে পড়েছে।...গান ব্যবসাদারীর বাইরে থাকাই ভালো"—(আনন্দবাজার ১৭ আষাঢ় ১৩৪৭)। তাঁর শেষ বয়সের এই তাৎপর্যপূর্ণ উক্তির মূল কারণটি আজও অনুদ্‌ঘাটিত। কিজন্যেই বা অনুদ্‌ঘাটিত তা সুনির্দিষ্ট ভাবে জানতে না পারলে এই প্রসঙ্গের আলোচনার দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে ভুল বোঝার এবং ভুল বোঝাবার যে প্রচুর অবকাশ থেকে যাবে প্রত্যেকেরই—সেকথা বলাই বাহুল্য।

অভিলাষী হন,—তাহলে বুঝতে হবে সেই ওজুহাতটি কোনো-না-কোনো রকমের স্বার্থপ্রেরিত—অন্য কিছু নয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাণীর প্রাচুর্য যেমন অফুরন্ত, তেমনি আছে সুর-তাল-ছন্দের বৈচিত্র্যও। বিষয় বৈচিত্র্য তো অন্তহীন,—অবশ্য এর আলোচনা হবে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে। এখানে আপাতত এই বলা হচ্ছে যে, বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'গীতবিতান' তিন খণ্ডের ভিতর রবীন্দ্রনাথের গানগুলি সুসংকলিত। সুর এবং তালের বিচারেও এসব, বাংলার তথা ভারতের এক গৌরবময় সম্পদ বিশেষ। কিন্তু যে বিপুল সংখ্যক গানে কবি সুরারোপ করে গেছেন, সেগুলির মাথায় চলিত প্রথা মত রাগরাগিণী কিংবা তালের নাম লিখিত ভাবে বড় একটা পাওয়া যায় না। তাইজন্যে অধুনা কোনো কোনো সঙ্গীতজ্ঞ মহলে বিচিত্র ধরনের তর্ক এবং ক্ষোভের সৃষ্টি হতে শোনা যায়। কিন্তু রাগ এবং তালের নাম অনুল্লেখ রাখার পিছনে কবির যে নিজস্ব যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত ছিল তা খোঁজ নিয়ে জানলে বোঝা যাবে,—এ নিয়ে তর্ক করা কিংবা ক্ষোভ প্রকাশ করা নিতান্তই অমূলক।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীকে একটি পত্রে লিখেছিলেন: "গানের কাগজে রাগরাগিণীর নাম-নির্দেশ না থাকাই ভালো। নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে, রূপের মধ্যে না। কোন্ রাগিণী গাওয়া হচ্ছে বলবার কোনো দরকার নেই। কী গাওয়া হচ্ছে সেইটেই মুখ্য কথা;—কেন না তার সত্যতা তার নিজের মধ্যেই চরম। নামের সত্যতা দশের মুখে,—সেই দশের মধ্যে মতের মিল না থাকতে পারে"* (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪শ খণ্ড, পৃ ১৭২)।

কবির এই উক্তির তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। আর সত্যই তো, একথা কে অস্বীকার করতে পারে যে, সংসারে মতের মিলের সন্ধান পাওয়াই যে দুরূহ কাজ! আমি যখন বলব: এর এই নাম;—আবার ঐ একই বস্তু যিনি অন্যভাবে দেখেছেন কিংবা জেনেছেন হয়ত আমার চাইতে বেশি, হয়ত বা কম, তিনি যদি বলেন: উঁহু তা ঠিক হল না,—তখনই ত সৃষ্ট হয় মতানৈক্য। তাই আমরা দেখি, কবি তাঁর উপরি-উক্ত পত্রেতেই শেষ লাইনের সুর টেনে আরো বলেছেন: "কলিযুগে শুনেছি নামেই মুক্তি, কিন্তু গান চিরকালই সত্যযুগে।"

বর্তমান প্রবন্ধ-লেখককেও কবিগুরু তাঁর গানে তালের নাম অনুল্লেখের কথা বোঝাতে গিয়ে একবার বলেছিলেন: "এ-নিয়ে তর্কাতর্কি করে লাভ কি—এর অন্ত পাওয়া তো খুব সোজা কাজ নয়।...কেবল এই কথাটা মনে রাখলেই যথেষ্ট,

* এই উক্তির যাথার্থ্য মর্ম দিয়ে খতিয়ে দেখার জন্যে নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করে সুর-তাল নামাঙ্কিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা মোটামুটি তালিকা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

আমার গানের সঙ্গে যে সঙ্গত করবে তার নিজস্ব রুচিবোধ রসবোধ নিয়েই সে তালের নাম আবিষ্কার করুক আমার আপত্তি নেই—কিন্তু আমি সেখানে দাসখৎ লিখে দিতে যাব না কখনও।…রাগরাগিণীর নাম প্রয়োগের কাজেও আমি আসক্ত নই”—(সুরছন্দা ১৯৬৯ অক্টোবর)।

ঠিক ওই একই কথার প্রতিধ্বনি শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবীকে লেখা গুরুদেবের আরেকটি পত্রে আছে: “আমার আধুনিক গানে রাগ-তালের উল্লেখ না থাকাতে আক্ষেপ করেছিস্। সাবধানের বিনাশ নেই। ওস্তাদরা জানেন, আমার গানে রূপের দোষ আছে,—তারপরে যদি নামেরও ভুল হয় তাহলে দাঁড়াব কোথায়? ধূর্জটিকে দিয়ে নামকরণ করিয়ে নিস্”—(রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪শ খণ্ড, পৃ ৯৭২)।

কবিগুরুর এই বক্তব্য অত্যন্ত সরল ও স্পষ্ট। আরো স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ ভাবেই এ বিষয়ে নিজের মনোভাব তিনি প্রকাশ করেছেন অন্য একটি পত্রে। লিখেছেন:

> “রাগ-রাগিণীর বিশুদ্ধতা নিয়ে যে-সব যাচনদারেরা গানের আঙ্গিক বিচার করেন; কোনোদিন সেই-সব গানের মহাজনদের ওস্তাদিকে আমি আমল দিইনি; এসম্বন্ধে জাত-খোয়ানো কলঙ্ককে আমি অঙ্গের ভূষণ বলে মেনে নিয়েছি। কলার সকল বিভাগে আমি ব্রাত্য, বিশেষভাবে গানের বিভাগে। গানে আমার পাণ্ডিত্য নেই একথা আমার নিতান্ত জানা—তার চেয়ে বেশি জানা, গানের ভিতর দিয়ে অব্যবহিত আনন্দের সহজ বোধ। এই সহজ আনন্দের নিশ্চিত উপলব্ধির উপরে বাঁধা আইনের করক্ষেপ আমাকে একটুও নাড়াতে পারেনি। এখানে আমি উদ্ধত, আমি স্পর্ধিত, আমার আন্তরিক অধিকারের জোরে”—(রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪শ খণ্ড, পৃ ৯৭০)।

যে-কোনো গীতার্থী একটু বিশেষ ধৈর্য্য এবং মনোযোগ সহকারে পড়লেই এরদ্বারা বক্ষ্যমান আলোচ্য বিষয়টি সম্যক অধিগত হতে পারবেন—সেই ভরসায় কবিগুরুর এত বড় এক স্পষ্টোক্তির পিছনে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হল না। অবশ্য, প্রসঙ্গোচিত বিবেচনায়, আরেকটি তথ্য এখানে জেনে রাখা ভালো,—

১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথের ‘শারদোৎসব’ নামীয় নাটকটি প্রকাশিত হয়। যতদূর জানা যায়, এই নাটকে সংযোজিত গানগুলি রচিত হবার আগে পর্যন্ত কবি যত গান রচনা করেছেন, সেগুলির মাথায় চলিত প্রথামত রাগরাগিণী ও বিবিধ তালের নাম উল্লেখ করে দিতেন তিনি নিজেই। পরবর্তীকালে এই রীতি রক্ষার প্রতি তাঁর উৎসাহ লোপ পেয়েছিল। এর কারণগুলি ইন্দিরা দেবীকে লেখা তাঁর উপরিউক্ত দুইটি পত্রে এবং আমাদের অত্র সংকলিত আরো অন্যান্য উদ্ধৃতিগুলির মধ্যেও কিছুটা ব্যক্ত হয়েছে। কার্যতঃ আমরাও দেখি, তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত সুরারোপিত বাকী গানগুলির কোনটি যে কী তালে এবং কী রাগিণীতে গাইতে হবে এর কোনো লিখিত নির্দেশ রবীন্দ্রনাথ পূর্ববৎ আর দিয়ে যান নি,—অর্থাৎ ‘শারদোৎসব’

নাটকের গানগুলি রচনার পর থেকে আমৃত্যু (১৯৪১ সাল পর্যন্ত) রাগরাগিণী এবং তালের নাম অনুল্লেখ রেখেই গীত রচনা করে গেছেন। মোটকথা গানের সঙ্গে তাল কিংবা রাগরাগিণীর নাম উল্লেখ না-করার কাজটা যে ছিল তাঁর সম্পূর্ণ ইচ্ছাপ্রসূত—এতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং তাঁর এই ইচ্ছার কারণটিকে যাঁরা আরো বিশদভাবে জানতে বুঝতে চান তাঁদেরে, এতদ্‌সম্পর্কীয় কবিগুরুর স্ব-রচিত আরো সব প্রবন্ধাদি সংগ্রহ করে পড়াশুনা করতে অনুরোধ করি—বিশেষ করে আরো এই জন্যে যে, অন্যের ভাষ্যের দ্বারা ভ্রান্ত পথে যাবারও তো আশংকা থাকতে পারে।

সঙ্গীতে কিংবা গানে সুর-রচনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে যে-সব মতামত প্রকাশ করে গেছেন তার কিছু-কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হল। আশাকরি এগুলি,—তাঁর সুর-সৃজনী-প্রতিভার মৌলিক অবদান যে কী তা বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের আংশিক সহায়ক হবে।—কবি বলছেন :

"সঙ্গীতবেত্তাদিগের প্রতি আমার এই নিবেদন যে, কী কী সুর কি-রূপে বিন্যাস করিলে কী কী ভাব প্রকাশ করে, আর কেনই বা তাহা প্রকাশ করে, তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন। মূলতান, ইমনকল্যাণ, কেদারা প্রভৃতিতে কী কী সুর বাদী আর কী কী সুর বিসম্বাদী তাহার প্রতি মনোযোগ না করিয়া,—দুঃখ, সুখ, রোষ বা বিস্ময়ের রাগিণীতে কী কী সুর বাদী ও কী কী সুর বিসম্বাদী [হইতে পারে] তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন। মূলতান কেদারা প্রভৃতি তো মানুষের রচিত কৃত্রিম রাগরাগিণী,—কিন্তু আমাদের সুখ-দুঃখের রাগরাগিণী কৃত্রিম নহে। আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার মধ্যে সেই-সকল রাগরাগিণী প্রচ্ছন্ন থাকে। কতকগুলা অর্থশূন্য নাম পরিত্যাগ করিয়া, বিভিন্ন ভাবের নাম অনুসারে আমাদের রাগরাগিণীর বিভিন্ন নামকরণ করা হউক"—(ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ)।

"গান নিয়ে যারা বচসা করে তারা আর কিছু ধরবার পায় না, ধরে গিয়ে রাগরাগিণীর বাঁধা নিয়মকে। এই নিয়ম নিয়ে পাণ্ডিত্য। এই পাণ্ডিত্যে সম্ভোগ নেই, অহংকার আছে। শুধু অহংকার আছে বললেও অবিচার করা হয়। অভ্যাসের যথাযথ পুনরাবৃত্তিতে মানুষ, একশ্রেণীর সুখ পায়।···অভ্যাসের আফিমী মৌতাতে যাদের মন ঝিম্ হয়ে আছে, বন্ধনমুক্ত রসের লীলায় তাদের নেশা ছুটে যায় বলেই তারা রেগে ওঠে। তারা বলে রসভঙ্গ হোলো। বস্তুত নিয়মভঙ্গকেই তারা বলে রসভঙ্গ। বিজ্ঞসমাজে যেমন আচারের ত্রুটিকেই বলে ধর্মনাশ;—ভুলে যায় যে, নিত্যধর্মের খাতিরেই আচারকে ভাঙতে হয়"—(দেশ ১৩৮০ সাহিত্যসংখ্যা, পৃ ১৯)।

"সঙ্গীতটা সৃষ্টির ক্ষেত্র। যারা সৃষ্টি করবে তারা নিজের পন্থা নিজেই বেছে নেবে—পুরানো নতুনের সমন্বয় তাদের কাজের দ্বারাই,—বাঁধামতের দ্বারা নয়"—(সুর ও সঙ্গতি, পৃ ৫০)।

"গানকে আচারের শিকলে যাঁরা অচল করে বেঁধেছেন, সেই ডিক্‌টেটারদের আমি মানি নে। যাঁরা বলেন, ভারতীয় গানের বিরাট ভূমিকার উপরে নব নব যুগের নব নব যে-সৃষ্টি স্বপ্রকাশ, তার স্থান নেই ;—এখানে হাতকড়ি-পরা বন্দীদের পুনঃপুনঃ আবর্তনের অনতিক্রমণীয় চক্রপথ আছে মাত্র, এমনতর নিন্দোক্তি যাঁরা স্পর্ধা-সহকারে ঘোষণা করে থাকেন—তাঁদেরই প্রতিবাদ করবার জন্যই আমার মতো বিদ্রোহীদের জন্ম"—(সুর ও সঙ্গতি, পৃ ৮)।

"সংগীতে আমি নির্মমভাবে আধুনিক, অর্থাৎ জাত বাঁচিয়ে আচার মেনে চলি নে। কিন্তু একেবারেই ঠাট বজায় না রাখি যদি, তবে সেটা পাগলামি হয়ে দাঁড়ায়"—(সুর ও সঙ্গতি, পৃ ৬)।

"হিন্দুস্থানীসংগীত আমি সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসি—আজ বলে নয়, বাল্যকাল থেকেই।···কিন্তু ভালো লাগে বলেই যে তার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করতে হবে—এ কথাটা কথাই নয়।···হিন্দুস্থানীসঙ্গীত থেকে আমরা কী পাব? না, প্রেরণা—ইন্‌স্‌পিরেশান। ···আমি মানি, রাগরাগিণীর একটা নিজস্ব মহিমা আছে। এও মানি যে রাগরাগিণীব পরিচয় বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ওই-যে বললাম,—তা থেকে প্রেরণা পেতে, তাকে নকল করতে নয়"—(তীর্থংকর, পৃ ১৫৫-৫৬)।

"মানুষের কতকগুলো অহংকারের বিষয় আছে। যেমন, আমার গান। আমি জানি সেখানে আছে আমার একটা বিশেষত্ব। আমি আপনার একটা objective মনস্তত্ত্বের একটা দৃশ্য পাই। কী রকম কবে হৃদয়ে ভেসে উঠছে—কতখানি সত্য, সুখ, দুঃখ idealise করছে। যেখানে সকল বিশ্বের harmony-র মূল—আমার গানে আমি সেখানে পৌঁছুই। গানটা শুনলেই আশ্চর্য হয়ে যাই। [আমার গানের] এই সুরগুলি কারো কাছে ধার করা নয়। কোথা থেকে যে এসেছে বলতে পারিনে। কিছু বাছবিচার নেই, ভয় ডর নেই। আপনার ইচ্ছেমতো গলায় এসেছে—গেয়েছি ; গান হয়ে উঠেছে"—(আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, পৃ ১২২-১২৩)।

"জানোই তো, গান রচনা করেছি, সুর দিয়েছি, গেয়েছি,—কিন্তু কোনোদিনও ওর পাণ্ডিত্যের দিকটাতে পা বাড়াই নি, ভালোও লাগেনি কোনো দিন।···আমি গানের প্রেরণা পেয়েছি আমার ভিতর থেকে, তাই আপন লীলায় আপন ছন্দে ভিতর থেকে যে-সুর ভেসে ওঠে তা-ই আমার গান হয়ে দাঁড়ায়"—(তীর্থংকর, পৃ ১৪৮ এবং ১৫০)।

ইত্যাকার আরো বহু উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে মোটামুটি ভাবে ধরে নেওয়া যায়,—রবীন্দ্রনাথ যখন সাধারণত তার গানের কথার অর্থ ও ভাব অনুযায়ী সুর-সংযোজনা করেছেন কিংবা কখন-সখন সুরের অর্থ ও ভাব অনুযায়ী কথার, তখন এর মধ্যে কোনো বিশেষ প্রকারে চিহ্নিত রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা গতানুগতিক রীতি অনুসারে রক্ষিত

হয়েছে যতটুকু—তার চেয়ে মিশ্রণ ঘটেছে অনেক অনেক বেশি। এবং কোনো মিশ্রণই একেবারে অর্থহীন নয়,—বরং প্রত্যেকটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ—বহু উচ্চ শিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের পর্যন্ত ভাবিয়ে তোলে, চমক লাগায়।

কিন্তু প্রশ্ন হল; এগুলি কি শুধু শুধু স্বদেশীয় সঙ্গীতের, না বিদেশীয় সংগীতেরও রাগরাগিণীর অনুপ্রেরণায় সৃজিত—এর সঠিক জবাব দেবে কে?

রবীন্দ্রনাথ তো আর কেবল একই জায়গায় বসে থেকে তাঁর সমস্ত গানগুলি তৈরি করেন নি। বহু দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন তিনি এবং যখন যেখানে গেছেন সেখানের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শোনারও সুযোগ ঘটেছে তাঁর। তখন ঐ-সকল সঙ্গীতের মধ্যে মনের মতো যেটুকু যখন পেয়েছেন তা-ই সংগ্রহ করে প্রয়োগ করেছেন নিজের গানে,—তাও সম্পূর্ণ নিজের মতন করে নিয়ে,—নকল করে নয়। এমনতর কাজে সঙ্গীত-সন্ন্যাসী দিলীপকুমার রায়কেও উৎসাহিত করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন:

> "তুমি তো অনেকদিন য়ুরোপে ছিলে, তাদের সংগীতের ভালো ভালো জিনিস দিয়ে যদি বাংলা গানেব সাজি ভরাতে পার তবে সেটা একটা সত্যিকারের কাজ করা হবে। অন্ধ অনুকরণ দোষের বটে, কিন্তু স্বীকরণ নয়"—(তীর্থংকর, পৃ ১৪৯)।

এই বিশেষ উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হল, রবীন্দ্রনাথের গানে নানা দেশীয় সুরারোপের আদর্শটি বুঝতে গিয়ে যাতে কারো কোনো অসুবিধে না হয় সেইজন্য।

কবিগুরুর এই সুরারোপ প্রসঙ্গেই আরেকটি সময়োচিত উদ্ধৃতি যোগ করছি। রবীন্দ্রনাথের 'সঙ্গীত-সাধনা' অধ্যায়ে প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীশান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন: "কতবার দেখেছি গুরুদেবের অন্তরে যখন গান রচনার প্রেরণা জাগত তখন তার কী বেগ,—একটার পর একটা গান তৈরি করে চলেছেন।…গানের সুর ঠিক রাখবার জন্যে কখনো তাঁর বাজনার প্রয়োজন হয় নি, বা রাগিণী ঠিক রাখবার জন্যে কখনো রাগ-রাগিণী ভাঁজেন নি! সুর যে কোথা থেকে ছাড়া পেয়ে যেমন খুশি ছুটে আসতে থাকে তা কে জানে! · কথা ও সুরের মিলনে যে-রূপটি খাড়া হল তাতেই তিনি খুশি। অনেক সময় সুরগুলি যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে আসে, তেমনি আবার কাজ শেষ হয়ে গেলেই তাঁর মন থেকে চলে যায়। গান রচনার সময় সুরগুলি যে হুবহু প্রচলিত শাস্ত্রানুযায়ী আসছে তাও নয়। তা নিয়ে তিনি কোনোদিন লজ্জিত নন, এবং শোধরাবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি।…গুরুদেবের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার নিয়ম ছিল খুব বাঁধা। [অথচ] সেই মানুষই গানের প্রেরণায় নিয়মকে সম্পূর্ণ ভাসিয়ে দিয়েছেন"—(রবীন্দ্রসঙ্গীত-I, পৃ ৩)।

ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীরও একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি এখানে উদ্ধারযোগ্য: "পুরাপ্রথার বিরোধে রবীন্দ্রনাথের গানে রাগের জাতি অপেক্ষা সুরের ব্যক্তিত্বই বেশী পরিস্ফুট। ও সেইজন্যেই তাঁর গানের স্বরলিপি এবং বিশুদ্ধ স্বরলিপি থাকা এত অত্যাবশ্যক"—(বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯ কার্তিক)।

অতএব এই ধরণের সব প্রণিধানযোগ্য উদ্ধৃতি, বিশেষতঃ আরো আগে উপরে উদ্ধৃত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উক্তি কয়টি, পড়ে কিংবা না-পড়েই আমরা যদি এখন এই চলতি আলোচ্য বিষয়ের উপর আমাদের অতি সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির মাপকাঠিতে একটা মামুলী রায় দিয়ে বসি,—তাহলে এরদ্বারা রবীন্দ্রনাথের সুর-সৃজন প্রতিভা-বিচারের কাজটি যথাযথ সম্পন্ন হবে কিনা সেটাও ভেবে দেখে দরকার। তাছাড়া কবিগুরু, গান সৃষ্টির প্রেরণায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বাঁধা নিয়মকে অনেকক্ষেত্রে ভাসিয়ে দিয়েছেন তা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করেও—আমরা এর বিচারের সময় যখন আবার একে শাস্ত্রীয় নিয়মের আওতায় টেনে এনে এর মধ্যে একটা অদ্ভুত রকমের তালগোল পাকিয়ে বসি তখন হয়ত একেবারে ভুলেই যাই, যে, এক্ষেত্রে সতর্কতার অনুরোধটুকুও রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে গিয়েছেন এই বলে :

চিন্তায় এবং কাজে সামঞ্জস্যের অভাব

"গান-রচনায় আমি নিজে কী করেছি, কোন্ পথে গেছি,—গানের তত্ত্ববিচারে তার দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা অনাবশ্যক। আমার চিত্তক্ষেত্রে বসন্তের হাওয়ায় শ্রাবণের জলধারায় মেঠো ফুল ফোটে, বড়ো-বড়ো-বাগানওয়ালাদের কীর্তির সঙ্গে তার তুলনা তোমরা কোরো না"—(সুর ও সঙ্গতি, পৃ ৬৬)।

অতএব এবার তো নিজেরাই নিজেদের খোলাখুলি জিজ্ঞেস করতে পারি,—কবিগুরুর অনুরোধ কি আমরা বিনম্র চিত্তে রক্ষা করব,—না অম্‌নিতেই উপেক্ষা করে চলব ? এমনতর জিজ্ঞাসার প্রতি যদি কেউ কোনো গুরুত্ব আরোপ না করেন তাহলে বলতে হয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ব্যবহৃত রাগরাগিণীগুলির নিখুঁত ও নির্ভুল সনাক্ত করতে পারেন এক তিনি, যিনি পৃথিবীর যাবতীয় রাগরাগিণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে সুর-বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেছেন অর্থাৎ সুর-সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ যে-মহাগুণিজন। এ সিদ্ধান্তটি পাণ্ডিত্যাভিমানীরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থনযোগ্য বলে গ্রহণ করবেন কিনা সেটা তাঁরাই জানেন, কারণ 'এতো বড়ো ভূমণ্ডলে শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি অনেকেরই অতি সামান্য ; কাহারও সম্পূর্ণ নহে'—এই চিরন্তন বাস্তব সত্যটিকে অম্লান-বদনে মেনে নিলে যে আবার তাঁদের সযত্নে লালিত চিন্তাভিমানে রিক্ততা প্রকাশের আশংকা থেকে যায়—তাও তো দেখবার বিষয় বটে। ঐ ভিন্ন প্রসঙ্গ আপাতত বাদ দিয়ে এখানে শুধু বলি,—আমাদের দেশের সঙ্গীতানুরক্ত জ্ঞানপিপাসুদের দিক থেকে এটা খুব ভালো করে অর্থাৎ গোঁড়ামি-মুক্ত মন নিয়ে উদারভাবে ভেবে দেখা উচিত,—বহু বিদেশীয় সঙ্গীতের সুরের ভিতরেও কিন্তু ভারতীয় রাগরাগিণীর কিছু-না-কিছু সন্ধান মিলে যায় হঠাৎ-হঠাৎ কোনো-কোনো জায়গায়—তাই বলে সে-সবকে কি বলব ভারতীয় সুর ? পক্ষান্তরে ভারতীয় গানে খাঁটি ভারতীয় রাগ বজায় রেখে কখন-সখন সহসা বিদেশীয় ঢং-এ যে উল্লাস ও উত্তেজনার আমেজ ফুটিয়ে তোলা যায়—তা শুনেও কি বলতে হবে—এ-সুর বিদেশীয় ?

মোটের উপর এই প্রসঙ্গে কোনো প্রকারের পাণ্ডিত্যের 'চ্যালেঞ্জ' না-দেখিয়ে আপাতত

এটুকু বুঝতে পারলেই বোধকরি যথেষ্ট হবে, যে, যদিও অধিকাংশ রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুর-তালের নামোল্লেখ নেই এবং এদের প্রচলিত বাঁধা নিয়মাদির উপর বহু ব্যতিক্রম নির্দ্বিধায় ঘটিয়েছেন রচয়িতা স্বয়ং—তাহলেও এসব দেখে-শুনে অনভ্যস্ত গীতার্থীদের নিরাশ বা ক্ষুব্ধ হওয়া অনুচিত। তাছাড়া আজকাল ত সকলেই জানেন,—রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী যেমন মুদ্রিত পুস্তকাদিতে নির্ধারিত—তেমনি তাঁর গানের সুরের রূপগুলিও স্বরলিপিতে সুনিশ্চিতভাবে স্থিরীকৃত হয়ে আছে। গানগুলির সুর স্বরলিপিকারেরা কবির জীবিতকালেই কবির অনুমোদনক্রমে স্বরলিপিবদ্ধ করে রেখেছেন—যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে তালাংকাদির সহকারে। সুতরাং এই স্বরলিপিগুলি চোখে দেখামাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের রাগরাগিণী ও তালের নাম নির্ণয় করা,—যাঁরা স্বরলিপি লিখন-পঠনে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত—তাঁদের পক্ষে ত তেমন অসাধ্য ব্যাপার কিছু নয়! তবে অবশ্যি, আমাদের দেশীয় স্বরলিপিতে গাইবার লয়টা অনেক সময় ঠিক ধরা যায় না;—কারণ, লয়-নির্ণয়ের জন্যে কোনো সন্তোষজনক সাংকেতিক চিহ্ন আজও বোধহয় আমাদের মধ্যে প্রবর্তিত হয় নি,—এই একই ধরণের অসুবিধা অনুভবের অবকাশ আছে যথেষ্ট আমাদের কথন এবং পঠনযোগ্য ভাষালিপিতেও কিন্তু,—সে অন্য কথা অন্যত্র বলবার।

* *　　　* *　　　* *

এতক্ষণ যা বলা হল—এরই কোনো কোনো অংশবিশেষের সারমর্ম রবীন্দ্রনাথের তাল-সৃজনী প্রতিভা-আলোচনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। তবে এর আগে আলোচকদের কাছে এই কথাটি স্পষ্ট হওয়া উচিত, যে 'তাল' বলতে তালজ্ঞরা যা বোঝাতে চান কিংবা আমরা বই-পত্র পড়ে যা বুঝি—রবীন্দ্রনাথের গানেতে সব সময় সব জায়গায় কি তালটা ঠিক ঐ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে,—নাকি তা পারে কখনও হতে? যেমন,—

কয়টি প্রচলিত তালের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

দাদরা: ৬ মাত্রার তাল॥ মাত্রা বিভাগ ৩+৩ (ত্রিমাত্রিক ছন্দ)
প্রথম মাত্রায় তালি ও সম এবং চতুর্থ মাত্রায় খালি বা ফাঁক।

ঠেকা:　　I ধা ধিন্ না | না থুন্ না I
(ধা above: +; second না above: ০)

(রবীন্দ্রগীতিপ্রবাহ-১ম ভাগ)

কাহরবা বা কার্ফা: ৮ মাত্রার তাল॥ মাত্রা বিভাগ ৪+৪ (চতুর্মাত্রিক ছন্দ)
প্রথম মাত্রায় তালি। পঞ্চম মাত্রায় খালি।

ঠেকা:　　I ধা গে না তি | না ক ধি না I
(ধা above: +; second না above: ০)

(রবীন্দ্রগীতিপ্রবাহ-১ম ভাগ)

ত্রিতাল : ১৬ মাত্রার তাল ॥ মাত্রা বিভাগ ৪+৪+৪+৪ (চতুর্মাত্রিক ছন্দ)
১ম মাত্রায় তালি ও সম। ৫ম ও ১৩শ মাত্রায় তালি। ৯ম মাত্রায় খালি।

+ ২ ০ ৩
ঠেকা : I ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধা ধিন্ ধিন্ ধা | না তিন্ তিন্ তা | ধা ধিন্ ধিন্ ধা I
(রবীন্দ্রগীতিপ্রবাহ-১ম ভাগ)

চৌতাল : ১২ মাত্রার তাল ॥ মাত্রা বিভাগ ২+২+২+২+২+২ (দ্বিমাত্রিক ছন্দ)
১ম মাত্রায় সম। ৩য় ও ৭ম মাত্রায় খালি। ৫ম, ৯ম ও ১১শ মাত্রায় তালি।

+ ০ ২ ০ ৩ ৪
ঠেকা : I ধা ধা | দেন্ তা | কৎ তাগে | দেন্ তা | তেটে কতা | গদি ঘেনে I
(রবীন্দ্রসঙ্গীত-সাধনা)

একতাল : ১২ মাত্রার তাল ॥ মাত্রা বিভাগ তিন রকমের, যথা,—
(রকম নং ১). ৩+৩+৩+৩ : ত্রিমাত্রিক ছন্দানুসারে : ১ম মাত্রায় সম।
৪র্থ মাত্রায় তালি। ৭ম মাত্রায় খালি। ১০ম মাত্রায় তালি।

+ ৩ ০ ১
ঠেকা : I ধিন্ ধিন্ ধা | ধা থুন্ না | কৎ তে ধাগে | তেটে ধিন্ ধা I
(গীত-পরিচয়)

(রকম নং২) ৪+৪+৪: চতুর্মাত্রিক ছন্দানুসারে : ১ম, ৫ম, ৯ম মাত্রায় তালি। ফাঁক নেই।

ঠেকা : I ধিন্ ধিন্ তাগে তেটে | থুন্ না কৎ তা | ধাঁগে তেটে ধিন্ ধা I
(রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধনা)

(রকম নং ৩) ২+২+২+২+২+২ : দ্বিমাত্রিক ছন্দানুসারে : বিলম্বিত লয়।
এই পদ্ধতিতে ৫টি আঘাত, ১টি ফাঁক।

+ ২ ০ ৩ ৪ ৫
ঠেকা : I ধিন্ ধিন্ | ধাগে ত্রেকেটে | থুন্না নানা | কৎ তা | ধা ত্রেকেটে | ধিন্ ধাধা I
(রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধনা)

বিশেষ লক্ষণীয় : একতালে বাঁধা রবীন্দ্রসঙ্গীত অনেক সময় অনেক জায়গায় দ্বিমাত্রিক ছন্দে গাইতে শোনা যায় হয়ত; কিন্তু একতালে বাঁধা কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীতই দ্বিমাত্রিক ছন্দে স্বরলিপিতে আবদ্ধ পাওয়া যায় না,—অধিকাংশগুলিই ত্রিমাত্রিক ছন্দে আবদ্ধ—চতুর্মাত্রিক ছন্দে আছে কয়েকটি মাত্র।

ঝাঁপতাল : ১০ মাত্রার তাল ॥ মাত্রা বিভাগ ২+৩+২+৩
১ম মাত্রায় সম, ৩য় ও ৮ম মাত্রায় তালি ; ষষ্ঠ মাত্রায় খালি বা ফাঁক।

+ ৩ ০ ১
তবলার ঠেকা : I ধা তি | ধা ধা তি | না তি | ধা ধা তি I
পাখোয়াজের ঠেকা : I ধা ধিৎ | ধা ধিন্ না | কেটে তাক্ | ধা ধিন্ না I
(গীত-পরিচয়)

সুরফাঁক তাল : ১০ মাত্রার তাল ॥ মাত্রাবিভাগ ৪+২+৪ (বিষ্ণুপুরীপদ্ধতি)
এই তাল ধ্রুপদ গানে ব্যবহার হয়। এর তিনটি ভাগেই তালি ; ফাঁক নেই কোথাও।

+ ২ ৩
ঠেকা : I ধা ঘেনে নাগ্ দ্দি | ঘেনে নাগ্ | গ দ্দি ঘেনে নাগ্ I
(গীত-পরিচয়)

এ-ছাড়া এইতালের মাত্রা বিভাগ প্রচলিত পদ্ধতি মতে ২+২+২+২+২ করেও আছে।
এর ১ম মাত্রায় সম ৩য় ও ৯ম মাত্রায় খালি। ৫ম ও ৭ম মাত্রায় তালি।

+ ০ ২ ৩ ০
ঠেকা : I ধা ঘেড়ে | নাগ্ দি | ঘেড়ে নাগ্ | গদ্ দি | ঘেড়ে নাগ্ I
(রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধনা)

রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য রাখবেন,—এই শেষোক্ত ‘প্রচলিত পদ্ধতি’ অনুযায়ী সুরফাঁকের মাত্রা বিভাগ কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপিতে পাওয়া যায় না।

তেওরা বা তীব্রা : ৭ মাত্রায় তাল ॥ মাত্রা বিভাগ ৩+২+২
১ম মাত্রায় তালি ও সম, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ মাত্রায় তালি। এই তালে ফাঁক নেই।

+ ২ ৩
ঠেকা : I ধি ধি না | ধি না | ধি না I
(রবীন্দ্রগীতিপ্রবাহ-১ম ভাগ)

আড়া চৌতাল : ১৪ মাত্রার তাল ॥ মাত্রা বিভাগ ২+৪+৪+৪ (বিষ্ণুপুরী পদ্ধতি)
রবীন্দ্রসঙ্গীত-স্বরলিপিতে আড়া চৌতালের মাত্রা বিভাগ উক্ত বিষ্ণুপুরী পদ্ধতি অনুসারেই পাওয়া যায়। এর প্রত্যেকটি তালেই আঘাত ; কোনো ফাঁক নেই।

+ ২ ৩ ৪
ঠেকা : I ধা গে | ধা গে দেন্ তা | কৎ তাগে দেন্ তা | তেটে কতা গদ্দি ঘেনে I
(রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধনা)

অথবা

I ধাক্— | ধা ধা খিন্ তা | কৎ তেকে তেরে কেটে | তাকে কেটে গদ্দি ঘেনে I
(স্বরলিপি-গীতিমালা : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এ-ছাড়া অন্য প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে 'আড়া চৌতালে'র মাত্রা বিভাগ: ২+২+২+২+২+২+২ এর ১ম মাত্রায় সম, ৩য় মাত্রায় তালি, ৫ম মাত্রায় ফাঁক, ৭ম মাত্রায় তালি, ৯ম মাত্রায় ফাঁক, ১১শ এবং ১৩শ মাত্রায় তালি।

ঠেকা: I ধা গে | ধা গে | দেন্ তা | কৎ তাগে | দেন্ তা | তেটে কতা | গদি ঘেনে I
(+ ২ ° ৩ ° ৪ ৫)

(রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধনা)

ধামার তাল: ১৪ মাত্রার তাল॥ মাত্রা বিভাগ দুই প্রকারের

(প্রকার নং ১) বিষ্ণুপুরী পদ্ধতি: ৩+২+২+৩+৪

এই পদ্ধতিই রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপিতে ব্যবহৃত হয়েছে। এরমধ্যে ৩টি তাল, ২টি ফাঁক।

ঠেকা: I ক ধে টে | ধে টে | ধা — | গ দি নে | দি নে তা — I
(+ ° ২ ° ৩)

(রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধনা)

(প্রকার নং ২) প্রচলিত পদ্ধতি: ৫+২+৩+৪ (রবীন্দ্রসঙ্গীত-স্বরলিপিতে এই পদ্ধতির ব্যবহার পাওয়া যায় না) এই পদ্ধতি অনুসারে এই তালে ৩টি তাল এবং ১টি ফাঁক।

ঠেকা: I ক ধি ট ধি ট | ধা — | গ দি ন | দি ন তা — I
(+ ২ ° ৩)

(রবীন্দ্রগীতিপ্রবাহ-২য় ভাগ)

[তালের ঠেকার প্রতি মাত্রার বাণী বা বোল বিভিন্ন রকমের হতে পারে। সঙ্গতের সময় মাত্রার স্বর বা স্বরসমষ্টি কিংবা আশের সংখ্যা অনুপাতে তালসঙ্গতকারেরা ঠেকার বাণীর প্রয়োগ আবার কম-বেশিও করে থাকেন—সে সব কথা অন্যত্র আলোচ্য। এখানে ঠেকার যে কয়টি বাণী বা বোল দেওয়া হয়েছে, সেগুলি অতি প্রচলিত এবং পুরোবর্তী বিশেষজ্ঞদের রচনার সাহায্যে লিখিত]

এসব হল, "তাল" চেনবার শাস্ত্রীয় বাঁধা রীতিনীতি।

এমনতর বিভিন্ন ধরনের নিখুঁত অঙ্ক গণনার মাধ্যমে আরো বহুপ্রকার তালের শাস্ত্রীয় নিয়মকানুন কাঁটায় কাঁটায় বজায় রেখে যদি কেউ গান গাইতে পারেন—আমরা তা শুনে খুশি হয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলি: "হ্যাঁ লোকটা তাল-সিদ্ধ বটে,—জানে তালের ব্যবহার কী করে করতে হয়।"

কিন্তু এই মন্তব্যটি (অর্থাৎ কেউ তালসিদ্ধ হতে পারলেই যে গায়ক হিসেবেও তিনি একজন সুরসিক হবেন—এমনতর সিদ্ধান্ত) সকল রকমের বাংলাগান পরিবেশনের ক্ষেত্রেও যে খুব প্রযোজ্য এবং যথাযথ তা বললে ভুল হবে। কারণ, এখানে শুধুমাত্র তালের সংখ্যা গণনার বিচারটি মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়াতে—

গায়কের পরিবেশিত গানের বাণীগুলি যথার্থভাবে রসোত্তীর্ণ হল কি, হল না—সেটার বিচার প্রায় গৌণ থেকে যায়। তদুপরি রবীন্দ্রনাথের গান যখন বাংলা ভাষাতেই রচিত—এবং বিশেষকরে বাংলা কাব্য তথা বাণী ও ভাবপ্রধান, তখন এই গানের মধ্যে উপরোক্ত শাস্ত্রের বাঁধা প্রচলিত রীতিতে তাল ব্যবহারের process-টা যে সব সময় ঠিক খাপ খেতে পারে না—সেটা খুব সুস্থ এবং স্থির মস্তিষ্কে বোঝা দরকার। সকল রকমের গোঁড়ামি তথা সংস্কারমুক্ত হয়ে এর বিচারে অবতীর্ণ হলে দেখা যাবে,—তাল ব্যবহাবের শাস্ত্রীয় রীতিনীতিকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে কাঁটায় কাঁটায় খাপ খাওয়াতে পারলেও (কেননা অনেক তালসিদ্ধ নিপুণ গায়ক শিল্পীরা নাকি একাজটা প্রায়শঃ সদম্ভেই সম্পন্ন করে থাকেন বলে শোনা যায়, তবু) এর দ্বারা রবীন্দ্রসঙ্গীতে ব্যবহৃত কথাগুলির ভাবসম্পদ পুরোপুরি ভাবে অনেক সময় অক্ষুণ্ণ থাকে না অনেক ক্ষেত্রে। বহুজনের বহু অভিজ্ঞতাব মধ্যদিয়েই জানা গেছে, যে, গানের তালের মধ্যে অঙ্কের হিসাব ঠিক রাখতে গিয়ে—গানের কথার ভাবপ্রকাশের উপর অন্যমনস্কতা এসে পড়েই পড়ে—অর্থাৎ কথার অর্থ ও ভাব প্রকাশের জন্যে মনের যে একাগ্রভাব প্রয়োজন—সেটা ব্যাহত হয়। তেমনি পক্ষান্তবে—বিশেষ করে গানের কথা ও ভাব প্রকাশেব দিকে মন দিলে আবার তালেব অঙ্ক গণনার হিসাবটির মধ্যেও গরমিল ঘটতে বাধ্য;—এবং এটা যখন ঘটে তখনই আমাদের সংস্কাববদ্ধ মনে ঘা লাগে—আমবা বলি: 'আঃ তালটা কেটে গেল।' কিন্তু রসিক অভিজ্ঞজনেরা জানেন ও বোঝেন যে, বাংলাগানে এমনতব ঘটনা আশ্চর্যের নয়, বরং অনিবারণীয়। বাংলা গীতভক্তদের গানে, ভাব প্রকাশের কাজে অতিরিক্ত মনঃসংযম করতে গিয়ে, তাল যদিও বা কখন-সখন কাটে—তাইবলে এতে ছন্দেব পতন ঘটে না। অর্থাৎ ত্রিতালের ছন্দের ১৬ মাত্রা শেষ করে ১ম মাত্রায় ঝোঁক এবং নবম মাত্রায় ফাঁক, হয়ত প্রথাসম্মত মতে অনভ্যস্ততার জন্যে সর্বক্ষণ বিশুদ্ধভাবে দেখানো যেতে না পারে, কিন্তু এই তালের গানটি শুধু ৪-৪ মাত্রার ছন্দে কিংবা ২-২ মাত্রার ছন্দে নির্ভুল গেয়ে যেতে বাংলাগীতশিল্পী কারুর অসুবিধা হয় না,—মোটকথা সমমাত্রাব ছন্দতেই এ-তালেব রূপটি রক্ষিত হয়। তেমনি, ১২ মাত্রার ছন্দের 'একতাল'-কেও সেই শাস্ত্রে বাঁধা প্রথানুযায়ী তাল-ফাঁকের কাজ না-দেখিয়ে শুধু ৩-৩ মাত্রার ছন্দে (কোন-কোন ক্ষেত্রে ২-২ মাত্রার ছন্দেও) নির্ভুল গেয়ে যাওয়া চলে। বলাবাহুল্য, এই ব্যাপারগুলি বাংলা-গানে স্বাভাবিক রীতিতেই ঘটে বেশি। শাস্ত্রীয় রীতি অনুযায়ী এর মধ্যে যেটুকু তালে মেলানো হয়—সেটা সবসময় কিন্তু ঠিক স্বাভাবিক নয়—অনেক কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনার ব্যাপার।

তাইজন্যে বলছিলাম, 'তাল' বলতে তালজ্ঞরা সাধারণত যা বোঝাতে চান—রবীন্দ্রনাথের গানে তা' ঠিক সে-ভাবে যে সব-সময় সবক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না,

এই মূল কথাটা যদি আমাদের আলোচকদের কাছে শান্ত নির্মলানুভূতির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তাল সম্পর্কিত উক্তিগুলিও অনুধাবন করা তাঁদের প্রত্যেকের পক্ষে সহজ ও সুন্দর হতে পারে। ১২৮৮ সালের 'ভারতী' জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় অনেক বৎসরকাল আগে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

"[রাগরাগিণীর মত] তালও ভাবপ্রকাশের একটা অঙ্গ। যেমন সুর—তেমনি তালও আবশ্যকীয়, উভয়ে প্রায় সমান আবশ্যকীয়। অতএব ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালও দ্রুত এবং বিলম্বিত করা আবশ্যক—সর্বত্রই যে তাল সমান রাখিতেই হইবে তাহা নয়। ভাবপ্রকাশকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া সুর ও তালকে গৌণ উদ্দেশ্য করিলেই ভালো হয়। ভাবকে স্বাধীনতা দিতে হইলে সুর এবং তালকেও অনেকটা স্বাধীন করিয়া দেওয়া আবশ্যক, নহিলে তাহারা ভাবকে চারিদিক হইতে বাঁধিয়া রাখে। এই সকল ভাবিয়া আমার বোধহয় আমাদের সঙ্গীতে যে নিয়ম আছে যে, যেমন-তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভালো হয়*। তালের সমমাত্রা থাকিলেই যথেষ্ট,—তাহার উপরে আরো কড়াক্‌কড় করা ভালো বোধ হয় না। তাহাতে স্বাভাবিকতার অতিরিক্ত হানি করা হয়।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে,—সঙ্গীত পরিবেশনের জন্যে আনুষঙ্গিক কার্য্যকলাপের ভিতরে যে 'স্বাভাবিকতা'র প্রয়োজন খুব বেশী—সেটার প্রতিই রবীন্দ্রনাথ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন বিশেষ করে। কিন্তু হায়, এ যে অরণ্যে রোদন। যথার্থ তালজ্ঞ এবং সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে কয়জনেই বা সেদিকে নিরভিমান চিত্তে আকৃষ্ট হন। হলেও কবির উক্তিকে কার্যকর করার প্রতি তাঁদের আগ্রহ কতটুকুই বা।

প্রাসঙ্গিকবোধে একটা উদ্ধৃতি নিচ্ছি,—"১৮৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দের কথা : সঙ্গীতপ্রেমী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সঙ্গীতসমাজের মেম্বার থাকাকালীন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তালজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কবির ভ্রাতা বলেন,—'রবিকে অনেক বলেছি, কিন্তু ভাব দিয়ে টানা গাওয়া-ছাড়া—তালের বাঁধন সে মানতেই চায় না, - কি করব ?"—(সুরছন্দা ১৯৫৫ জুলাই, পৃ ৩৩)। তাই বোধকরি একমাত্র রবীন্দ্রনাথই স্বচ্ছন্দে বলতে পেরেছেন : "সঙ্গীত মনোভাব-প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় মাত্র। আমরা যখন কবিতা পাঠ করি তখন তাহাতে অঙ্গহীনতা থাকিয়া

---

* এ-বিষয়ে দিলীপকুমার রায়ের 'সাঙ্গীতিক' গ্রন্থে 'গান-তীর্থপথে' নামীয় পরিচ্ছেদের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানে গ্রন্থকার লিখেছেন : "সম্‌টম্‌ নেই দাদা। ওসব হল ওস্তাদি অত্যাচার। আমরা ছন্দের নিয়ম মানি—কেননা সে বিশ্বজনীন, চিরন্তন—কিন্তু তালের ঐ সব, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'উৎপাৎ' মানতে পারিনে।"—ইত্যাকার আরো বিস্তর রম্যালাপের অবতারণা করেছেন তিনি। ধৈর্য ধরে সমস্তটা পড়তে পারলে, অনেকেরই প্রচুর তথ্য প্রাপ্তির অবকাশ আছে এর ভিতর,—বিশেষকরে তালিয়াৎরা তো নিঃসন্দেহে এরদ্বারা উপকৃত হবেনই।

যায়; সঙ্গীত আর কিছু নয়—সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা"—(ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ)। অন্য জায়গায়ও রবীন্দ্রনাথকে বলতে শোনা যায়:

"সঙ্গীত যখন বর্বর অবস্থায় থাকে তখন তাহাতে রাগরাগিণীর যতই অভাব থাক্, তালপ্রয়োগের খচমচ কোলাহল যথেষ্ট থাকে। সুরের অপেক্ষা সেই ঘন-ঘন সশব্দ আঘাতে অশিক্ষিত চিত্ত সহজে মাতিয়া উঠে"—(রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩শ খণ্ড, পৃ ৭১১)।

মোটের উপর 'সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের সুর ও তাল সৃজন-প্রতিভা' সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে কবিগুরুর ইত্যাকার প্রাসঙ্গিক যাবতীয় উক্তিগুলি যে প্রত্যেক জ্ঞানার্থীরই পক্ষে অ ত অবশ্য অনুসন্ধেয় এবং পঠনীয় বিষয় তা বলাই বাহুল্য।

আর একটি কথা,—যেমন য়ুরোপীয় গান তেমনি সেইটের তাল-প্রয়োগ-বিধিটিও রবীন্দ্রনাথকে প্রথম জীবনে অনুপ্রাণিত করেছিল। আমাদের দেশীয় গানের তালের সঙ্গে তুলনা করে এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেনও: "য়ুরোপীয় গানে স্বয়ং রচয়িতার ইচ্ছা-মত মাঝে মাঝে তালে ঢিল পড়ে এবং প্রত্যেকবারেই সমের কাছে গানকে আপন তালের হিসাব-নিকাশ করিয়া হাঁফ ছাড়িতে হয় না। কেননা, সমস্ত সঙ্গীতের প্রয়োজন বুঝিয়া রচয়িতা নিজে তার সীমানা বাঁধিয়া দেন, কেনো মধ্যস্থ আসিয়া রাতারাতি সেটাকে বদল করিতে পারে না। ইহাতেই সুরে তালে রেষারেষি বন্ধ হইয়া যায়। য়ুরোপীয়সঙ্গীতে তালের বোলটা মৃদঙ্গের মধ্যে নাই, তা হার্মনিবিভাগে গানের অন্তরঙ্গরূপেই একাসনে বিরাজ করে। লাঠিয়ালের হাতে রাজদণ্ড দিলেও সে তাহা লইয়া লাঠিয়ালি করিতে চায়, কেননা রাজত্ব করা তার প্রকৃতিগত নয়। তাই [আমাদের] ওস্তাদদের হাতে সঙ্গীত সুরতালের কৌশল হইয়া উঠে। এই কৌশলই কলার শত্রু"—(সঙ্গীতের মুক্তি)।

তাল-বিষয়ক কবিগুরুর এতাদৃশ তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি ও চিন্তাধারা অনুধাবনের পর মনের মধ্যে এই জিজ্ঞাসা জাগে: সুরস্রষ্টা কবিগুরু যে উক্ত আদর্শ রক্ষায় যত্নবান থেকে স্বরচিত গানেতেও সাবলীল ভঙ্গিমায় বিদেশীয় তালপদ্ধতির অন্তঃস্থ মাধুর্য প্রয়োজনবোধে আরোপ করেন নি--সে-রকমের ধারণাই বা আমরা পাই কোথা থেকে? বস্তুত এসব নিয়ে বিচারে বসবার আগে আমাদেরই তো দেখা এবং বোঝা উচিত, বিদেশীয় তালাদি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কতটুকু! শুনতে হয়তো অপ্রিয় মনে হবে—তবু সত্যের খাতিরে বলা দরকার,—আমরা যে অনেক কিছু জানিই না—সে বোধটাই তো নেই আমাদের অনেকের। তাইজন্যে প্রায়শঃ দেখা যায়,—নিজেদের দেশীয় জানা মুষ্টিমেয় তালের রীতিনীতির সঙ্গে যদি রবীন্দ্রনাথের গানের তালের রীতিনীতি কখন-সখন নাও মেলে, আমাদের অনেকের মধ্যে তক্ষুনি যেন আশ্চর্য রকমের চিত্তবিকার ঘটে,—আমরা তার কারণ তলিয়ে দেখার চেষ্টা না করে অতি সহজে ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। কিন্তু এমনতর অসহিষ্ণুতা-প্রদর্শন কোনো শিল্পসাধকের পক্ষে আদৌ সমুচিত হয় কি না, তাও তো অবশ্যবিচার্য!

সুতরাং রবীন্দ্রসুরে ব্যবহৃত তালপদ্ধতি নিয়ে সুস্থ ও ব্যাপক আলোচনা করতে হলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই ইত্যাকার মৌলিক যুক্তিপূর্ণ আরো অফুরন্ত প্রাসঙ্গিক উক্তিগুলি স্বেচ্ছায় খুঁজে নিয়ে বিশেষ নিষ্ঠা ও মনোযোগ সহকারে বারংবার পড়া দরকার,—পড়ে মূল বিষয়-বস্তু সারাক্ষণ মনে রেখে কবির বক্তব্যের সব তাৎপর্য নিজবুদ্ধি দিয়েই বের করতে হবে প্রত্যেককে। তা'নৈলে রবীন্দ্রনাথের গানে তাল-প্রয়োগের বাস্তব শিল্পবোধ ও রসবোধটুকু কিন্তু জিজ্ঞাসুদের অন্তরে বরাবরের মতই অস্পষ্ট এবং গোলমেলে থেকে যাবার সম্ভাবনা। এবং সঙ্গে সঙ্গে এও মনে রাখা দরকার যে,—অন্যের মাধ্যমে কবির এ সম্বন্ধীয় চিন্তাধারার নির্ভুল interpretation প্রত্যাশা করা-ও অনুচিত। এটা বললাম বিশেষকরে এই জন্যে যে, গানে তাল-প্রয়োগের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যে মামুলীপ্রথার উপরেই অনেক রকমের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন বলে আমরা মাঝে-মধ্যে অনুভব করি—এবং এ-নিয়ে কথা কাটাকাটি করে বিভ্রান্ত হই—সেটা নিষ্পত্তির পথ যদি অন্তত তাঁর গানের স্বরলিপিগুলির মধ্যেও কোনো প্রকারে চিহ্নিত হয়ে থাকত তাহলে কি আর তথাকথিত গোলমাল ও ভুল বোঝাবুঝির কারণ ঘটবার সুযোগ মিলত এমনি করে?—নিশ্চয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বরলিপিকারেরা, উক্ত কাজের যোগ্য interpreter হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের এতৎসম্পর্কীয় বক্তব্যগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরতে শৈথিল্য দেখিয়েছেন বেশ কিছু অর্থাৎ স্বরলিপির মাধ্যমে কবির স্বকীয়তা-মণ্ডিত বৈশিষ্ট্যটুকু যথাযথভাবে বুঝিয়ে না দেওয়াতে উপরে বর্ণিত অস্পষ্টতা এবং গোলমালকে আরো ঘনীভূত করে তুলেছেন তাঁরাই;—এই মন্তব্য এই বিশেষ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে করা যেতে পারে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপিকারেরা তাল-শাস্ত্রের বচন শিরোধার্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের বহু গানের সুরকে কোনো কোনো জায়গায় লম্বা করে টেনে নিয়ে কিংবা ছোটো করে নিয়ে তবলার নিয়মে মিলিয়েছেন,—শাস্ত্রানুগত করেছেন বিশুদ্ধ আকারে।* কিন্তু এর কি খুব দরকার ছিল? কারণ, কবিগুরুর মূল-গীতরূপ যে উক্ত 'বিশুদ্ধআকারে'র তোয়াক্কা রাখে না—সে কথাও তো কাগজে কলমে অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত হয়ে আছে (তা আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে পরে যথাস্থলে দেখতে পাব)। তবে জেনে রাখা ভালো, যে, তালের এই বিশুদ্ধ আকার দেবার জন্যে এতদ্‌নিয়োজিত লিপিকারদের কোনো দোষ দেওয়া যায় না—এটা করেছেন তাঁরা নিরুপায় হয়েই, কেননা তাঁরা যে শাস্ত্রের নিগড়ে বাঁধা;—স্বরলিপি করার চিরাচরিত নিয়মটিই পালন করেছেন তাঁরা। অথচ এটা না করলেও চলত।

---

* শান্তিনিকেতনে পাঠ্যাবস্থায় আমি নিজে একদা বিশেষতঃ এই বিষয়ে পূজনীয় গুরুদেবের কাছে যে প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে চরিতার্থ হয়েছিলাম তার বিশদ বর্ণনা আছে ১৯৬৮ সালের 'সুরছন্দা' জুলাই ও আগষ্ট সংখ্যায়।

কবিগুরুর "গানে সর্বত্রই যে তালের সম ও ফাঁক দেখাবার প্রয়োজন আছে, তাও নয়" —(রবীন্দ্রসংগীত-I, পৃ ১৮৯)। ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীও এই প্রসঙ্গে কোনো এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন : "অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে যার সুর এমন ঢালা যে প্রচলিত পদ্ধতির নির্দিষ্ট তালে তাকে বাঁধতে গেলে তার সৌন্দর্য রক্ষা করা যায় না। অথচ স্বরলিপি করতে গেলে সুরকে মাত্রায় বাঁধতেই হবে"—(স্বরবিতান-২১)।

অন্যদিকে কার্যত-ও দেখা যায়, সুর তাল মেনে নিখুঁত ভাবে যে-গানের স্বরলিপি করা হয়েছে—সে-গানটি অবিকল ঐ সুরে-তালে-আবদ্ধ নিয়মানুযায়ী পরিবেশন করলে পরে 'তা ঠিক রবীন্দ্রসঙ্গীত হলো না'—এমনতর মন্তব্যেরও সম্মুখীন হয়ে বহু নিপুণ গায়ক গায়িকাদের লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হতে হয় !! সুতরাং রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাল পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বস্তুতপক্ষে উপরে বর্ণিত অল্পবিস্তর পরস্পরবিরোধী অভিমতগুলির সারমর্ম অনুধাবন করা, সকল শ্রেণীর গীতার্থীদের পক্ষে সকল সময়ে খুব সহজসাধ্য কাজ বলে ধরে নেওয়া যে ঠিক নয়—এবিষয়টা প্রত্যেকেব দরদ দিয়ে বোঝা উচিত। তাছাডা আমরা জেনে আসছি,—ববীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের অনেক গানই রচিত হয়েছিল খাঁটি স্ব-দেশীয় শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের নিয়মকানুনেব আওতায়, কিন্তু পরবর্তী জীবনের রচিত গানে কবি এসব ব্যাপারে ছিলেন সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। এ অভিমতটিও আবার কখন-সখন গোলমালের অন্যতম হেতু হয়ে দাঁড়ায়—যদি না কবিগুরুর ঐ নিস্পৃহতাকে আমরা সম্যকরূপে উপলব্ধি করবার যথোচিত শিক্ষালাভ করি। আর বিশেষত উক্ত শিক্ষালাভে উদ্যোগী হবার উদ্দেশ্যেই—সংশ্লিষ্ট নিষ্ঠাবান শিক্ষার্থী এবং আলোচকদের প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ,—কেবলমাত্র স্বরলিপি নির্দেশিত তালাংক সমূহের উপর নিভর না করে কবিগুরুর স্বরচিত প্রাসঙ্গিক যাবতীয় বক্তব্যগুলি (বিশেষত তাঁব 'ছন্দ' নামীয় গ্রন্থটি) সংগ্রহ করে নিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়বার এবং বোঝবার চেষ্টা যেন তাঁরা অবশ্যই করেন। যদি এই অনুরোধ কোনক্রমে রক্ষিত হয় তা'হলে আলোচ্য বিষয়ে আসল বৈষম্যটুকু বুঝবার অবকাশ তাঁরা নিশ্চয় পাবেন এবং পরে আবশ্যকবোধে নিজেদেরও পারবেন ঠিক পথে চালাতে। কিন্তু তবু—স্বরলিপিতে তাল বিষয়ক উল্লেখিত যাবতীয় সাংকেতিক চিহ্নাদি ব্যবহারেব কাজটিও যথানিয়মে আয়ত্ত করে রাখা প্রত্যেক গীতশিক্ষার্থীর পক্ষে অতি অবশ্য বিধেয়। কারণ,—রবীন্দ্রনাথ আজ পরলোকে ;—তাঁর গানের মধ্যে কীভাবে কোন রীতিতে যে তিনি তাল প্রয়োগ করতেন, তা যখন হাতে-কলমে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবার কোনো উপায় কারুরই আর এখন নেই, একমাত্র ঐ স্বরলিপিকারদের কৃত স্বরলিপির উপর নিভর করা ছাড়া। অবশ্য এর বিচারে গ্রামোফোন কোম্পানী-কর্তৃক নির্মিত কবিকণ্ঠের রেকর্ড কয়টি প্রচুর সহায়ক হতে পারে, —কিন্তু সেও তো সংখ্যায় নগণ্য !

রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপিগুলির সাহায্যেই প্রায়শঃ চেনা যায় যে, কবিগুরু তাঁর গানগুলিকে মোটামুটি তিন প্রকার ছন্দে বিভক্ত করেছেন [এই প্রসঙ্গে তাঁর নিজ উক্তি :

"ছন্দকে মোটের উপর তিন জাতে ভাগ করা যায়। সমচলনের ছন্দ, অসমচলনের ছন্দ এবং বিষমচলনের ছন্দ। দুই মাত্রার চলনকে বলি সমমাত্রায় চলন, তিন মাত্রার চলনকে বলি অসমমাত্রার চলন এবং দুই-তিনের মিলিত-মাত্রার চলনকে বলি বিষমমাত্রার ছন্দ" (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪শ খণ্ড, পৃ ১৫৮)]।

(১) **সমচলনের ছন্দ :** যেমন, চতুর্মাত্রিক (দুইয়ের কদম) :

এ'কে সমমাত্রিক ছন্দও বলা চলে। যথা,—

I ধ র | নী র I গ গ | নে র I মি ল | নে র I ছ ন্ | দে ০ I

(২) **অসমচলনের ছন্দ :** যেমন, ষাণ্মাত্রিক (তিনের কদম) :

এ'কে অসমমাত্রিক ছন্দও বলা যায়। যথা,—

| ত পে র | তা পে র ¦ বাঁ ধ ন | কা টু ক ¦

(৩) **বিষমচলনের ছন্দ :** যেমন, পঞ্চমাত্রিক (দুই-তিনের বা তিন-দুয়ের কদম) :

একে বিষমমাত্রিক ছন্দও বলা হয়। দুই-তিনেব কদম, যথা,—

I স্মৃ তি | র ছ বি I মি লা | বে য বে I
I পে য়ে | ছি ছু টি I বি দা | য় দে হ I

আবার এ'কেই তিন-দুয়ের কদমে ব্যবহার করা যায় ;—রবীন্দ্রনাথই করেছেন, যথা,—

I পে য়ে ছি । ছু টি I বি দা য় ¦ দে হ I

এ-ছাড়া সপ্তমাত্রিক (তিন-চারের মিশেল কদম) প্রভৃতিকেও বিষমচলন-ছন্দেব অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যথা,—

I হে রো গো | অ ন্ | ত রে I অ রূ প | সু ন্ ¦ দ রে I
I খাঁ চা র | পা খি | ছি ল I সো না র | খাঁ চা ¦ টি তে I

বিশেষতঃ এই 'বিষমচলনের ছন্দ'টিকে নানা প্রকারে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, কখন সখন মাত্রাদির সংখ্যা আরো বাড়িয়ে ক্রমশঃ বিষম করে তোলা যায় বলেই এর আর অধিক দৃষ্টান্ত দিতে আপাততঃ বিরত হলাম,—যদিও দেওয়া চলে যথেষ্ট—আমরা তা আরো গভীরে প্রবেশ করলেই দেখতে পাব।

এবার ফিরে আসি মূল বক্তব্যে।

কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ছন্দের রাজা ; কবিতার ছন্দ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গান-রচনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন তিনি। গানে তালের গতিপ্রকৃতি রক্ষার জন্যে সঙ্গীতশাস্ত্রে যে-সব বাঁধা নিয়মকানুন আছে, যা থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিও গায়নসমাজে স্বীকৃতি পায় না—এটা রবীন্দ্রনাথ বেশ ভাল করে জানতেন এবং বুঝতেন বলেই—এই গতানুগতিক ব্যবস্থার উপর যে আবশ্যক মত কোনো পরিবর্তনই

ঘটানো যেতে পারে না—একথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাই 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধে তাঁকে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে আমরা শুনি :

"অনেকদিন হইতেই কবিতা লিখিতেছি, এই জন্য, যতই বিনয় করি না কেন, এটুকু না বলিয়া পারি না যে—ছন্দের তত্ত্ব কিছু-কিছু বুঝি।"

আর বস্তুতপক্ষে সেই ছন্দের বোধ নিয়েই তো তিনি তাঁর স্বাধীন চিন্তার অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিলেন তাঁর গান-রচনার ক্ষেত্রে। গান লিখতে লিখতে বললেন :

"কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে-নিয়মে কবিতায় চলে, তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে।"

এমনি করেই তাঁর কবিতায় নূতন নূতন ছন্দ প্রকাশ পেল,- পাঠকেরা পড়লেন—খুশি হলেন, সেই সময়ে কেউ কিছু আপত্তি করলেন না। অথচ গানের বেলায় যখন সেই ছন্দকেই সুরের মাধ্যমে ব্যবহার করলেন তিনি,—কবি বলছেন : "তখন দেখি যাঁরা কাব্যের বৈঠকে দিব্য খুশি ছিলেন তাঁরাই গানের বৈঠকে রক্তচক্ষু।"

অর্থাৎ রক্তচক্ষুধারকদের অভিমত, কবিতায় এ-ছন্দ চললেও চলতে পারে; কিন্তু এতে সুরারোপ করে গান তৈরীর কাজ অশাস্ত্রীয়। এর সহজ ব্যাখ্যা হল এই যে—কবির এ-কাজটিকে ওস্তাদ গায়কসম্প্রদায় উদারচিত্তে মেনে নিতে পারলেন না—তাঁদের প্রচলিত তাল এর সঙ্গে মেলে না বলেই। ওঁরা কবির রচনার একটা দৃষ্টান্ত টেনে বললেন-ও : "ছন্দের এক অংশে সাত আর-এক অংশে চার, ইহাতে কিছুতেই তাল মেলে না"।

কিন্তু কবি এতে নিরস্ত না হয়ে তাঁর ঐ নূতন স্বকীয় পদ্ধতিতেই গান-রচনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। স্বভাবত, তাঁর এমনতর সৃষ্টির প্রতি, রক্ষণশীলদের বিরক্তি প্রকাশ পেল। তখন কবি স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ ভাষায় জানালেন : "তাল যদি না মেলে সেটা তালেরই দোষ। ছন্দটাতে দোষ হয় নাই"—ইত্যাকার আরো অনেক সারগর্ভ মৌলিক কথা বললেন তিনি। সেই সকল বক্তব্যের পূর্ণরস আস্বাদনের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'সঙ্গীতের মুক্তি' নামীয় প্রবন্ধটির প্রতি কৌতূহলী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অবশ্য এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের গোড়াতে রবীন্দ্রনাথ এও বলে রেখেছিলেন :

"তাল জিনিসটা সঙ্গীতের হিসাব-বিভাগ। এর দরকার খুবই বেশি সে-কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দরকারের চেয়েও কড়াক্কড়িটা যখন বড়ো হয় তখন দরকারটাই মাটি হইতে থাকে।"

এখানে 'কড়াক্কড়ি' শব্দটি, রবীন্দ্রনাথ যে কোন অর্থে ব্যবহার করেছেন তাও অনুধাবনের জন্য তাঁর মূল লেখাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় রাখা জিজ্ঞাসুদের একান্ত প্রয়োজন।

মোটের উপর কত রকমের ছন্দ নিয়ে যে রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন এবং গানের তালের মধ্যেও এর সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে শুধু তাঁরই অতুলনীয় প্রতিভার দীপ্তিতে,—এ বিষয়টা, তাঁর সব রকমের গান তন্ন তন্ন করে অনুশীলন না করলে কেবল

অন্যের মুখের বক্তৃতার দ্বারা কারুর বুঝে নেওয়া বেশ শক্ত। তবে সাধারণত দেখা যায় প্রচলিত তালগুলি, যথা—দাদরা, কার্ফা, ত্রিতাল, তেওরা, ঝাঁপতাল, সুরফাঁকতাল, চৌতাল ধামার প্রভৃতি তাঁর গানে পর্যাপ্ত ভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনও তবলা কিংবা পাখোয়াজের চর্চা করেছিলেন বলে জানা যায় না। কিন্তু তাহলেও স্বদেশী-বিদেশী বহু ধরনের শিক্ষিত বাদকদের বহুধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতে দেখেছেন তিনি, রসিক মন নিয়ে শুনেছেন তাঁদের বাজনা। কাজেই নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উক্ত বাদ্যযন্ত্রাদি ব্যবহারের গুণাগুণ সম্পর্কে একটা নিজস্ব সুরুচিপূর্ণ ধারণাও গড়ে তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল—সেটা আমরা সহজেই ধরে নিতে পারি।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের রাগ বা সুর-সৃজনী-শক্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী ১৩৬০ সালে তাঁর 'গানের স্মৃতি'তে একবার বলেছিলেন: "রাগ তিনি [রবীন্দ্রনাথ] খুব ভালো জানতেন বলেই তাব মিশ্রণে ওস্তাদ ছিলেন"—(বৈতানিক-প্রকাশিত-'স্মৃতিকথা')। ঠিক ঐ একই উক্তির প্রেক্ষণে সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের তাল-সৃজন-শক্তির আলোচনাক্ষেত্রেও অনায়াসে মন্তব্য করা যায়,—শুধুমাত্র এক নিজের দেশের নয়—আরো বহু ভিন্ন ভিন্ন দেশের সঙ্গীতের এমনকি নৃত্যেরও তালতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল করে জানা ছিল বলেই—এরও মিশ্রণে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। আবাব "ন রাগস্য ন তালস্য অন্তঃ কুত্রাপি বিদ্যতে"—এই সুপ্রাচীন সংস্কৃতবাণীটি নিশ্চয় অনেকে জানেন এবং বোঝেন এর অর্থও। এই বাণীরই সূত্র ধরে আমরা যদি সিদ্ধান্ত নিই—নূতন নূতন রাগ-তাল সৃষ্টি করার অধিকার তো স্বয়ং বিধাতাই দিয়েছেন সকলকে,—তাহ্‌লে বিশ্ববন্দিত সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাধরেরা কি এ-থেকে বাদ যেতে পারেন! এই কথাটা প্রসঙ্গত চিন্তা করা আমাদের খুবই দরকার। সর্বোপরি এই সত্যটি তো সর্বদেশ সর্বলোকবিদিত যে, কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিপুল মহিমময় প্রতিভানিষ্যন্দ ওস্তাদিয়ানার ভিতর দিয়ে গানের জগতে নূতন বিস্ময়কর অনেক কিছুরই প্রবর্তন করে গেছেন। সে-সব যথানিয়মে অনুশীলন করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানবার বা বুঝবার আমাদের দেশের অনেক গীতবিদ্‌দের এখনও ঢের ঢের সময় বাকী।—এইটে আমার নিছক গুরুভক্তির উচ্ছ্বাস নয়;—এর মূল হেতু নিয়েও যা সামান্য বিশ্লেষণের চেষ্টা নিয়েছি বর্তমান রচনারই পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে—তার প্রতি সুশীল পাঠকরা যদি অনুগ্রহ করে মনোযোগী হন, তাহলে বুঝতে পারবেন আমার মন্তব্যটি কিন্তু এ-জায়গায় অনেকখানিই সমূলক।

তাছাড়া বস্তুত এ-তথ্যও তো কারো অজানা নেই যে, কয়েকটি নূতন তালের প্রবর্তন করেন রবীন্দ্রনাথ। সেই তালগুলির নাম:

ঝম্পক, ষষ্ঠী, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী ও নবপঞ্চ।

আমরা দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত এই নূতন তাল কয়টির ঠেকা কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে প্রকাশ করেছেন। এখানে আবশ্যক-

বোধে ঠেকাগুলির নকল উদ্ধৃত হল। পাঠকেরা লক্ষ্য রাখবেন,—প্রতি তালের নামের সঙ্গেই থাকবে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যথা—মাত্রাসমষ্টি, মাত্রাবিভাগ। এই মাত্রাবিভাগের উদাহরণ দেখানো হবে চলিত রীতি অনুযায়ী কেবলমাত্র দাঁড়ি না টেনে—অঙ্কের সংখ্যা উল্লেখান্তে সংখ্যাগুলির নীচে নীচে উপযোগী রবীন্দ্রসংগীতের কথাগুলি বসিয়ে। অতঃপর থাকবে ঠেকা এবং এর প্রকাশ-সূত্র।

ঝম্পক ঃ ৫ মাত্রার সমষ্টি ॥ মাত্রা বিভাগ ৩+২

I ১ ২ ৩ | ৪ ৫ I ১ ২ ৩ | ৪ ৫ I
বি প দে মো বে র ক্ খা ক র

+ ২
ঠেকা ঃ I ধি ধি না | ধি না I

(রবীন্দ্রগীতিপ্রবাহ-১ম ভাগ)

ষষ্ঠী ঃ ৬ মাত্রাব সমষ্টি ॥ মাত্রা বিভাগ ২+৪ (কিংবা ৪+২ ?)

I ১ ২ | ৩ ৪ ৫ ৬ I ১ ২ | ৩ ৪ ৫ ৬ I
আ ০ খি ০ রে ০ ফাঁ ০ কি ০ দা ও
এ ০ কী ০ ধা ০ বা ০ ০ ০ ০ ০

+ ২
ঠেকা ঃ I ধা গে | ধা গে তে টে I

(সঙ্গীতদর্শিকা)

এই ধবনের "২-৪ মাত্রায় তালের গান রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রচুর। উত্তব-ভারতীয় সঙ্গীতে এর চলন নেই, কিন্তু দক্ষিণভারতীয় সঙ্গীতে এটি সুপ্রচলিত। সেখানে এর নাম দিয়েছে 'পত্তি তাল' বা 'রূপক তাল'। আমাদের দেশে এব কোনো নাম পাই না, গুরুদেবও এ-তালের কোনো নামকরণ করে যান নি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তিনি মধ্যজীবনে এ-তালটির ব্যবহার শুরু করেন। ২-৪ মাত্রার ছন্দকে উল্টে নিয়ে গুরুদেব 'হৃদয় আমার প্রকাশ হল' গানটিতে ব্যবহার করেছেন—

। । । । । । । । । । । ।
I হৃ দ ০ য় | আ মার্ I প্র কা ০ শ | হ ল I

অর্থাৎ এ-গানের ঝোঁক দাঁড়াচ্ছে গিয়ে চারে-দুয়ে। এর কোনো নাম পাই না।"

(রবীন্দ্রসঙ্গীত-I, পৃ ১৯৮-১৯৯)

রূপকড়া ঃ ৮ মাত্রার সমষ্টি ॥ মাত্রা বিভাগ ৩+২+৩

I ১ ২ ৩ | ৪ ৫ | ৬ ৭ ৮ I ১ ২ ৩ | ৪ ৫ | ৬ ৭ ৮ I
গ ভী র র ০ জ নী ০ না মি ল হৃ ০ দ য়ে ০

"ইহা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্ভাবিত আটমাত্রাবিশিষ্ট একটি বিষমপদী নূতন তাল।...ইহার সঙ্গৎ মৃদঙ্গ কিম্বা তবলা উভয় যন্ত্রেই চলিতে পারে। ঠেকা :

১ ২ ৩
I ধাগে তেটে তেটে | তাগে তেটে | কেটে তাগে তেটে।"

(ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি-১ম ভাগ)

নবতাল : ৯ মাত্রার সমষ্টি ॥ মাত্রা বিভাগ ৩+২+২+২

I ১ ২ ৩ | ৪ ৫ | ৬ ৭ | ৮ ৯ I
নি বি ড় ঘ ন আঁ ০ ধা রে

"এই তালে নয়টি মাত্রা আছে, এজন্য ইহার নাম 'নবতাল'। ইহাও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত একটি নূতন তাল। ইহার ঠেকা মৃদঙ্গবাদকগণের ইচ্ছাধীন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঠেকার বোল নিয়ে দেওয়া হইল। যথা—

১ ২ ৩ ৪
I ধা দে স্তা | তেটে কতা | গদি ঘেনে ' ধাগে তেটে I"

(ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি-১ম ভাগ)

একাদশী : ১১ মাত্রার সমষ্টি ॥ মাত্রা বিভাগ ৩+২+২+৪

I ১ ২ ৩ | ৪ ৫ | ৬ ৭ | ৮ ৯ ১০ ১১ I
দু য়া রে দা ও মো রে রা ০ খি য়া

"ইহা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্ভাবিত একটি নূতন তাল। ইহাতে এগারটি মাত্রা আছে; এইজন্য ইহার নাম 'একাদশী'। মৃদঙ্গবাদকগণ তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে এই তালের ঠেকা গঠন করিয়া লইতে পারেন। ঠেকা যথা—

১ ২ ৩ ৪
I ধা দে স্তা | তেটে কতা | গদি ঘেনে | ধাগে ঘেটে তাগে তেটে I"

(ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি-১ম ভাগ)

রবীন্দ্রনাথের আরেকটি গানকে ১১ মাত্রার তালে স্বরলিপিবদ্ধ করেছেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এর মাত্রা বিভাগ হল অন্যরকম ৩+৪+৪; গানের উদাহরণ :

I ১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬ ৭ | ৮ ৯ ১০ ১১ I
কাঁ পি ছে দে হ ল তা থ র থ র

(গীতপঞ্চাশিকা ১৩৪২ সালের সংস্করণ)

কিন্তু, স্বরলিপিগ্রন্থে এই ছন্দরূপে আবদ্ধ তালটির কোনো নামোল্লেখ নেই, ঠেকা-ও দেওয়া হয় নি।

নবপঞ্চ তাল : ১৮ মাত্রার সমষ্টি ॥ মাত্রা বিভাগ ২+৪+৪+৪+৪

I ১ ২ | ৩ ৪ ৫ ৬ | ৭ ৮ ৯ ১০ | ১১ ১২ ১৩ ১৪ | ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ I
জ ন নী ০ তো মা ০ র ক রু ণ চ র ণ খা ০ ০ নি

ঠেকা : (+) I ধা গে | (২) ধা গে দেন্ তা । (৩) কৎ তাগে দেন্ তা |
(৪) তেটে ধা দেন্ তা | (৫) তেটে কতা গদি ঘেনে I

(রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধনা)

কেউ বলেন উপরে বর্ণিত তালগুলি রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক উদ্ভাবিত, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন—সৃষ্টি করেছেন ; আবার অন্যের অভিমত,—এই ছন্দগুলি রবীন্দ্রনাথের নূতন সৃষ্টি বলা নাকি ঠিক নয়—ইত্যাকাব বিতর্কেব মধ্যে না যাবার জন্যেই এখানে কিন্তু শুরুতে রবীন্দ্রনাথকে ঝম্পক, ষষ্ঠী, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী ও নবপঞ্চ নামীয় এই ছয়টি তালের নব প্রবর্তক বলা হয়েছে।

অধুনা আবার অনেকের মতে শোনা যায়,—এইগুলির মধ্যে কয়েকটি তালের ছন্দ বা মাত্রা বিভাগ নাকি দক্ষিণভারতের কর্ণাটিসঙ্গীতের কোনো কোনো তালের ছন্দ বা মাত্রাবিভাগের সঙ্গে মিলে। তা মিলুক—আপত্তি কি! এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, রবীন্দ্রনাথ সে-দেশ থেকে এসবের পাঠ নিয়ে এসে নিজের গানেতে তা নকলনবিসের মত আরোপ করেছেন ; এমন মন্তব্য কেউ প্রকাশও করেন নি। তবে যদি আমরা ভাবি, কর্ণাটি রাগরাগিণীর অনুকরণে তাঁর তো অনেকগুলি গানই পাওয়া যায় এবং সেগুলি দস্তুরমত কণাটিসঙ্গীত ভেঙ্গেই রচিত হয়েছে ;—তাহলেও এই প্রসঙ্গে নিষ্ঠামগ্ন গবেষকদের কাছে বলবাব এবং জানাবার আছে অনেক।

কর্ণাটিসঙ্গীত হল দক্ষিণভারতের। এবং সেই দক্ষিণভারতীয় সঙ্গীতে ছন্দোবৈচিত্র্য যে কী বিস্ময়কর তা স্বচক্ষে স্বকর্ণে প্রত্যক্ষ না করলে বোঝা যায় না। পাঠকেরা যদি এ বিষয়ে স্বকীয় ধারণায় কিছুটা উপনীত হতে পারেন সেই ভরসায় এখানে একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনার উদ্ধৃতি দিচ্ছি, আমি নিজেও তা এমনিতর পরিস্থিতিতে এককালে অনেকটা প্রত্যক্ষ করেছিলাম বলেই আরো : "কত যে বিরক্তিকর হতে পারে এ তালের গাণিতিক পালোয়ানি তার সবচেয়ে জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত মেলে বোধহয় কর্ণাটিসঙ্গীতে—'পল্লবী' মল্লযুদ্ধে। পল্লবীসঙ্গীত হচ্ছে সার্গম—নানা তালের তালঠোকার সাথে। আবেশ সৌন্দর্য সুষমা এসবের বালাই পল্লবীতে একেবারেই নেই,—আছে শুধু তাল, আর তাল, আর তাল—আঙুলে মাত্রা 'গুণে, হাত চিৎ করে, হাত উপুড় করে—কত রকম কসরৎ যে তাদের! অতি কষ্টে সে-সব তালের পালোয়ানি কাণ্ড দেখতে ও শুনতে হয়েছিল মহীশূরে,

বাঙ্গালোরে ও মাদ্রাজে"—(দিলীপকুমার রায় প্রণীত 'গীতশ্রী'—তালছন্দ অধ্যায়)। এ বর্ণনাটুকু দেবার আরেক উদ্দেশ্য এই,—রবীন্দ্রনাথ কর্ণাটিসঙ্গীত ভেঙ্গে গান রচনা করেছেন তা ঠিক, কিন্তু কেউ কি কখনো কল্পনা করতে পারেন—উপরোক্ত বর্ণনা মতে ছন্দের বৈচিত্র্য দেখিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশিত হচ্ছে আমাদের বাঙালী গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে ?—বোধ করি না। কাজেই রবীন্দ্রসঙ্গীতে ছন্দোবৈচিত্র্য যে কর্ণাটিসঙ্গীতের হুবহু অনুরূপ নয়—এটাও নিঃসন্দেহে মেনে নেওয়া যেতে পারে। এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন : "[গুরুদেবের] যে-গানগুলি কর্ণাটিসঙ্গীত ভেঙেই রচিত—সে গানের একটিতেও ছন্দোবৈচিত্র্য দেখি না, উপরে উল্লিখিত তালের মতো। হয়তো তাঁর গানের তালবৈচিত্র্যে এই প্রবর্তনা এসেছিল কবিতার ছন্দোবৈচিত্র্যের সাফল্যের উৎসাহ থেকে"—(রবীন্দ্রসঙ্গীত-I, পৃ ১৯৯)। সুতরাং এত সব দেখেশুনে আমরা এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারি যে, বাংলা গানে ছন্দোগ্রন্থনায় এমনধারা অভিনবত্বটি রবীন্দ্রনাথের তাল-সৃজনী প্রতিভারই অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে তালসঙ্গত প্রসঙ্গে কি অভিমত পোষণ করতেন সে নিয়ে নূতনভাবে আপাতত কিছু বলছি না। কারণ, এই গ্রন্থেরই বিভিন্ন জায়গায় কবিগুরুর একাধিক প্রাসঙ্গিক উক্তি যা উদ্ধৃত হয়েছে তা যদি পাঠকেরা মন দিয়ে পড়েন এবং গ্রামোফোন-রেকর্ডে ধৃত স্বয়ং কবিকণ্ঠের গানগুলি যদি কখন-সখন শোনেন, তাহলে আমার বিশ্বাস,—এবিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সেগুলিই হবে তাঁদের অধিকতর সহায়ক। তবে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভিতর বিচিত্র তালের বহিরূপ প্রকাশে যে-সব গীতার্থীরা একান্ত আগ্রহী তাঁদের প্রসঙ্গত অনুরোধ করি,—তবলা, মৃদঙ্গ, খোল, খঞ্জনী নামীয় বহুবিধ তাল-বাদ্যযন্ত্র যা আছে সেগুলির ব্যবহার যেন তাঁরা অবশ্য শিখে নেন। তাঁরা সব সময় মনে রাখবেন,—তালযন্ত্র ব্যবহারের রীতিনীতি না-শিখে শুধু মুখে-মুখে তালের কতকগুলি নাম এবং এদের ঠেকা বা বোল (যার কিঞ্চিৎ নমুনা এই নিবন্ধেরই ৫৭ থেকে ৬০ এবং ৬৯ থেকে ৭১ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে, তা' পড়ে) মুখস্থ করতে পারলেই তাল-শেখার কাজ কখনো সম্পন্ন হয় না। বরং অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, এই রীতি অবলম্বনে তাল-শেখা তো দূরের কথা, অনেক গীতার্থীর পক্ষে তালের বোল বা ঠেকার রস উপলব্ধি করাই হয় কষ্টকর—যার পরিণতিতে হিতে-বিপরীতেরও আশংকা থাকে বেশ। এই অবস্থায়, অর্থাৎ গীতার্থী নিজেরা যদি তালযন্ত্র যথাযথ নিয়মে ব্যবহার করতে না-শেখেন (বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু অনেকেই শেখেন না—বিশেষকরে মেয়ে শিক্ষার্থীরা), তাঁদের উচিত গান-শেখবার একেবারে শুরু থেকে মাত্রা-বোধ লাভের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া। কিন্তু গীতার্থী স্বভাবচাঞ্চল্যের দ্বারা পীড়িত থাকলে তদুপরি গাণিতিক বোধটিও যদি তাঁর অস্পষ্ট হয়, তথা পাকা না থাকে—তবে তো একাজে অগ্রসর হওয়াই তাঁর পক্ষে এক মহা বিড়ম্বনা!

রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাল-সঙ্গত

অথচ তালের বহিরূপ প্রকাশে উৎসাহী ও আগ্রহী হলে, তালের এই প্রাথমিক পাঠ নিতেই হবে প্রত্যেক গীতার্থীকে। মোটের উপর তাল-অধ্যায় অনুশীলন আর নির্ভুল অঙ্ক গণনার কাজ যখন প্রায় একই শ্রেণীর, তখন তাল-অধ্যয়নকারীদের স্বভাবকে শান্ত ও মনকে সংযত না করে উপায়ই বা কি ; তাছাড়া মাত্রাবোধ স্পষ্ট ও নির্ভুল রীতিতে আয়ত্ত করতে না-পারলে—তালবোধ কোনোকালেই কারো আয়ত্তে আসতে পারে না এ-কথাও যে ধ্রুব। আবার মাত্রাবোধটি সম্পূর্ণ আয়ত্তে এসে গেলে—তালযন্ত্রেরও যে খুব একটা দরকার পড়ে তা নয়,—গীতার্থী তখন নিজের আঙুলেই কিংবা প্রতিভাবান হলে স্বাভাবিকভাবে আপন মনেতেই মাত্রা গুণে-গুণে গানেব তাল ঠিক রাখতে পারেন। তবে এই মাত্রাগণনার কাজকে সরস রঙিন প্রসাধনে সাজিয়ে সুষম করে বাইরে ফুটিয়ে তুলবার ইচ্ছা হলে যে এই সঙ্গে সঙ্গতকার হিসাবে তালযন্ত্রের এবং তালযন্ত্র-বাদকের উপস্থিতিও একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে—সে কথা তো বলাই বাহুল্য। এরই প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতে তালসঙ্গতকারদের উদ্দেশে যৎসামান্য লেখা হয়ত এখানে অসঙ্গত হবে না।

কোনো সুরধ্বনি কানে আসা মাত্র তাব ভিতরকার ছন্দ-তালকে খোঁজা এবং এদেরে বাইরে নিয়ে এসে বিবিধ অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর করে তোলা বোধকরি তাল-প্রেমীদের এক সহজাত আনন্দময় ধর্ম। হাতের কাছে তালযন্ত্র পেলে, যদি তাঁরা প্রতিভাধর হন তাহলে উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে কিংবা না-পেয়েও নিপুণ বাদ্যকরও হয়ে ওঠেন অনেক সময়। বাদ্যকর হতে পারলেই যে তাঁরা সঙ্গতকাব হিসাবেও সুনিপুণ হয়ে উঠবেন এমনটা জোর দিয়ে বলা অসম্ভব। অথচ উপরোক্ত ধর্মের প্রাবল্যে এঁদের মধ্যে অনেককে আবার তালযন্ত্র যেন-তেন ভাবে যে-কোনো গানের সঙ্গে বাজিয়ে যেতে শোনা যায় প্রায়ই। চিরাচরিত অভ্যস্ততার দরুন এমনতর বাজনার ভিতরকার ত্রুটিবিচ্যুতি অনেক সময় অনেকের নজরে আসে না, বোধকরি নজরে আনবার চেষ্টাই করেন না কেউ। যেমন,—বেসুরো হারমোনিয়মের সঙ্গে নির্বিবাদে গান করতে ও শুনতে আমরা বহুজনে নিত্য অভ্যস্ত, কোনো যুক্তিতেই আমরা ভাবতে চাই না যে, বেসুরো যন্ত্রের বেসুরো আওয়াজ পদে পদে গানের গতি ও রূপকে কী নিদারুণ বিকারগ্রস্থ করে তোলে ; আবার দৈবাৎ কোনো মুহূর্তে এই ত্রুটি অনুভব করতে পারলেও আমরা বেসুরো হারমোনিয়মটাকে কিন্তু সহজে ত্যাগ করি না। ঠিক তেমনি—গানের সঙ্গে যেন-তেন-প্রকারেণ তালবাদ্য-সঙ্গতটাও যখন বহুক্ষেত্রে মায়া-মমতাহীন উৎপাতের মত চলতে থাকে, আমরা তা গত্যন্তর অবস্থায় সহ্য করি। তখন ফের মনকে এই বলে চোখঠার দিতে হয়, যে,—গান তো একেবারে ন্যাড়া শোনাচ্ছে না—ভালো হোক কিংবা মন্দ হোক এর সাথে একটানা একটা সঙ্গত তো আছেই ;—অতএব এ থেকেই আনন্দ উপভোগ করা যাক !! অথচ আনন্দ উপভোগ করবার এই মনোভাব যে কত ক্ষতিকর এবং হাস্যকর অবোধের সান্ত্বনা—সেটা আমরা কেউ

ঘুণাক্ষরেও ভাবি নে। ভাবলে এই রীতিটা আমাদের গীত-সমাজে অনেককাল আগেই অচল হয়ে যেত এবং এর ফলে গানের শৈল্পিক মানও বাড়তো হয়তো আরো। যাই হোক আপাততঃ এই আপশোষের কথা বাদ দিয়ে এখানে আমাদের মানতে হবে যে, এমনধারা সঙ্গতের সাহায্যে গান পরিবেশিত হলে সে-গানের প্রকৃত রস, ভাব ও সৌন্দর্য বাড়ে কি কমে—এই নিয়ে যেমন গীতার্থীদের, তেমন তাদের সঙ্গতকারদের মধ্যে যথোচিত জ্ঞানচর্চার ও সম্মিলিত আলোচনার প্রয়োজন আছে—বিশেষকরে তাঁদের পরিবেশিত গান যদি কাব্যপ্রধান হয়—সেক্ষেত্রে তো অতি অবশ্যই।

রবীন্দ্রসঙ্গীতকে আমরা যখন সাহিত্য ও কাব্যধর্মী বলেই সর্বত্র স্বীকার করে চলি,—তখন ভেবে দেখুন,—রবীন্দ্রনাথের কবিতার মেজাজেব সঙ্গে তালেব মেজাজ খাপ খাইয়ে যন্ত্রসঙ্গত করা কি যে-কোনো সঙ্গতকারের (বিশেষত রবীন্দ্রসাহিত্য ও কাব্য অনভিজ্ঞদের) পক্ষে সহজ কাজ ? কিংবা তাঁদেরে, পূর্বাহ্নে প্রয়োজনমত শিক্ষিত না করে, অপ্রস্তুত অবস্থায় ডেকে নিয়ে সঙ্গতকারের কাজে নিয়োগ কবাটা কি আমাদেবই পক্ষে খুব যুক্তিসঙ্গত ?

এই বক্তব্যটা স্পষ্টতর করার উদ্দেশ্যে এক্ষেত্রে হিন্দুস্থানীগানের তালসঙ্গতের সঙ্গে বাংলা গানের তালসঙ্গতের সামান্য একটু তুলনা টানছি, বিশেষ করে এই ধারণা নিয়ে যে,—হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভিতর তালসঙ্গতে বিচিত্র কারুশিল্পের সঙ্গে, আমাদের গীতরসিক সম্প্রদায়ের অনেকেই হয়ত পরিচিত আছেন অল্পবিস্তর। সেখানে আমরা দেখি,—গায়কের সঙ্গে গানের তাল-সঙ্গতকার তাঁর বাজনার দক্ষতার ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেবার অবকাশ পান প্রচুর—ফলে সঙ্গতকারের বাজনার সাথে গায়কের গানও তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। গায়ক এবং সঙ্গতকার সে জায়গায় সর্বক্ষণ সমানে সমানে চলতে থাকেন। শ্রোতাদের কাছেও তাই একজন উঁচুদরের গায়কের গান-পরিবেশনের সঙ্গে একজন উঁচুদরের সঙ্গতকারের তাল-পরিবেশনটিও প্রায় সমান উপভোগ্য হয়। তার কারণ, কাব্যাংশের দিকটা হিন্দুস্থানীসঙ্গীতে শুধু সামান্য মাত্রায় নয়—যথেষ্ট মাত্রায়ই গৌণ তথা অবহেলিত বলা চলে,—সেখানে সুর ও তালের খেলা অর্থাৎ সাঙ্গীতিক টেকানক দেখাবার কাজটাই সচরাচর থাকে মুখ্য।

কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেলায় কিংবা যে-কোনো কাব্যধর্মী বাংলাগানে তো কাব্যাংশকে কোনো যুক্তিতেই গৌণ করে রাখা চলে না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকেই বলতে আমরা শুনি : "কাব্য রচনাই বাংলাগানের মুখ্য উদ্দেশ্য,—সুরসংযোগ গৌণ।" আবার গানে সুর সংযোজিত হলেই তো তার সঙ্গে সঙ্গে কোনো-না-কোনো রকমের তালছন্দ অনিবার্য ভাবেই আসবে, জানা কথা। কিন্তু এদেরে গতানুগতিক রীতিতে বাইরে প্রকাশ করতে গেলেই যে বিপদ ! তখন কনট্রোলার-অফিসকে সজাগ রাখা চাই—যাতে এ-কাজে কোনো বিদ্রোহ না জন্মায়। অর্থাৎ গানের সঙ্গে তালের ঠেকা কিংবা বোলের আধিক্য ঘটিয়ে যাতে গানের কাব্যসম্পদকে ঢেকে না-দেওয়া হয়

সেই দিকে যেমন গীতশিল্পী তেমনি তাঁর গানের তালসঙ্গতকারীকেও পূর্ণমাত্রায় সচেতন থাকতে হবে। সচেতন থাকার প্রয়োজন বিশেষ করে আরো এই জন্যে যে,—তালের ঠেকা কিংবা বোলের আধিক্যহেতু অনেক সময় গানের বাণীর স্বাভাবিক ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ ব্যাহত হয়ে একটা অবাঞ্ছিত আবহাওয়া সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থেকে যায়, আর প্রকৃতপক্ষে এ-থেকেই তো যা-কিছু বিদ্রোহের সূত্রপাত। এখানেই হল হিন্দুস্থানী গানের আদর্শের সঙ্গে বাংলাগানের আদর্শের অমিল। সুতরাং এইভাবে তুলনার দ্বারা বিচার করলে মনে হয়,—আমাদের বর্তমান আলোচ্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে তালযন্ত্র এমন একটি রীতি মেনে ব্যবহার করা উচিত—যাতে গানের পরিবেশটি সামগ্রিকভাবে সংযত ও শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে। সাঙ্গীতিক টেকনিক প্রকাশের ক্ষেত্রকে যত্ন সহকারে গানের বাণীর পিছনে নিয়ে গেলে অর্থাৎ গৌণ করতে পারলেই ইপ্সিত পরিবেশ লাভ করা খুব অসম্ভব কিছু নয়। গানের তালের ঠেকা বা বোলগুলি যথাযথ বেজে চলবে শাস্ত্রমতে—তালের হিসাব ঠিক রেখেই,—তাহলেও সঙ্গতকারকে গানের আদ্যোপান্ত গায়কের অনুগত হয়ে থাকতে হবে এমনভাবে, যাতে তাঁর তালযন্ত্রের আওয়াজ কখনও গায়কের কথার বাচন, সুরের ও অলংকারাদির সূক্ষ্মতাকে ছাপিয়ে না যায়। আসল কথা হল, রবীন্দ্রসঙ্গীতে যিনি তালযন্ত্রে সঙ্গতকার হবেন তাঁকে কিছুটা স্বার্থ-ত্যাগের অভ্যাস করতেই হবে, উদার মনোভাব নিয়ে বুঝতে হবে এক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী গানের তালসঙ্গতকারের মত তাঁর ব্যক্তিগত দক্ষতার ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেবার অবকাশ অতি সামান্য,—কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ত কিছুই নেই। এসবের কারণও বিশ্লেষিত হয়েছে অন্যত্র। তাল-সঙ্গতকার স্বার্থত্যাগে পুরোপুরিভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তালবাদ্যের অবাঞ্ছিত উগ্ররূপ তাঁর হাতে শান্তরূপ ধারণ করবেই করবে। আর রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন "সুরের মত তালও গানের ভাব প্রকাশের একটা অঙ্গ"—তাঁর এই উক্তিকে কার্যে পরিণত করাও তখন সহজ হবে সকলের পক্ষে।

গায়ক এবং তাঁর সঙ্গতকার

কবিগুরু চাইতেন, গানে ভাব-প্রকাশকে মুখ্য উদ্দেশ্য করে সুর ও তাল এবং তৎসঙ্গীয় বাজনাকে গৌণ উদ্দেশ্য করলেই ভাল হয়। আর বস্তুতপক্ষে তাঁর নিজের গাওয়া-গানেতেও এই আদর্শের প্রমাণ মিলে সুস্পষ্ট। কাজেই কবিগুরুর উক্ত ইচ্ছা তথা চাওয়ার প্রতি যদি আমাদের চৈতন্য, দরদ ও শ্রদ্ধা থাকে, তাহলে বিশেষ করে তাঁর গান গাইবার কালে তালবাদ্য বাজনায় কেরামতি দেখাবার লোভটা সংবরণ করলেই বা আমাদের ক্ষতি কিসে? বরং এটা করলে তাঁর গানে নিহিত কাব্যসম্পদে মনোনিবেশ করবারই তো সুযোগ জোটে বেশি,—আমরা ঐ সম্পদ-ভোগেও নিঃসন্দেহে লাভবান হই। এ-কথার সত্যতা আশাকরি রবীন্দ্রকাব্য এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী মাত্রেই উপলব্ধি করেন। তবু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়,—সকলের রুচি এবং অভিপ্রায় সব সময় সব

জায়গায় এক ধরনের হয় না। বহুজনেই নানা কারণে নিজ নিজ সুবিধাঅনুযায়ী রবীন্দ্রসঙ্গীতের কাব্যসম্পদের যথোচিত মূল্য দিতে কার্পণ্য দেখান এবং তার উপর আবার যখন তাঁদের চতুর্দিকবর্তী জ্ঞানলব্ধ শিক্ষা ও সংস্কারাদির প্রভাবে হরেক রকমের জমকালো বাদ্যিবাজনা দিয়ে তাঁদেরই ধ্যানধারণা অনুসারে সেই কাব্যের ঘাটতি (!) মাঝে-মধ্যে পূরণ করতে প্রয়াসী হন তখন স্বভাবত মনে প্রশ্ন জাগে : সঙ্গীতকলা কি নিছক সুর-তাল আর বাদ্যের কৌশল দেখাবার ক্ষেত্র? কৌশল যাঁরা দেখান তাঁদের 'টেকনিশিয়ান' বলে স্বীকার করা যায় ;—কিন্তু আর্টিষ্ট আর টেকনিশিয়ান তো এক নয়! এসব আলোচনার ক্ষেত্র অবশ্য স্বতন্ত্র। তাহলেও প্রসঙ্গত আমাদের স্মরণ করতে আপত্তি নেই,—রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধেরই কোনো এক জায়গায় লিখেছিলেন : "কৌশল জিনিসটা খাদ হিসাবেই চলে,—সোনা হিসাবে নয়।...ভারতের বৈঠকী-সঙ্গীত, কালক্রমে সুরসভা ছাড়িয়া অসুরের কুস্তির আখড়ায় নামিয়াছে। সেখানে তান-মান-লয়ের তাণ্ডবটাই প্রবল...আসল গানটা ঝাপ্‌সা"—ইত্যাদি জ্ঞাতব্য আরো অনেক কিছু। এই সমস্ত কথাই, রবীন্দ্রসঙ্গীতের তাল-অধ্যায় অনুশীলন করবার ক্ষেত্রে প্রত্যেক গীতার্থীর গভীরভাবে তলিয়ে দেখবার প্রয়োজন আছে। এখানে আমি শুধু বলতে চাই, —রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীর সঙ্গে তদীয় সুর-তাল পরিবেশন করাকালীন কোনোটাই যেন না একতরফা হয়ে দাঁড়ায়—এই দিকে সকলে নজর রাখবেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাই আমাদের সচেতন করে দিয়ে গেছেন এই বলে :

আর্টিষ্ট ও টেকনিশিয়ান

> "সঙ্গীতের একটা প্রধান অঙ্গ-তাল। আমাদের আসরে সব চেয়ে বড়ো দাঙ্গা এই তাল লইয়া। গান-বাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই লইয়া বিষম মাতামাতি। দেবতা যখন সজাগ না-থাকেন তখন অপদেবতার উৎপাত এমনি করিয়াই বাড়িয়া ওঠে। স্বয়ং সঙ্গীতই যখন পর-বশ তখন তাল বলে : 'আমাকে দেখো', সুর বলে : 'আমাকে'। কেননা দুই ওস্তাদে দুই বিভাগ দখল করিয়াছে—দুই মধ্যস্থের মধ্যে ঠেলাঠেলি—কর্তৃত্বের আসন কে পায়—মাঝে হইতে সঙ্গীতের মধ্যে আত্মবিরোধ ঘটে"—(সঙ্গীতের মুক্তি)।

এবার চলুন আমাদের আগের পৃষ্ঠায়—যেখানে কবিগুরু-প্রবর্তিত নূতন তালগুলির সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। সেগুলি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে,—ঝম্পক, রূপকড়া এবং ষষ্ঠীতাল ছাড়া তত্র উল্লিখিত বাকী তিনটি অর্থাৎ নবতাল, একাদশী এবং নবপঞ্চ তালে রবীন্দ্রনাথ যে-সব গান লিখেছেন তা সংখ্যায় অতি অল্পই। এর কারণ নিয়েও বিশদ আলোচনার অবকাশ আছে, যেমন করেছেন দেখেছি—(১) ১৯৫৬ সালের 'সুরছন্দা-রবীন্দ্র-সংখ্যা'-য় প্রখ্যাত সঙ্গীতকোবিদ ডাঃ বিমল রায়, এম্‌-বি, তাঁর "রবীন্দ্রনাথ ও নূতন তাল" শীর্ষক একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে এবং (২) অরুণ ভট্টাচার্য

সম্পাদিত 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানা দিক' গ্রন্থে করেছেন প্রথিতনামা সঙ্গীত-সমালোচক শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচিন্তা" নামীয় দীর্ঘ প্রবন্ধে,—তেমনি। তদুপরি স্মরণ করা প্রয়োজন, আমরা আগেই প্রাসঙ্গিক বহু কথার সূত্রে এবং কবিগুরুর নিজ উক্তির সাহায্যে জানতে পেরেছি যে, তাঁর মূল গীতরূপ অনেক ক্ষেত্রে শাস্ত্রানুগত বিশুদ্ধ আকারের তোয়াক্কা রাখে না (দ্রঃ এই গ্রন্থেরই চলিত নিবন্ধ, পৃ ৬৪),—সে-কথারই সমর্থনে বিশ্বভারতী প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহ মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোনো কোনো টীকাংশে যে-মন্তব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়—তার উদ্ধৃতি এই :

"কাহারবা তালে মিলাইবার জন্য মূল গীতরূপ অপেক্ষা -া-া। -া-া এই চার মাত্রা টানিতে হইয়াছে"—(স্বরবিতান-৫১ম খণ্ড। প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭১। পৃ ৬৮)।

"দাদরা তালে মেলাবার জন্য স্বরলিপিতে তিন মাত্রা বাড়ানো হয়েছে"—(স্বরবিতান-৬০ম খণ্ড। প্রকাশ : ১৯৭৩। পৃ ১৫)।

স্বরলিপির সঙ্গে দেওয়া উপরোক্ত টিপ্পনীদ্বয়,—রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাল-অধ্যায় সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা জন্মাবার উদ্দেশ্যে কিন্তু কৈফিয়ৎসংযুক্ত আরো বিস্তারিত বিবৃতির অপেক্ষা রাখে। কারণ, ঐ টিপ্পনী পড়ে সংশ্লিষ্ট পাঠকদের মনে এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, যে,—রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর গানে সুরারোপ করার সময় কি কোনো বিশেষ তালে মিলিয়ে তা করতেন না ? আর যদি তা-ই হয়, তাহলে এখানে জোর করে তালে মিলিয়ে গানের মধ্যে কবির সৃষ্ট মূল গীতরূপটিকে অগ্রাহ্য করার দরকারই বা কি। এমনতর স্বীকারোক্তিরদ্বারা কী প্রকারান্তরে বিকৃত করা হচ্ছে না কবির মূল সৃষ্টিকেই ? অপিচ পূজনীয় গুরুদেব "প্রচলিত বাঁধা ছন্দের ব্যতিক্রমে গান রচনা করতে দ্বিধা করেন নি। আবার গানের আবেগে তাঁর মনে অনেক সময় গানের সুর ও কথা একসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। সেই-সব গানের কথাকে সাধারণত তিনি আলাদা করে ছন্দের বাঁধনে বাঁধতে ইচ্ছা করতেন না, ছন্দের নিয়মে ত্রুটি থাকলেও।...লক্ষ্য করে দেখেছি যে, তিনি [তাঁর যৌবনের রচনার গানগুলি] গাইবার সময় প্রায়ই বাঁধা তালে বা ছন্দে গাইতেন না, দ্রুতলয়ের গান ছাড়া। বহু নাটকের অভিনয়েও তাঁকে গান গাইতে শুনেছি, তখনো দেখেছি ঢিমে লয়ের গানে বাঁধা-ছন্দের নিয়ম একেবারে রাখেন নি; গান গাইতেন স্বাভাবিক কথা বলার ছন্দে, যেন গানেই কথা বলছেন।...তালওয়ালা অনেক গান এই রকম কথার ছন্দে তিনি গেয়েছেন, অনিয়ন্ত্রিত ছন্দে গানও অনেক রচনা করে গেছেন" বলে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত গ্রন্থের 'ছন্দ-তাল' অধ্যায়ে যে প্রত্যক্ষবর্ণনা দিয়েছেন বিস্তর মৌলিক বক্তব্যাদি বিশ্লেষণান্তে—এ সবও প্রসঙ্গত রবীন্দ্রসঙ্গীত-তালতত্ত্বসন্ধানীদের বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনার বিষয়। মোটের উপর এতৎসম্পর্কীয় আলোচনা, আরো বহু গুণী সঙ্গীতবেত্তাদের মতামত আহরণপূর্বক দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে নেবার যেমন অবকাশ আছে—তেমনি সাথেসাথে মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "সঙ্গীত আর কিছু নয়—

সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা"—তাঁর এই স্বকীয়তাদীপ্ত অভিমতটিও আমাদের প্রত্যেকের বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষমতানুযায়ী শিরোধার্য করে নেওয়া একটা অবশ্য কর্তব্য কাজ। যে কাজের মধ্যে সংযম এবং ধীরতা অনুশীলনেরও অবকাশ রয়েছে প্রচুর, এবং ঐ সম্বন্ধে বলবার লিখবারও তেমনি :—সেই বিবেচনায় কবিগুরুর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে আপাতত এখানে দাঁড়ি টানলাম। কবি বলছেন :

"কবিতায় যেটা ছন্দ, সঙ্গীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে, আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে না। অতএব কাব্যেই কী, গানেই কী,—এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই"—(সঙ্গীতের মুক্তি)।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য

'রবীন্দ্রসঙ্গীতে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য' নিয়ে এবার আমাদের আলোচনা। কিন্তু অলোচ্য বিষয় সম্পর্কে যদি আলোচকদের ধারণা অস্পষ্ট থাকে তাহলে বড় মুশকিল। কারণ, এতে আলোচনা করে কোনো ফল হয় না,—অস্পষ্টতার আবর্তে পড়ে বুদ্ধি এবং বোধশক্তিটাই আরো অস্পষ্ট হয়ে আসে, ফলে আলোচনাটা দুর্বোধ্য হয়। বর্তমান আলোচ্য বিষয়টিও অনেকটা সেই পর্যায়ভুক্ত বলে এই ভূমিকাটুকুর অবতারণা।

রবীন্দ্রসঙ্গীত বাংলা ভাসায় রচিত। সুতরাং বাংলা ভাষার উচ্চারণে যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের উচ্চারণেও যে সেই একই বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য হবে এবিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকার কারণ নেই।

তবে প্রশ্ন হল : বাংলাভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য কি আর আমরা সকলে যথারীতিতে নির্ভুলভাবে আয়ত্ত করে নিয়ে—তারপর এর চর্চা করি কখনও ?

মোটেই না। অথচ এই যৎসামান্য গাফিলতির জন্যে বাংলা-উচ্চারণের সঠিক নিয়মকানুন আমাদের বাঙালী বহুজনের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে যায় ; অর্থাৎ আমরা যে অনেকে যথারীতিতে বাংলা উচ্চারণ করতেই জানি না, এবং জানি না বলেই তো পারি না,—এই ন্যায্য কথাটা স্থলবিশেষে অবহিত হয়েও আবার সকলশ্রেণীর বাঙালীরা মনে প্রাণে তা প্রকাশ্যে মেনে নিতে নারাজ! এইটেই হল একে-অন্যের মধ্যে যেমন ভুল বোঝবার, তেমনি অনেকটা নিজেকে ভোলাবারও মূল উপাদান! এর কার্যকারণ নিয়ে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাই,—উচ্চারণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অবশ্য অতি সহজভাবে যা আমাদের কানে আসে সেগুলি আমরা আপনা-আপনিই শিখে নেই—অবশিষ্টগুলি প্রায়ই অবহেলিত থাকে। স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ নামে বাংলাভাষায় দুই রকমের **alphabets** তথা বর্ণমালা আছে একথা সবাই জানেন। এই বর্ণমালার ধ্বনি-বৈচিত্র্য ও উচ্চারণ-বিধি, ব্যাকরণের পৃষ্ঠায় প্রচুর বিশ্লেষণ সহকারে বর্ণিত এবং লিখিত

থাকলেও সকল পাঠার্থী তা আগ্রহ নিয়ে পড়েন কিনা সন্দেহ। তবে যাঁরা পড়েন তাঁরা নিশ্চয় বোঝেন, যে, ব্যাকরণে উদ্ধৃত উচ্চারণ সম্পর্কীয় নিয়মাবলী সুষ্ঠুভাবে মেনে চললে বাংলাভাষার উচ্চারণের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করা কারুর পক্ষেই অসাধ্য কিছু নয়। কিন্তু দুঃখের ও লজ্জার বিষয়, এই নিয়মাবলী ব্যবহারের প্রথাটাই যে আমাদের মধ্যে একেবারে অচল। ফলতঃ ব্যাকরণলব্ধ জ্ঞান, ব্যাকরণ গ্রন্থতেই শুধু আবদ্ধ থাকে—বাস্তবে বড় একটা রূপায়িত হয় না। আবার অন্যদিকে উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যাদি যথাকালে যথারীতিতে অনুশীলিত হওয়ার অভাবে অনেকেরই উচ্চারণ, আড়ষ্টতা এবং অস্পষ্টতা দোষে দূষিত থেকে যায়। এ-সব ত্রুটি বিচ্যুতি যে কখন-সখন আমরা উপলব্ধি করিনে—তা নয়; খুবই করি। কিন্তু সেজন্যে কারো কোনো ভ্রুক্ষেপ কিংবা আক্ষেপ নেই। তার কারণ, এরদ্বারা চলতি প্রয়োজনাদির ক্ষতিবৃদ্ধি ত ঘটে না বিশেষ কিছু,—অর্থাৎ দৈনন্দিন কথাবার্তার কাজ, একে-অন্যের মধ্যে, অবলীলায়ই সম্পন্ন হয়ে যায় এবং সেটা সম্পূর্ণ অভ্যাসজনিত, চিরাগত-ও। কিন্তু, দশ জনের সামনে কবিতা অথবা নাটক পাঠ করতে গেলে, কোনো প্রকাশ্যসভায় বক্তৃতা দিতে গেলে কিংবা কাব্যধর্মী গান (বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত, যার ভিতরকার অধিকাংশ শব্দ আমাদের চলিত কথ্য শব্দের বাইরে থেকে আহৃত—তা যাতে সর্বজনের কাছে সুবোধ্য হয় সেইভাবে উচ্চারণ করে) গাইতে গেলেই আমরা নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে পড়ি, কেননা আমাদের স্ব-অর্জিত উচ্চারণের আড়ষ্টতা এবং অস্পষ্টতা দোষ তখন প্রকটতর রূপ ধারণ করে। এর ফলে আমরা অপ্রস্তুত, লজ্জিত হই এবং বাতারাতি কারকে না কারুকে অনুকরণ করে শুধু উপরোক্ত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, নিজেদের যখন সাময়িকভাবে শুধরে নিতে চেষ্টা করি তখন আর সেটা স্বাভাবিক থাকে না—কৃত্রিম হয়ে পড়ে—অনেকটা পাখীর কণ্ঠে শেখানো বুলির মতন। কিন্তু আমরা তো কেউ পাখী নই,—ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্পন্ন মানুষ আমরা। এই স্বাতন্ত্র্যবোধটি আবার আমাদের শিল্পীদের ভিতরে অতিরিক্ত রকমের প্রবল ও গৌরবের বস্তু। কাজেই অনুকরণ তাঁরা করতে যাবেন কোন যুক্তিতে! অনুকরণ যখন গৌরববিরোধী কাজ, তখন তো সেটা সর্বথা সর্বজনের দ্বারাই পরিত্যাজ্য। ভাল সুন্দর ও স্পষ্ট উচ্চারণ করার জন্যে যথোচিত সাধনা ও অনুশীলনের প্রয়োজন আছে—একথাটুকু মেনে চলতে হলেও বোঝা দরকার, যে, কোনো কিছু অনুশীলন করতে গেলেই তার গভীরে যেতে হয়; কিন্তু সেটা না করে বাইরে থেকে ভাসা-ভাসা অবস্থায় কাজ সেরে নেবার চেষ্টা করলে ঐ কাজটাই অনেক সময় হয়ে দাঁড়ায়—অন্ধ অনুকরণ মাত্র। অন্ধ অনুকরণ আর স্বীকরণ তো কখনো এক নয়!

উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে অধিগত হলে উচ্চারণে বিশুদ্ধতা আসে। এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণের চর্চা করলে উচ্চারণকারীর জিব জড়তা ও অস্পষ্টতা মুক্ত হয়। জড়তা ও অস্পষ্টতাহীন উচ্চারণই হল 'স্বাভাবিক উচ্চারণ'। এই যুক্তিগুলি মোটামুটিভাবে উপলব্ধি

করতে পারলেও এগুলিকে বাস্তবে পরিণত করার যোগ্যতা অর্জন কিন্তু অনেকের পক্ষে খুব সহজ কাজ নয়। কারণ, যাঁরা কেবল বিশেষভাবে গানের চর্চা করেন তাঁদের অধিকাংশের নজর থাকে কথার উচ্চারণের চাইতে সুরের উচ্চারণের দিকেই বেশি। ফলে সুর-চর্চায় তাঁরা নিঃসন্দেহে কৃতী হন,—স্ব-স্ব কণ্ঠনৈপুণ্যের প্রশংসা পেলে তাঁদের শিল্পী-জীবনেও তেমনি চরিতার্থতা আসে নানাভাবে। কিন্তু কথা-সংবলিত গানের ভিতরে তো শুধু সুর নয়, সেখানে যে সুরের সঙ্গে কথার দিকেও গায়কদের নজর রাখতে হয় সমান ওজনে। উপরন্তু কথা গড়ে ওঠে বহু শব্দ (sound নয়, words) নিয়ে, শব্দের মধ্যে থাকে আবার নানা রকমের অক্ষর! এখন, এই অক্ষর-বোধ (তথা বর্ণমালার ধ্বনিবৈচিত্র্য এবং উচ্চারণবিধি যা এ প্রবন্ধের শুরুতেই বিশ্লেষিত হয়েছে, তা) যদি গায়কদের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে পাকা হয়ে না বসে তাহলে তাঁদের কথার উচ্চারণ সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত হওয়া অসম্ভব। কথা-সংবলিত গানে রূপ দিতে গেলে গায়কদের সামনে এই একটা বড় সমস্যা এবং এর সমাধানের জন্যে তাঁদের অনেকের পক্ষে অক্ষরজ্ঞান অর্থাৎ লেখাপড়ার কাজ অতি অবশ্য শিক্ষণীয় হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য এটা সুর চর্চাকারীদের নিকট অতিরিক্ত এক মেহনৎ, বিশেষ করে অক্ষর-জ্ঞানহীন গায়কদের পক্ষে তো নিশ্চয়ই। অথচ এক্ষেত্রে, উক্ত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এই অতিরিক্ত মেহনৎ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই মন্তব্য কথা-সংবলিত, তথা কাব্যধর্মী যে-কোনো জাতীয় গানের বেলায়ই খাটানো যায়। তবে যে-কোনো জাতীয় গানের বেলায় এমনতর সমস্যার উপর আমরা অনেকে তেমন গুরুত্ব আরোপ করি না, করতে চাই-ও না—যেমনটা করি রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেলায়। আর সেইজন্যই বোধকরি 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য'—এই বিশেষ কথাটি অনেক সময় অনেকের কাছে গোলমালের সৃষ্টি করে অর্থাৎ, উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যটি যেন একমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেলায়ই প্রযোজ্য—অন্য কোন সঙ্গীতের বেলায় নয়,—এই অনুভব নিয়ে যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষার্থীরা তেমনি আলোচকেরাও রীতিমত বিভ্রান্ত হন।

গানের মধ্যে কথা, শব্দ, অক্ষর ও সুরের তারতম্য বিচার

কিন্তু প্রত্যেকেরই মনে রাখা উচিত,—উচ্চারণ সাধারণত আমরা কানে শুনে শুনে কণ্ঠ পরম্পরায় শিখে থাকি। এছাড়া তা শিখবার অন্য কোনো বাঁধা নিয়ম-কানুন আমাদের সামনে নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে আদর্শেরও যে অভাব আছে একথা স্বীকার করলে বোধকরি কারুর ভুল হবে না। প্রতিনিয়ত কানের কাছে যে প্রকারের উচ্চারণ ধ্বনিত হয়, সেটাই শ্রোতার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং শ্রোতা স্বভাবত সেই উচ্চারণেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। উচ্চারণ শিখবার নির্দিষ্ট কোনো মাপকাঠি তথা আদর্শ নেই বলেই প্রায়শঃ দেখা যায়, বিশুদ্ধ ভাবে কথা বললেও বহু শিক্ষিতজনের মধ্যেও সকলের উচ্চারণের ধরণ একই রকমের হয় না—এর প্রমাণ পরিষ্কারভাবে পাওয়া যেতে পারে কোনো একটা

উচ্চারণশিক্ষায় আদর্শের অভাব

বিশেষ কবিতা কিংবা নাটক পাঠের মাধ্যমে*। অধিকন্তু এক্ষেত্রে বাংলাভাষাভাষীদেরই দৃষ্টান্ত টেনে আমরা দেখতে পারি, দক্ষিণ কলিকাতাবাসীর উচ্চারণের সঙ্গে উত্তর কলিকাতাবাসীর উচ্চারণের মিল নেই; তেমনি সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে পূর্ববঙ্গবাসীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গবাসীর উচ্চারণে। সারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলবাসী বাঙালীদের উচ্চারণ লক্ষ্য করলে অমিল পাওয়া যায় আরো কত রকমেরই না! এমন কি কখন-সখন একজনের কাছে আরেকজনের উচ্চারণ দুর্বোধ্যও মনে হয়।—অথচ এঁরা কিন্তু সবাই বাঙালী—একই কথা, একই অক্ষর, একই অনুভব মিশিয়ে একই ভাষা ব্যবহার করে চলেছেন এঁরা দিনরাত। অতএব আমার সঙ্গে আমার পাশের বাড়ির এমন কি আমার পাশের ঘরের লোকের উচ্চারণে যদি অমিল ঘটে এতে আশ্চর্য কিংবা হতাশ হবার কিছু নেই, বরং এইটেই তো স্বাভাবিক ঘটনা।

উচ্চারণের মধ্যে এমনতর স্বাতন্ত্র্য গড়ে ওঠে প্রধানত নিজ নিজ পরিবেশের প্রভাবে, অঞ্চলগত নিয়মে—কতকটা অনিবার্যগতিতেই। সুতরাং এই সব কারণে অন্যের উচ্চারণ ঠিক আপনারই মত কিংবা আপনার উচ্চারণ ঠিক অন্যের মত যদি কখন-সখন নাও হয় তাহলে কোনোপ্রকারের নিন্দোক্তি প্রয়োগের অভ্যাস কিন্তু কারুর পক্ষেই শোভন বা সমুচিত বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। একথার পৃথক ব্যাখ্যা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে ঐ অভ্যাসটা যে অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে নিছক নিজ নিজ ভিতরকার হীনমন্যতা থেকেই উৎপন্ন হবার সম্ভাবনা—তা যেন নিন্দোক্তি প্রয়োগে প্রলুব্ধ যে-সকল অভ্যাসকারী তাঁরা আপন-আপন সাবকাশ মত বুঝবার চেষ্টা করেন।

এবার আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনা-প্রসঙ্গে—প্রসঙ্গটি স্পষ্টতর করার উদ্দেশ্যে এখানে সামান্য একটি বাস্তব উপমা নেওয়া যাক্। যেমন ভেবে দেখুন,—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরই স্বহস্তে নির্মিত শান্তিনিকেতনের পরিবেশের মধ্যে বাস করে আপনি যেভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য শিখে নিয়ে তার সার্থক ব্যবহারে সমর্থ হবেন,—বিরাট কলিকাতানগরীতে এসে কিন্তু সেভাবে কিছুই করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। পক্ষান্তরে, কলিকাতার মত শান্তিনিকেতনে হয় না। এমন কি ব্যক্তিত্বপূর্ণ একই শিক্ষকের আওতায় থাকলেও

* কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে শুনেছি যে কবিতার আবৃত্তি এবং নাটকের পাঠ, সেই একই কবিতা এবং একই নাটক ফের শুনেছি—আবৃত্তি এবং পাঠ করতে নটরাজ শিশিরকুমার ভাদুড়িকেও। দুটোই অপূর্ব মনে হয়েছে—শুনে মুগ্ধ হয়েছি। বাংলাভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য—এমন কি এর আভিজাত্য তাঁরা উভয়েই বিশুদ্ধভাবে অক্ষুণ্ণ ও উজ্জ্বল রেখে নিজ মাতৃভাষাকে অশেষ গরীয়ান করে তুলেছেন বটে, কিন্তু তবু বলব, উচ্চারণের প্রকাশভঙ্গীতে তাঁদের একজনের সঙ্গে আরেকজনের কোনো বিশেষ মিল ছিল না—আর এই স্বাতন্ত্র্যই যে ছিল তাঁদের মৌলিকতা—এই সত্য অস্বীকার করবে কে!

উচ্চারণের অদল-বদল ঘটে কিছু-না-কিছু—ঘটতে বাধ্য, বহিরাগত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বের ও সংস্কৃতির প্রভাবে এবং পরিবেশের অনৈক্য হেতু। এসব বাস্তব উপমার সত্যতা যে-কেউ পরীক্ষা করে দেখলে বুঝবেন,—উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য রক্ষার বিষয় নিয়ে আমরা বাইরে যতই মাতামাতি করি না কেন—আসলে পরিবেশের প্রভাবগুণে উচ্চারণের হের-ফের যে অবশ্যম্ভাবী এটা কিন্তু প্রত্যেকেই মেনে আসছেন আবহমানকাল ধরে—নিজেদের অজান্তে।

পরিবেশের প্রভাব

তা-হলেও উচ্চারণের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ ও স্থায়ী রাখা সম্ভব, যদি অনুকূল পরিবেশটি তেমন ব্যাপকভাবে গড়ে নেওয়া যায়,—আর বস্তুতপক্ষে সেটাই এখন আমাদের একমাত্র করণীয়। মুখে অতি সহজেই বলা হল বটে 'করণীয়';—কিন্তু তা কার্যকর করে তোলার পথেও যে আরো বাস্তব অন্তরায় আছে—সেগুলিকে অস্বীকার করলে তো চলবে না। যথা,—আপন-আপন পারিবারিক পরিবেশে একেবারে শৈশবে মা, বাবা এবং গুরুর স্নেহচ্ছায়ায় বসে শিক্ষালব্ধ উচ্চারণকে কেউ কখনও ভুল বলে মনে করেন না, অশ্রদ্ধাও করতে পারেন না এবং সাময়িক কোনো প্রয়োজনে কিংবা মোহে আবিষ্ট হয়ে একে একটু এদিক-সেদিক করে নেবার প্রয়াস কখন-সখন কারুর মধ্যে দেখা দিলেও কার্যত কিন্তু সকলেই সগর্বে স্ব-স্ব-শিক্ষালব্ধ মূল উচ্চারণ-স্বাতন্ত্র্যে ফিরে আসেন। এই প্রবাহ ধারাবাহিক ও চিরন্তন। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটে যদি—সেটা শুধু ঐ 'ব্যতিক্রম'ই থেকে যায়।

আপাততঃ ব্যতিক্রমের বিষয় অনালোচিত রেখে এখানে দেখব,—যা খানিক আগে বলা হয়েছে, যে, কোনো বিশেষ বাঁধাধরা নিয়মানুসারে উচ্চারণ শেখার রীতি গ্রহণে আমরা অনভ্যস্ত,—এই আত্মত্রুটি স্বীকারের অনুভবটুকু আমাদের মধ্যে যথাযথ আছে কি না। যদি থাকে, তাহলে এটাও সকলের পক্ষে অনুভব করা সহজ হবে,—উচ্চারণের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রেখে তা যথানিয়মে চর্চা করবার অনুকূল পরিবেশ না-পাওয়া পর্যন্ত আমাদের কথা বলার সময় উচ্চারণের যে পার্থক্য একে-অন্যের মধ্যে নিছক অনিয়মতার মাধ্যমে গড়ে ওঠে—সেটাই কিন্তু কালক্রমে স্বাভাবিকতার স্বচ্ছন্দ রূপ নেয় এবং সকল রকমের অনুভূতির সঙ্গে মিশে চিরস্থায়ী হয়ে যায়। স্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করতে গেলে যে প্রত্যেককেই অল্পবিস্তর কৃত্রিমতার দ্বারস্থ হতে হয়—তা কে না বোঝেন! সুতরাং কথা বলার উচ্চারণে (শুদ্ধ হোক কিংবা অশুদ্ধ হোক) পার্থক্যজনিত যে-রূপটিকে একেবারে প্রথম জীবনের শিক্ষার আরম্ভ থেকেই আমরা নিয়ত অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃ সহজ ও স্বাভাবিক করে তুলি এবং সেটাকে যত্রতত্র প্রয়োগ করতেও আমাদের যখন লেশমাত্র সংকোচ থাকে না—তখন কথার উচ্চারণের মধ্যে এই সাধনালব্ধ পার্থক্যটিকে, পুনশ্চ কেবলমাত্র গান গাইবার বেলায় রাতারাতি ভেঙে দিয়ে ভিন্ন উচ্চারণে রূপান্তরিত করবার মনোবিলাস কি কৃত্রিমতারই নামান্তর নয়? অবশ্য

এও দেখা যায়, যে,—জোরজবরদস্তির মাধ্যমে অনেকে একাজ বেশ আয়ত্তে নিয়ে আসেন—অর্থাৎ অন্যের সাহায্যে অভীপ্সিত উচ্চারণ শুধু মাত্র গান গাইবার জন্য শুধরে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন তাঁরা। কিন্তু তা পারলেও—সেটা মূলতঃ গায়কদের এক ধরনের কৃত্রিমতারই প্রকাশ। যেমন, অভিনয় করার কালে অভিনেতারা রঙ্গমঞ্চে নিজেরা যা নয় তাই সেজে অনেক সময় দর্শকদের তাক লাগিয়ে দেন—এর দ্বারা সাময়িক প্রয়োজনও তাঁদের সাধিত হয় বটে, কিন্তু অভিনেতারা কি কখনও ভুলতে পারেন যে এটা তাঁদের কারুরই স্বাভাবিক রূপ নয়? সংলাপ প্রকাশের ভঙ্গিও তো তাঁদের হয়ে দাঁড়ায় তদনুরূপ! ঠিক তেমনি—গানের কথার উচ্চারণগুলি সাময়িক প্রয়োজনে যখন গৃহীত হয় তখন গায়কের কণ্ঠে তা অনুকরণলব্ধ হয়ে নিখুঁত নাটকীয় রূপই ধারণ করতে পারে—নিরেট প্রাণহীন কলের গানেব মতো দৈবাৎ মনোমুগ্ধকরও হয় বটে,—কিন্তু অকৃত্রিম হয় না তা কখনও*। নাটকীয় যে কোনো কাজের সঙ্গেই—একমাত্র নাটকের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ছাড়া—মানুষেব হৃদয়ের কোনো সম্বন্ধ থাকে না—থাকতে পারে না। কাজেই অনুকরণলব্ধ নাটকীয় উচ্চারণ, যদি গায়কের হৃদয়ের কোনো স্পর্শ ই না পায় তাহলে তা, কি কোনোকালে গায়কের কণ্ঠে স্বচ্ছন্দ, সাবলীল প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পাবে?—পারে না নিশ্চয়ই। তাছাড়া গীতার্থীদের গীতশিল্পচেতনা প্রকাশের পক্ষে, তাদের উচ্চারণের স্বাভাবিকতা বর্জন করে এমনতব কৃত্রিম পন্থা অবলম্বনে উচ্চাবণ আয়ত্ত করার রীতি কতখানি হিতকর বা অহিতকব—কিংবা আদৌ কাম্য কি না—এ সমস্তই তো সংশ্লিষ্ট গুণিজনদেব গভীরভাবে ভেবে দেখার বিষয়। আসল কথা হল, প্রত্যেক গীতশিক্ষার্থীকেই সতর্ক-নজর রাখতে হবে উচ্চারণ শিক্ষা পদ্ধতির একেবাবে শিকড়ে—যাতে তাদের তদ্‌সম্বন্ধীয় জ্ঞানবৃক্ষটি সহজ আলোবাতাসেব সাহায্যে স্বাভাবিক পত্রপুষ্পে বিকশিত হবার পূর্ণ অবকাশ পায়।

গান গাওয়া ও অভিনয় করা এক জিনিষ নয়

এতক্ষণ গড়পড়তাভাবে সাধারণদেব মধ্যে বাংলাভাষার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য শিক্ষার পদ্ধতিটা কী ধরনেব,—তা যথার্থ ই কোনো আদর্শ অনুসরণ করে চলে আসছে কিনা এবং গানে কিংবা কথায়ই বা কোন্ প্রণালীতে এর ব্যবহার, ইত্যাদি নিয়ে একটা মোটামুটি আলোচনা হল।—যেহেতু এই আলোচনার সূত্রপাত রবীন্দ্রসঙ্গীতকে কেন্দ্র করে তখন রবীন্দ্রোত্তর বর্তমানযুগের নবীন গীতার্থীদের মনে এটা জানবার কৌতূহলও স্বাভাবিক যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত-স্রষ্টা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে উচ্চারণ কবতেন? তাঁর উচ্চারণ শিক্ষায়ও কি আমাদের মত কোনো আদর্শ ছিল না? তিনিও কি আমাদেরই মত কথা বলতেন এক রকমের উচ্চারণে,—আর গান গাইবার সময় আশ্রয় নিতেন অন্য রকম উচ্চারণের?—এ সব সমস্যা কি তাঁরও ছিল?—এ প্রশ্নগুলির উত্তর পাবার উদ্দেশ্যে এবার রবীন্দ্রনাথের

* "গান তো অভিনয়ের নকল নহে; কেন না গান আর অভিনয় এক জিনিস নয়। অভিনয়কে যদি গানের সঙ্গে মিলিত করি তবে গানের বিশুদ্ধ শক্তিকে প্রচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়"—রবীন্দ্রনাথ

ব্যক্তিগত জীবনে উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য শিক্ষার বা চর্চার মূল পটভূমির প্রতি একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক।

সমগ্র বঙ্গদেশে সংস্কৃতির একটা সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের ধারা রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষেরাই প্রবর্তন করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের জন্মের বহুকাল আগে। কলকাতা জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ির নামটিও সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে পরিচিত। সে-বাড়ির লোকদের সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ কিছুই একেবারে সাধারণদের অনুরূপ ছিল না ; সুতরাং এই সূত্রে তাঁদের মুখের ভাষাতেও যে অ-সাধারণত্বের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল—এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় কিংবা তারও আগে যে শিক্ষকরা জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসে পড়াতেন, তাঁদের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই নিজ ব্যয়ে কাশী পাঠিয়ে বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং এদের বৈশিষ্ট্য শিখিয়ে আনতেন। বলাবাহুল্য মহর্ষিদেব স্বয়ং উচ্চারণের প্রতি ছিলেন বিশেষ মনোযোগী ও যত্নবান। এসব তথ্য বিশদভাবে জানতে যাঁরা ইচ্ছুক, তাঁদের মহর্ষির আত্মজীবনী পড়তে অনুরোধ করি। পড়লে পাঠকেরা বুঝবেন,—মহর্ষির তত্ত্বাবধানে তাঁর পরিবারে উচ্চারণ শিক্ষার যে পরিপূর্ণতা তথা সাফল্য এসে জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল —সেটা কখনও আচমকা হয়নি,—হয়েছিল দীর্ঘকালের সাধনায়। তাঁদের কথাবার্তা শুনে লোকে মুগ্ধচিত্তে মন্তব্য করত 'এ হল ঠাকুরবাড়ির ভাষা'। কিন্তু তা-বলে সেটাকে অনুসরণ করতে হলে যে কঠিন শ্রমের প্রয়োজন তা বরণ করার জন্য ঐ লোকদের কণামাত্র উৎসাহ ছিল কিনা সন্দেহ! এর পিছনের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখেছেন :

ঠাকুরবাড়ির ভাষা

> "নিরালায় এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক,—মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা-জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মতো। তাই আমাদের ভাষায় একটা কিছু ভঙ্গী ছিল, কলকাতার লোক যাকে ইশারা করে বলত ঠাকুরবাড়ির ভাষা। পুরুষ ও মেয়েদের বেশ-ভূষাতেও তাই,—চালচলনেও। বাংলা ভাষাটাকে তখন শিক্ষিতসমাজ অন্দরে মেয়েমহলে ঠেলে রেখেছিলেন ; সদরে ব্যবহার হত ইংরেজি—চিঠিপত্রে, লেখাপড়ায়, এমন-কি মুখের কথায়। আমাদের বাড়িতে এই বিকৃতি ঘটতে পারে নি। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই"—(রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ম খণ্ড, পৃ ২০৮)।

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির সাহায্যে, তৎকালীন সমগ্রবাংলায় জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ির উচ্চারণে ক্রমশঃ এক স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠার কারণটি সহজে অনুমান করা যায়। উপরন্তু উচ্চারণে বিকৃতিটা ঠাকুরবাড়ি ছাড়া অন্যত্র যে অবাধে বাঙালীদের মধ্যে কী ভাবে ঘটে এসেছে—তাও বুঝতে অসুবিধা হয় না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল,—উচ্চারণে বিশুদ্ধতা রক্ষার অনুকূল পরিবেশটি গঠন করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজে,—বাইরের কোনো মিশ্রণ—কোনো সংস্রব এসে তা সহজে মলিন করে দেবার অবকাশ পায়নি। এই নিয়ে রবীন্দ্রাগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেও বলতে শোনা যায় তাঁর বাল্যকালের স্মৃতিচারণে :

"জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ছেলেদের জন্য একটি ধর্মপাঠশালাও খোলা হইয়াছিল। সেখানে শ্রীযুক্তঅযোধ্যানাথ পাকড়াশী ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ পড়াইতেন। উপনিষদের শ্লোকগুলি হ্রস্ব দীর্ঘ রক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে সমস্বরে পাঠ করান হইত।"—বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনার লক্ষ্য স্থির রাখার উদ্দেশে এই কথাগুলির তাৎপর্য খুব নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করা দরকার। তাছাড়া উচ্চারণ-শিক্ষা-পদ্ধতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেও আরো বলেছেন: "একবার পিতা আসিলেন আমাদের…উপনয়ন দিবার জন্য। বেদান্তবাগীশকে লইয়া তিনি বৈদিকমন্ত্র হইতে উপনয়নের অনুষ্ঠান নিজে সংকলন করিয়া লইলেন। অনেকদিন ধরিয়া দালানে বসিয়া বেচারামবাবু প্রত্যহ আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থে-সংগৃহীত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধরীতিতে বারম্বার আবৃত্তি করাইয়া লইলেন"—(জীবনস্মৃতি, পৃ ৪০)। অন্যত্র আবার জানাচ্ছেন: "বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বারবার আবৃত্তি-দ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সব-কিছু সকল মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারি নি। শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিল না হয়তো। এমন সময় উপনয়ন হল। উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র মুখস্থভাবে না;—বারংবার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে আবৃত্তি করেছি এবং পিতার কাছে গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি। তখন আমার বয়স বারো বৎসর হবে"—(রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ খণ্ড, পৃ ৬০৬)। সেই একই স্মৃতি ৭০ বৎসর বয়সে কবি তাঁর জয়ন্তী-উৎসবেও স্মরণ করে ১৩৩৮ সনের পৌষ মাসে বলেছিলেন: "আমাদের বাড়িতে একটি সমাবেশ হয়েছিল—সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্-পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই, প্রায়ই প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক।"

উপরে উদ্ধৃত প্রতিটি উক্তির ভিতর লক্ষ্য করে দেখুন,—'বিশুদ্ধ' এবং 'সুস্পষ্ট উচ্চারণে'র কথাটাই বারবার উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর এইভাবে বলার উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য বিশেষ উপলব্ধিসাপেক্ষ, এবং এই ইঙ্গিতানুসারে উচ্চারণের বিশুদ্ধতা ও সুস্পষ্টতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা যথার্থই পরিষ্কার ও গভীর কি না—সেটাও প্রসঙ্গত বিচার্য বটে। কবিগুরুর অনুরূপ উচ্চারণ তাঁর গীতভক্তেরা নিজেদের মত করে একান্তভাবে আয়ত্ত করবেন—এই অভিলাষ যদি তাঁদের মধ্যে থাকে—সেটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু সে কি কেবল অন্যের মুখে গল্প শুনে-শুনে আর মাঝে-মধ্যে অবসর সময়ে গান শিখতে বসে সামান্য একটুখানি অনুকরণের মাধ্যমে অকস্মাৎ বিনা আয়াসেই সম্পন্ন হয়ে উঠবে? তার জন্যে কি কোনো কঠোর চেষ্টা তথা সাধনার প্রয়োজন নেই? একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, কবির উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যাবতীয় বিশুদ্ধতা রক্ষার মূল সহায়ক ছিল তাঁর পিতৃদেব-রচিত 'নিজ পরিবেশ'—যার ভিত গড়ে ওঠার পিছনে দীর্ঘদিনের কৃচ্ছ্রসাধ্য আয়োজন ও চেষ্টার ইতিহাস আছে। সেই তুলনায় আমরা কোথায়—আমাদের সাধনা

কবির পরিবেশ এবং আমাদের পরিবেশ

কতটুকু এবং আমাদের পরিবেশটাই বা কিসের পরিচায়ক? বলাবাহুল্য এর অভ্রান্ত সমুচিত জবাব একমাত্র নিজেদেরই মধ্যে ছাড়া অন্যের কাছে খুঁজে কেউ কোনোকালে পাবেন না;—সকল রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিক্ষাব্রতীদের শিক্ষার পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্যে এসবেরও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানে যত্নবান ও তৎপর হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের গানে রবীন্দ্রনাথের রসনাপ্রসূত উচ্চারণ-ভঙ্গী রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুশীলনকারীদের অবশ্য জেনে রাখার একটা বিষয় বটে; কিন্তু তা তাঁরা জানবেন কোন্ প্রণালীতে—বিশেষত রবীন্দ্রনাথ যখন আজ ধরাধামে অনুপস্থিত? তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর রসনাপ্রসূত উচ্চারণের বাস্তবরূপ জানবার কাজে হাত দিয়ে একে সার্থক করে তোলা অধুনা আমাদের সকলের পক্ষেই তো রীতিমত একটা আয়াসসাধ্য কাজ; তা' বলে অসাধ্য নয় কিন্তু। আর সেজন্যই এমনতর উদ্যমকে প্রশংসা না করেও উপায় নেই কারুর। তবে কথা হচ্ছে,—এই আয়াসসাধ্য কাজের মধ্যে আদৌ প্রবেশ না-করে কিংবা প্রবেশের চেষ্টা মাত্র না রেখে শুধু বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে, নিজ নিজ পরিবেশের কথা ভুলে গিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য নিয়ে যখন আমরা অস্বাভাবিক রকমের মাতামাতি শুরু করি তখনই সন্দেহ হয়,—যেখানে যত বেশি অজ্ঞতা সেখানেই তত বেশি ভণ্ডতা—আর সেই অনুপাতে বুঝি বা মাতামাতির প্রাবল্যও সেখানে তত বেশি! সুতরাং কেবলমাত্র মতামাতিতে ওস্তাদ—এমনতর সব লোকের মুখে এই প্রসঙ্গে কোনো মনগড়া কাল্পনিক বর্ণনা শুনে রবীন্দ্রসঙ্গীতে নিষ্ঠাবান অনুশীলনকারীরা যেন কখনো কোনো বিভ্রান্তিতে না পড়েন—সেই উদ্দেশ্যেই বিশেষ করে এখানে এত সব কথা বললাম।

কবিকণ্ঠের উচ্চারণ স্বকর্ণে শুনলে যে কেউ বুঝতে পারবেন—স্বাভাবিকতা এবং সুস্পষ্টতাই ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গানের উচ্চারণের আদর্শ—এবং এর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য প্রধানত প্রকাশ পেত তা হল—মীড়, আশ, গমক ও বিশেষশ্রুতিসংযুক্ত তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মার্জিত কণ্ঠস্বর। চলিত প্রথানুযায়ী কণ্ঠ-সাধনার মাধ্যমে তিনি স্বরকে মার্জিত করেননি —সেটা তাঁর দরকার ছিল না, কেননা সুরেলা সুকণ্ঠের অধিকারী হয়েই তিনি জন্মেছিলেন। সে-কারণেই বলা হয়েছে তাঁর কণ্ঠস্বরের মার্জিত রূপটি ছিল স্বভাবজাত। তাহলেও, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়দেশীয় বহু ওস্তাদ গুণী গীতজ্ঞদের দ্বারা প্রদর্শিত কণ্ঠ-মার্জনার তথা স্বরক্ষেপণের রীতিনীতি ও তার প্রকৃতরূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চেতনাবোধ ছিল অসামান্য। এসব বাল্যাবধি তিনি দেখেছেন শুনেছেন প্রচুর এবং এর সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণও যে তিনি করে গেছেন অনেক জায়গায়—স্বীয় ভাষা, বাণী ও সুর রচনার মাধ্যমে—সে কথাটি যেন আমরা ভুলে না যাই। এই সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রত্যেক জ্ঞানার্থীরই অন্তত কবিকণ্ঠের রেকর্ড শুনে রাখার আবশ্যকতা আছে বলে মনে করি।

পুনশ্চ বলি, উচ্চারণে স্বাভাবিকতাই রবীন্দ্রসঙ্গীতে সর্বথা কাম্য। স্বাভাবিকতার সঙ্গে স্পষ্টতা ও বিশুদ্ধতা অত্যাবশ্যক। এমন অনেকেই ত আছেন গান জানেন না, অথচ

কথা বলার সময় কথার শব্দগুলি অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে পারেন। এর কারণ,—বর্ণের ব্যঞ্জনধ্বনি ও স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য তাঁরা কোনো-না-কোনো প্রকারে আয়ত্ত করে নিয়েছেন সম্যকরূপেতেই এবং তাঁদের উচ্চারণে যে স্বাভাবিকতার বিকাশ সেটা ত উক্ত কাজেরই ফলশ্রুতি মাত্র। এ জ্ঞানটাই রবীন্দ্রসঙ্গীত-গায়ক মাত্রের আয়ত্ত করা চাই। এই কথার আভাস বর্তমান নিবন্ধের শুরুতেই দেওয়া আছে।

যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে গাইতে শুনেছেন তাঁরা নিশ্চয় জানেন,—কথা বলার উচ্চারণের সঙ্গে গান গাইবার উচ্চারণে, রবীন্দ্রনাথের কোনো অনৈক্য ছিল না। আর সেই উচ্চারণ তাঁর বাল্য থেকে বার্ধক্য অবধি বরাবরই ছিল স্পষ্ট সতেজ ও খোলা। Crooning Voice-এ, অর্থাৎ গলাকে যথাসাধ্য কৃত্রিমভাবে খাটো করে নিয়ে কিংবা চেপে দিয়ে গান গাইবার রীতি (যা অধুনা মাইক্রোফোনের দৌলতে সর্বত্র বড় নিষ্ঠুরভাবে সংক্রামিত হয়েছে, তা) রবীন্দ্রনাথের কাছে কেন, তাঁর আশ্রম—শান্তিনিকেতনবাসী ছেলে-বুড়ো সকলেব কাছেই ছিল ঘোর নিন্দনীয়। আজকাল কোনো কোনো জায়গায় শোনা যায়,—সুস্পষ্ট সতেজ উচ্চাবণ নাকি বাংলাভাষার পেলবতা রক্ষাব বিরোধী—বিশেষত গানেব বেলায়। তবে ক্লাসিক্যাল-হিন্দী-গান ও-সব গলা ছেড়ে গাওয়া হয় বটে সেটা ঐ গানের মেজাজের সঙ্গে খাপ খায়,—কিন্তু বাংলাগান তো হিন্দী গান নয় এব মেজাজই ভিন্ন, তাই এ-গান গলা ছেড়ে গাওয়া নাকি হাস্যকর,—কখন-সখন অশোভনও ইত্যাদি ইত্যাদি নানা যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পাবেন—বাঙালী গায়ক- গায়িকারাও অনেকে নিজ নিজ ঠোঁট, গাল ও গলা বুঁজে গান কবার পক্ষপাতী, তাঁদের মতে এভাবে গান করার রীতি নাকি রবীন্দ্রসঙ্গীতেরই মাধ্যমে প্রবর্তিত* !! কাজেই উক্ত কাল্পনিক বীতি অনুযায়ী গড়ে তোলা মৃদুকণ্ঠে যখন এঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত কোনো বড় আসরে পবিবেশন করতে বসেন, এঁদের কণ্ঠস্বর কিছুতেই বেশিদূর পর্যন্ত ছড়াতে পারে না—গলা বুঁজে গান করার দরুন বহু গান এঁদের জমেও না,—যথোপযুক্ত প্রাণবান করে তুলতে পারেন না এঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতকে। সামনে

রবীন্দ্রসঙ্গীত কেন জমে না, আসরে যদি থাকে হিন্দী গান।

---

*এই সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ধারণা,—এইটে শুধু আজকাল বলে নয় রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়ও, এক শ্রেণীর লোকেরা যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানের কণ্ঠ কখনো কোনো সুযোগেই শোনেন নি, শুনবার চেষ্টাও করেন নি—বিশেষ করে তাঁরাই এইভাবে গান গেয়ে গেয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের উচ্চারণের, তথা গায়নভঙ্গীর অপপ্রচার করতেন—বিনিময়ে অনভিজ্ঞদের সামনে বাহাদুর সাজবার সুযোগও পেতেন কিছু-না-কিছু। এই লোভ সংবরণ করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল বৈকি। আর বর্তমানে ত রবীন্দ্রনাথ ইহজগতেই নেই,—কিন্তু সেই মনোভাবাপন্ন শ্রেণীর দলটি এখনও খোসতবিয়তে সংসারে বিরাজিত এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন; কাজেই তাঁদের নিজস্ব মনগড়া গায়নরীতিকে রবীন্দ্রনাথের বলে ব্যাপকভাবে চালিয়ে দিতে আজ বাধা কিসের। তদুপরি ঐ দল যদি ভারী হয় এবং এর পিছনে তাঁদেরই মনোমত তেমন তেমন রুচিসম্পন্ন, পৃষ্ঠপোষকেরাও থাকেন তাহলে ত এঁদের 'পোয়াবারো'। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রসঙ্গীতে উচ্চারণে কিংবা গায়নভঙ্গীতে দুর্ভাগ্যবশতঃ অদ্যাপি বিকৃতি যা কখনসখন ঘটে থাকে—তা কিন্তু ঐসব দল কিংবা দলের শিষ্য প্রশিষ্যদেরই মহানকীর্তি (!?)—এর নিরোধ কি কোন কালে সম্ভব—রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরাগীরা ভেবে দেখতে পারেন।

যদি "মাইক" না দেওয়া হয় তাহলে এঁরা বড় অসহায়। সুতরাং মাইকবিহীন আসরে এঁদের শ্রোতারাই বা কী শুনবেন ? শ্রোতারা ত ঐসব গান শুনে অনেকসময় ঝিমিয়ে পড়েন। অথচ রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু এভাবে কোনোকালেই গান করেন নি।—এই মন্তব্য এখানে বিশেষ জোর দিয়ে প্রকাশ করছি—যেহেতু তাঁকে গাইতে শুনেছি আমিই স্বকর্ণে বহুবার। গানের কথা কিংবা স্বর-ক্ষেপণের কাজে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা ছিল না গুরুদেবের কণ্ঠে,—বয়স তখন তাঁর সত্তরের কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও। তাছাড়া তাঁর গানেব অন্যতম ধারক ও প্রচারক স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের গান শেখাতেন,—তাঁকে তো কৈ গান শেখাবারকালে কোনো সময়েই কৃত্রিম উপায়ে কণ্ঠস্বর চেপে, অতি লালিত্যের দোহাই পেড়ে রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষার উচ্চারণের স্পষ্টতাকে ঢাকতে শুনি নি,—বরং তাঁর শিক্ষাদান-পদ্ধতি ছিল এত অধিক প্রাণস্ফূর্ত যে নানা দেশের নানা ভাষাভাষী শিক্ষার্থীরা পর্যন্ত তাঁর সামনে সানন্দে সজাগ থাকতেন সারাক্ষণ,—গানাভ্যাস চলতো সুষ্ঠু সাবলীল পরিবেষ্টনে, সেখানে কেউ নিদ্রালু হয়ে অমনোযোগী হবার সুযোগ পেতেন না মোটেই ;—অর্থাৎ দিনেন্দ্রনাথের গান শুনে কোনো শ্রোতাই ঝিমিয়ে পড়তেন না কখনও। তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত অতি সামান্য কয়খানিই গ্রামোফোন-রেকর্ডে ধরা আছে মাত্র,—সেগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে দিনেন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ ও সজীব স্নিগ্ধ মার্জিত গায়নভঙ্গীটুকু ইচ্ছা করলে আজও যে-কোনো জ্ঞানার্থী প্রত্যক্ষ করতে পাবেন। ঐ-সব গান শুনলে শ্রোতাদেরও এ-ধারণা পরিষ্কার হবার সম্ভাবনা, যে, কোনো-কোনো বাঙালী গায়ক-গায়িকা—যাঁরা ঠোঁট, গাল ও গলা বুঁজে গান করতে ভালোবাসেন—তাঁদের এই বিশেষরকমের ভালোবাসার জন্যে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' একটুও দায়ী নয়।—কিন্তু আমাদের আসল কথা হচ্ছিল, স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গাওয়া নিয়ে।—তাঁর গাওয়া গান শুনে কি কেউ কখনও কোথাও ঝিমিয়ে পড়েছেন বলে জানা যায় ?

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গান শুনে প্রত্যক্ষ শ্রোতা হিসাবে শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী তাঁর ১৯০৮ সালের এক বিবৃতিতে বলেছেন : "ষ্টেশন হইতে নামিয়াই শুনিলাম কবি গাহিতেছেন, 'তুমি আপনি জাগাও মোরে'। কী শক্তিই তাঁহার কণ্ঠে ছিল! শান্তিনিকেতনে তাঁহার দেহলী নামক গৃহের দোতলায় দাঁড়াইয়া তিনি গাহিতেছেন আর বোলপুরে তাহা শুনা যাইতেছে। অবশ্য তখন বোলপুরের পথ বড় নির্জন ও শান্ত ছিল" —(রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ ১৩৭৪ কার্তিক)।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন তাঁর "জোড়াসাঁকোর ধারে" নামীয় গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায় "হ্যাঁ, গান হত ও-বাড়িতে, তেতলার ছাদে নতুন কাকিমার ঘরে। একদিকে জ্যোতিকাকামশায় পিয়ানো বাজাচ্ছেন, আর এদিকে রবিকা গাইছেন। সেই অল্প বয়সের রবিকার গলা,—সে যেমন সুর তেমনি গান। মাত করে দিতেন চারদিক।"

কবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গান এবং আবৃত্তি শুনে ১৮৯১ সালের ৩০ জানুয়ারী তারিখ-

চিহ্নিত কোনো এক পত্রে সিস্টার নিবেদিতা জানাচ্ছেন: "On Saturday also I had a sort of unarranged party*...It was quite a brilliant little gathering —for Mr. Tagore sang three of his own compositions in a lovely tener." অপরাংশে আবার লিখেছেন: "At this moment the evensong gongs and bells are sounding in the hours all round me. It is the hour that they call 'Candlelight'—the hour of worship. I cannot forget the lovely poem 'Come O Peace' (Esho Shanti)—with its plaintive minor air that Mr. Tagore composed and sang for us the otherday at this time."—(দেশ, ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৪)।

শ্রীসুখরঞ্জন রায় মহাশয় লিখেছেন তাঁর 'রবীন্দ্র-স্মরণে' নামীয় অভিভাষণে: "কলকাতায় বি-এ পড়তে গেলাম ১৯০৭-এ, রবীন্দ্রনাথকে দেখলুম সভা বসবার আগেই।...মেঝেতে [পাতা] একই ফরাসে তাঁর থেকে পাঁচ-ছয় হাত দূরে বসে তাঁর প্রবন্ধ পাঠ শুনলুম।...পড়বার এবং উচ্চারণের সে কি ভঙ্গী! প্রতিটি কথায় পাঠকের চিত্ত উদ্ঘাটিত হয়ে বেরিয়ে আসছিল। প্রবন্ধপাঠক রবীন্দ্রনাথের রূপ দেখলুম।" এর পরেও অন্যত্র আবার বলেছেন: "মনে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে প্রসিদ্ধ ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ বাদ্যে-কসরত দেখিয়েছিলেন, সেই সভায় সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সভাপতির বক্তৃতার পর বেদীর উপর যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলে কবিকে ধরে বসলেন গান গাইবার জন্যে। কবি আপত্তি জানালেন। সকলে জিদ করতে লাগলেন। কবির আপত্তি প্রবল হতে প্রবলতর হতে লাগলো। তিনি বললেন, 'শরীর ক্লান্ত, পূর্বের স্বরও আর নেই, তাছাড়া এই ওস্তাদের কাছে মুখ খুলতে আমি কিছুতেই রাজী নই।' যাঁরা জিদ করছিলেন তাঁদের মধ্যে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রধান। তিনি নানাভাবে কবিকে অনুরোধ উপরোধ করতে লাগলেন। কবি কিছুতেই রাজী হন না। শেষে গুরুদাসবাবু বলে ফেললেন,—বেদীর খুব নিকটেই বসেছিলুম বলে স্পষ্ট শুনলুম,—'ভাল গাইতে পারেন বলে আপনার অহংকার আছে, সেই অহংকারে পাছে কোন দিক দিয়ে ঘা লাগে তাই গাইতে চাচ্ছেন না'। তখন আর রবীন্দ্রনাথ না গেয়ে পারলেন না। প্রথম হারমোনিয়ম নিয়ে চেষ্টা করে পরে শুধু গলাতেই গাইলেন তাঁর বিখ্যাত গান 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুনী, আমি অবাক হয়ে শুনি'।...সমস্ত হল ভর্তি শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর আশ্চর্য মায়াজাল বিস্তার করেছিল কবির কণ্ঠ, এমন অপরূপ সময়োচিত ভাবে বিকশিত হয়ে" —(রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ ১৩৭২ বৈশাখ)।

কবিকে গান গাইতে শুনেছেন যাঁরা তাঁদের কিছু-কিছু বিবৃতি

* নিবেদিতা-লিখিত এই পত্রটি সম্পূর্ণ পড়লে জানা যায়, উল্লিখিত পার্টিতে কবি রবীন্দ্রনাথ এবং স্বামী বিবেকানন্দ উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। এবং ঐ স্মরণীয় দিনটা হল: ২৭ জানুয়ারী ১৮৯৯, শনিবার।

কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : "আমরা একটি গান গাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া হারমোনি-ফ্লুট রবীন্দ্রনাথের সমক্ষে রাখিলাম। তিনি বলিলেন তিনি কোনও যন্ত্রের সঙ্গে গান গাইতে ভালবাসেন না ; কারণ যন্ত্রে গলার মাধুর্য্য ঢাকিয়া ফেলে। তিনি একটিমাত্র পর্দ্দা কিছুক্ষণ টিপিয়া, সুরটিমাত্র স্থির করিয়া, যন্ত্র ছাড়িলেন। তাহার পর পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া, একটি নূতন কীর্ত্তনের গান রচনা করিয়া আনিয়াছেন বলিয়া উহা গাইতে লাগিলেন।···আমি এমন সুন্দর গান অতি অল্পই শুনিয়াছি। একে এই সুললিত রচনা, অপূর্ব কবিত্ব ও প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাস, তাহাতে রবিবাবুর কামিনী-লাঞ্ছিত বংশী-বিনন্দিত মধুর কণ্ঠ। আমার বোধ হইতে লাগিল কণ্ঠ একবার গৃহ পূর্ণ করিয়া, গৃহের ছাদ ভিন্ন করিয়া, আকাশ মুখরিত করিতেছে। ···গীত শুনিতে শুনিতে আমি আত্মহারা হইলাম। আমার কঠোর হৃদয়ও গলিল ; আমার নেত্র ছল-ছল করিতে লাগিল"—(আমার জীবন ৪র্থ ভাগ, পৃ ২৭০)।

সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) মহাশয় তাঁর 'পূর্ব-স্মৃতি'তে লিখেছেন : "রবীন্দ্রনাথ দিন ৪।৫-এর জন্য আমাদের কৃষ্ণনগরের বাড়িতে আসেন। সেখানেই তাঁর গান আমি প্রথম শুনি। গলা ছিল তাঁর আশ্চর্য। অথচ তাঁর গান একেবারে তানবর্জিত। আমার হিন্দীগানে-অভ্যস্ত কানে তাঁর গান যেন কেমন-কেমন লাগল। তারপব কলকাতায়··· রবীন্দ্রনাথ বন্ধু-হিসাবে আমাদের বাসায় প্রায় প্রত্যহই আসতেন এবং প্রত্যহই তাঁব স্বরচিত গান শুনতুম। তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলীও সঙ্গে আসতেন। তিনি হারমোনিয়মে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গত করতেন"—(গীতবিতান-বার্ষিকী ১৩৫০)।

এই সম্বন্ধে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর অভিমত : "কবি ভগবদ্দত্ত সুকণ্ঠেব অধিকাবী ছিলেন।···প্রথম বয়সে তিনি মধ্যমে, বা পঞ্চমে ছাড়া কখনো গান ধরতেন না এবং অবলীলাক্রমে তারা-সপ্তকের 'নি' পর্যন্ত গলা চড়াতে পারতেন ; যদিও সাধারণতঃ আমাদের গানে দেড় সপ্তকের বেশী লাগে না। যাঁরা সেকালে তাঁর 'অনন্তসাগর মাঝে' বাগেশ্রীর গান শুনেছেন, তাঁরাই আমার কথা সমর্থন করবেন"—(রবীন্দ্রপরিচয়সভা-কর্তৃক প্রকাশিত 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' পৃ ৪০)। আবার তিনি লিখেছেন তাঁর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থে : "রবীন্দ্রনাথ যখন ঐ সাজে বাল্মীকিরূপে তাঁর সেই সুকণ্ঠে তারসপ্তকে অভিনয়পূর্বক রামপ্রসাদী সুরে 'শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা' গাইতেন, তখন যে সেখানে কী অপরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি হত—তা যারা না দেখেছে না শুনেছে তাদের বলে বোঝানো শক্ত।"

১৯২৮ সালে বিখ্যাত গায়িকা ক্লারা বাট্ শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তখন কবিগুরুকে তাঁর গান শোনাবার ব্যবস্থা করা হয় সেখানকার সিংহসদনে। সুকণ্ঠের জন্যে উক্ত Clara Butt (১৮৭৩-১৯৩৬) তৎকালে আন্তর্জাতিক যশমণ্ডিতা। তাঁর গান শুনে এবং তাঁর বিশেষ অনুরোধে স্বয়ং কবিগুরুও তাঁকে গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন। এসবের বিস্তারিত বর্ণনা ক্লারা বাট্ শেষে লিখেছেন 'My life of Song' গ্রন্থে।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'রবীন্দ্রজীবনী'-৩য়খণ্ডে এর প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। সেই উদ্ধৃতি থেকেই আমার বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের প্রয়োজনাংশ মাত্র এখানে তুলে দিলাম। ক্লারা বাট্ লিখছেন : "**With me alone for an audience, and without accompaniment of any kind, he [Rabindranath] then sang two or three songs of his own composition. Rarely I have been so moved by anybody's singing as by that of the stately and venerable Poet ;—he sang with exquisite feeling, and his voice, though quite untrained, had a natural silvery sweetness.**"

ডঃ কালিদাস নাগের বাচনিক শুনেছি এবং তিনি লিখেছেনও তাঁর 'সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের ৮৪ পৃষ্ঠায় : "১৯১১ সালে অর্থাৎ ৫০ বছর বয়সেও কী গানের গলা কবির ছিল, যারা কানে না শুনেছে—শুধু পড়ে বুঝবে না।···সমবেত সঙ্গীত চলছে ছায়ানটের গম্ভীর গমকে—'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর'···হঠাৎ বেদী থেকে কবি 'কোরাস্'-নেতা দিনেন্দ্রনাথের পানে তাকালেন,—তাঁরা থেমে গেলেন ; এবং গন্ধর্বনিন্দিত কণ্ঠে কবি একা—প্রেমভক্তির রাগে গাইলেন সঞ্চারীর দুটি লাইন—

তোমায় আমায় মিলন হলে সকলি যায় খুলে,
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।

সমস্ত প্রাঙ্গণ ভরে গেল তাঁর একক কীর্তনে। সেই সুর···জীবনে ভোলা সম্ভব নয়।"

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁব স্মৃতিচারণে বলেছেন : "বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্'-এ বাবা সুর বসিয়েছিলেন। কংগ্রেস অধিবেশনের আরম্ভে বাবা একা এই গানটি গাইলেন,—সরলাদিদি সঙ্গে অর্গান বাজিয়েছিলেন। তখন মাইক প্রভৃতি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। বাবার গলা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই প্যাণ্ডালের বিপুল জনতার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পরিষ্কার শোনা গিয়েছিল"—(পিতৃস্মৃতি, পৃ ২৫)।

এই 'বন্দেমাতরম' গান রবীন্দ্রনাথ বিশ শতকের গোড়ায় তাঁর অন্যতম বন্ধু মিষ্টার এইচ. বসুর সাহায্যে রেকর্ডেও গেয়েছিলেন,—এর পৃথক আলোচনায় আমরা আসব পরে যথাস্থলে। তবে সেই রেকর্ডের নাম, তালিকাভুক্ত হয়ে, এক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে,—তার মধ্যেও কবিকণ্ঠের বর্ণনা পাওয়া যায় এইভাবে :

"স্বনামধন্য কবিকুলশ্রেষ্ঠ সুকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথের আর কি পরিচয় দিব? বঙ্গের গৃহে গৃহে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই রবিবাবুর সর্বতোমুখী প্রতিভা ও যশোরাশির বিষয় সম্যক অবগত আছেন। কোন সভায় বা সাধারণ উৎসবক্ষেত্রে তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতলহরী শ্রবণ করিবার আশায় লোকে এককালে উন্মত্ত হইয়া ছুটিত। আমরা যে সেই রবীন্দ্রনাথের কলকণ্ঠ রেকর্ড করিয়া চিরস্থায়ী করিতে পারিয়াছি এই আমাদের পরম সৌভাগ্য। তাঁহার কণ্ঠস্বর গৃহে বসিয়া শুনিতে কাহার না লালসা হয়!"—

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ বৈশাখ ১৩৭৩)

এতেক উদ্ধৃত বর্ণনা কয়টি অঙ্কের হিসাব নিয়ে পর্যালোচনা করলে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম তখন সম্ভবত পঞ্চাশের ভিতরে। শোনা যায় ঐ বয়সের পরে তাঁর গানের গলা আর ঠিক আগের মত ছিল না।

কবিগুরু নিজেও শেষ বয়সে আপশোষ করে প্রায় সবার কাছেই বলতেন: "আমার অল্প বয়সের সে-গলা আর নেই, তোমাদের এখন আর কী শোনাব? পেয়েছিলুম বটে একটা গলার মত গলা!...তখন মধ্যমে ধরে ছেড়ে দিতুম সুর, পাখির মত সে উড়ে চলত—সুরের ধাপে-ধাপে, পর্দায়-পর্দায়"—(গীতবিতান-বার্ষিকী ১৩৫০ পৃ ৪৬)।

উপরে নেওয়া উক্তিগুলির যাথার্থ্য আমরা আজও অনায়াসে বিচার করতে পারি পরবর্তীকালে গ্রামোফোন-রেকর্ডে প্রচারিত কবিকণ্ঠের আবৃত্তি এবং গান কয়টি শুনলে পর* (এই রেকর্ড শোনার মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট গীতশিল্পীরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার সঠিক গায়কি সম্পর্কেও যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের সুযোগ পাবেন—তাতে কোন সন্দেহ নেই)। অবশ্য সেগুলি যখন তৈরি হয় তখন কবির বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। তা যাক—ক্ষতি কি? বরং এর দ্বার', যা নিয়ে আলোচনায় বসেছি তা যাচাই করার অনেকটা সুবিধা হচ্ছে আমাদের, এবং আমরা আবো বিস্মিত হচ্ছি এই ভেবে যে, এত বয়স হয়েছিল তবু কৈ,—তাঁর বাচন কিংবা গায়নভঙ্গীতে ত বিন্দুমাত্র চিড় পড়েনি, তাঁর কণ্ঠস্বরও ত বোঁজা কিংবা নিস্তেজ নয়! এটা কী করে হল?—তাঁর সাধনার ভিতটা সাচ্চা দৃঢ় ও পাকা ছিল বলেই ত। তাছাড়া বার্দ্ধক্য লাভের আগে তাঁর গলা যে যথার্থই কত বেশি শক্তিশালী ছিল এবং স্বরক্ষেপণের শাস্ত্রসম্মত রীতিনীতি সম্পর্কেও যে তিনি বেশ সচেতন ছিলেন সেটাও স্বচ্ছন্দে অনুভব করা যায়।

সৌভাগ্যবশতঃ কবিকণ্ঠের রেকর্ড আজকাল খুব দুষ্প্রাপ্য নয়,—জিজ্ঞাসুরা সেগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে শুনুন এবং মিলিয়ে দেখুন আমার এই সম্পর্কীয় বিনীত বিশ্লেষণটুকু: কবির রসনাপ্রসূত প্রতিটি বাক্যের প্রতিটি শব্দ কেমন জড়তাশূন্য, স্পষ্ট-উচ্চারিত।

কবিকণ্ঠ

এমন কি, একটি শব্দের মধ্যে, কিংবা একাধিক শব্দের শেষে বিরাম-চিহ্নগুলি এতই সুস্পষ্টরূপেতে শ্রোতার কানে দাগ কেটে দিয়ে যায় যে, এর ভিতরকার অক্ষরগুলি পর্যন্ত বুঝে নিতে কারুর কোনো অসুবিধা হয় না। কবিগুরুর কণ্ঠ স্বভাবত ঈষৎ মিহি তথা সরু বলে প্রতীয়মান হলেও বস্তুতপক্ষে সেটা ছিল sharp (বাংলায় 'তীব্র' বা তীক্ষ্ণ বলা চলে কি?) এবং পৌরুষের দৃপ্ততায় সবল ও উজ্জ্বল। কণ্ঠের এই sharpness কিন্তু তাঁর উচ্চারণকে নীরস বা রুক্ষ করেনি,—করেছে সজীব ও বিশিষ্ট। যদিও এসব ধ্বনিতত্ত্ববিদ্‌দেরই গবেষণার বিষয়

* গ্রামোফোন-রেকর্ডে কবিগুরুর স্বকণ্ঠে গাওয়া গান: অন্ধজনে দেহো আলো। আমি সংসারে মন দিয়েছিনু। আমারে কে নিবি ভাই। আমার শেষ-পারানির কড়ি। তবু মনে রেখো। আমার পরান লয়ে কী খেলা খেলাবে। ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ। প্রভৃতি—

এবং ভাষায় সঠিকভাবে প্রকাশ করাও দুঃসাহসের কাজ,—তবু কবির স্বরক্ষেপণের এই বৈশিষ্ট্যটুকু যা বললাম তা যদি কেউ সামান্য মন দিয়ে অনুধাবন করেন তাহলে অমনিতেই বুঝতে পারবেন,—কবিগুরুর গান এবং আবৃত্তির মধ্যে প্রতিটি শব্দও কিন্তু বেশ ছাড়া-ছাড়া ভাবে উচ্চারিত। অর্থাৎ দুটি পৃথক শব্দ গায়ে গায়ে জড়িয়ে আমরা অনেকে যেমন অনেক সময় কথাকে দ্রুত সংক্ষিপ্ত ভাবে সেরে নেবার অছিলায় কিংবা অঞ্চলগত অভ্যাস হেতু নিজের অজান্তেই অস্পষ্ট করে তুলি—সেটা তিনি কখনও করেন নি। এই কাজেতে তাঁর সূক্ষ্ম চেতনাবোধই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর বাচন এবং গায়ন ভঙ্গীকে অমলিন করে রেখেছিল। সোজাকথায়, বিভিন্ন স্বরবর্ণের এবং ব্যঞ্জনবর্ণের যে বিশেষ বিশেষ ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য বর্তমান—তা তিনি দীর্ঘ সাধনার পরিণতিতে স্বীয় কণ্ঠে সহজ সুন্দর সাবলীল ও স্থায়ী করে তুলেছিলেন—কী গানে, কী কথোপকথনে, কী বক্তৃতায়।

এই প্রবন্ধের প্রায় সর্বত্রই বোঝাতে চেষ্টা করেছি, রবীন্দ্রনাথের নিজের উচ্চারণ ছিল স্বাভাবিক এবং খোলা,—কৃত্রিম কিংবা চাপা নয় কখন-ও। কাজেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গায়ক ও সাধকদের উচ্চারণও যাতে কৃত্রিম না হয়ে স্বাভাবিক হতে পারে সেদিকেই প্রত্যেকের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আর এটা শুধু শুধু বাংলা কিংবা রবীন্দ্রনাথের গানের বেলায়ই বা বলি কেন;—বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী, মরাঠী, তেলেগু, তামিল, উর্দু-পারসী, ইংরেজী প্রভৃতি আমাদের জানা অজানা যে-কোনো ভাষায় রচিত যাবতীয় সঙ্গীতের উচ্চারণই তো স্বাভাবিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তবে এখানে একটু বলবার আছে,—স্বাভাবিকতা ত কখনও জোরজবরদস্তি করে অর্জিত হয় না, কারুর স্কন্ধেও চাপিয়ে দেওয়া যায় না—সেটা আপনা থেকেই আপন-আপন পরিবেশের মাহিমায় গড়ে ওঠে, ফুটে ওঠে,—এই কথাটা যদি আমরা বুঝি তাহলে এই উচ্চারণের ব্যাপারেও বুঝব, যে, কারুর কণ্ঠে উচ্চারিত বাক্যের সম্পূর্ণাংশ কানে শুনে-শুনেই আমরা এর মধ্যস্থিত, বানান পর্যন্ত জানি না—প্রকৃত-রূপও জানি না—এমন সব কঠিন কঠিন অজানা শব্দও অনায়াসে আয়ত্ত করে নিতে পারি, এই প্রবণতা মানবজীবনের স্বভাবজাত (অবশ্য তা অনেক পাখীদের ভিতরেও দেখা যায়)। কাজেই জোরজবরদস্তি এক্ষেত্রে বাহুল্য বৈকি। কিন্তু তবু এই যুক্তি যদি অজানা কারণবশত কখনো বা আমাদের অবধান এড়িয়ে যায় তাহলে অনেক সময় দেখতে পাই,—কোনো বাক্যের মধ্যখান থেকে বিশেষ কোনো একটা শব্দ তুলে নিয়ে একে ঘসে-মেজে জোরজবরদস্তির মাধ্যমে কারুকে শেখাতে গেলে সেখানে আমাদের হোঁচট কিছু-না-কিছু খেতেই হয়,—ফলে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়েরই কাছে এ ব্যাপারটা বেশ কৃত্রিম ও পীড়াদায়ক হয়ে পড়ে। এই শেষোক্ত রীতিতে শিক্ষালব্ধ উচ্চারণের পরিণতি যে কী হতে পারে তা হাতে-কলমে বিচার করার জন্যে সামান্য

কয়টি উদাহরণ এখানে নীচে তুলে দিচ্ছি। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই যদি ধ'রে ধ'রে শেখানো হয় :

'এত কামনা'-স্থলে	অ্যাত কামনা	—[স্ববিতান-৫৬ (১৯৫৮) পৃ ৪০]
'সত্য রূপ'--স্থলে	সৎত রূপ	—[স্বরবিতান-৫৬ (১৯৫৮) পৃ ৪৩]
'রাত্রি শেষে'-স্থলে	রাৎত্রি শেষে	—[স্বরবিতান ৪০ (১৩৬১) পৃ ২৩]
'ধন্য হল'-স্থলে	ধন্‌ন্ হল	—[স্ববিতান-৪০ (১৩৬১) পৃ ২৯]
'নিত্য সভা'-স্থলে	নিত্‌ত সভা	—[গীতিচর্চা ২ (১৯৬৩) পৃ ২]
'লক্ষ প্রদীপ'-স্থলে	লোক্‌খ প্রদীপ	—[স্ববিতান-৪৩ (১৩৭২) পৃ ৫৭]
'রক্ষা করো'-স্থলে	রোক্‌খা করো	—[গীতিচর্চা-২ (১৯৬৬) পৃ ৬]
'নম্র'-স্থলে	নম্‌ম্র	—[স্বরবিতান-৪০ (১৯৬১) পৃ ৭১]
'কক্ষ'-স্থলে	কোক্‌খ	—[স্ববিতান-১৬ (১৯৬০) পৃ ১১৭]
'নেত্র'-স্থলে	নেতত্র	—[স্ববিতান-৪৬ (১৯৬৩) পৃ ২০]
'অর্ঘ্য'-স্থলে	অরৃর্ঘ	—[স্ববিতান-৪৭ (১৯৬৩) পৃ ৯৯]
'পাত্রে'-স্থলে	পাৎত্রে	—[স্ববিতান-৪৩ (১৩৭২) পৃ ১৫]
'সতীত্ব' স্থলে	সতীৎত	—[স্ববিতান-৫১ (১৩৬৯) পৃ ৫৫]

তাহলে কি উচ্চাবণ শিখবাব এই পদ্ধতিটা স্বাভাবিকতা লাভেব সহায়ক ? আবাব সঙ্গে সঙ্গে মনেব মধ্যে এ প্রশ্নও জাগে,—এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হবাব আগে পর্যন্ত বাঙালীবা যে ভাবে উচ্চাবণ কবে এসেছেন—তা কী সবই ভুল ?

আমি কিন্তু বিশ্বভাবতী-প্রকাশিত স্বরবিতানে কি গীতিচর্চায, বিশেষত স্বরলিপিব উদ্দেশে দেওয়া উক্ত নির্দেশিকাকে ভুল বলবার দুঃসাহস রাখিনে,—শুধু স্বাভাবিক উচ্চাবণকে ইচ্ছা করলে কী-ভাবে যে আমবা কৃত্রিমও করতে পাবি—এইটুকু বোঝাবার জন্যেই এই উদ্ধৃতিগুলির সংকলন কবলাম। বলা বাহুল্য যে,—এই ধরনেরই সব প্রকাশিত স্ববলিপি

বানানের বিশুদ্ধ রূপ-রক্ষায় ঔদাসীন্য

গ্রন্থগুলির সাহায্যে যখন সঙ্গীতশিক্ষকেবা তাদেব ছাত্রছাত্রীদেব ববীন্দ্রসঙ্গীত-উচ্চারণেব তালিম দেন, তখন তাদের নিজ-নিজ জানা স্বভাবসিদ্ধ ভালো সুন্দর উচ্চারণটিকে বাধ্য হয়ে উক্ত রীতি অনুসারেই কৃত্রিম করতে হয় বৈকি! আবার অন্য দিকে,—যেহেতু স্বরলিপি-গ্রন্থগুলি বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত সুতবাং এর পশ্চাতে হয়ত বা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই এই সম্পর্কিত কোনো অজানা নির্দেশ আছে—এমনতর ভ্রান্ত ধারণাও অনেক স্বরলিপি-পাঠকের পক্ষে সরল মনে পোষণ করে নেওয়া খুব অসম্ভব কিছু নয়। তাই প্রসঙ্গত জেনে রাখা ভাল যে, উচ্চারণ শিখবার এই অভিনব পদ্ধতিটির উদ্‌ভাবন ঘটেছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অনেক কাল পরে। তবে হ্যাঁ, কৃত্রিমতাপ্রিয় তর্কবিলাসী পণ্ডিতজনেরা এর সপক্ষে-বিপক্ষে অনেক কিছু বলার

সুযোগ পাবেন,—তাহলেও এটা ঠিক যে, এই রীতিতে উচ্চারণ শিখলে "তুমি কেমন আছ" এই বাক্যটার লিখিতরূপ ভবিষ্যতে গিয়ে অনেকটা দাঁড়াবে: "তুঁম্মি কেঁম্যোন্ আচো।" কারণ, লক্ষ্য করে দেখুন 'তুমি' এবং 'কেমন' বলতে গিয়ে 'ম' অক্ষরটি কিন্তু আমরা কেউই যথাযথ উচ্চারণ করিনে। সেটা কি আমরা পারিনা বলে? না,—কথা বলার ধরনটাই হল আমাদের এই। এই ধরনটারই আরেক দৃষ্টান্ত, 'আমরা আজ ঠিক চারটায় বাবা মাকে নিয়ে যাচ্ছি বড়দির বাড়ি, তোমরাও পারলে চলে এসো সেখানে'—এই অনুরোধটুকু কাগজে-কলমে লিখতে বসলে কিন্তু লিখতে হবে: 'আম্রাজ ঠিক্ চাট্টায় বাওয়ামাকে নিয়ে জাচ্চি বর্দির্বাড়ি, তুম্রায়ো পাল্লে চলেঁসো সেখানে'—দেখুন ত এবার বাঙালীদের বহু পরিচিত শব্দগুলির কী দুরবস্থা! এখানে মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথই একদিন বলেছিলেন: "বাঙালীর উচ্চারণ-অনুসারে 'মহাভারতের কথা' লিখতে গেলে লিখতে হয় 'মহাভারতের্কথা'—তেমনি 'কাশীরামদাস কহে' লেখা উচিত 'কাশীবামদাস্কহে' "—এইভাবে আবো কত কি! সবাই জানেন, আমরা লিখি এক,—কিন্তু পড়ি 'অ্যাক্'। এখন এই 'অ্যাক'ও যদি একদিন লিখিতরূপ নেয় তাহলে ভবিষ্যৎ-পরিণতিতে, এর পঠিতরূপ কী আর পরিপূর্ণরূপে বিশৃঙ্খলামুক্ত অবস্থায় থাকার সম্ভাবনা আছে?—যেমন, এতৎসঙ্গীয় পূর্ববর্ণিত তালিকায়ই মন দিলে দেখতে পাবেন—ধন্য হয়েছে 'ধন্‌হ্', নেত্র হল 'নেতত্র,' অর্ঘ্য বদলে গিয়ে 'অরঘ' ইত্যাদি। তদুপরি বাঙালীদের আটপৌরে নিতান্ত স্পষ্ট সহজ শব্দ 'সতীত্ব-কে' যখন বানানো হয় 'সতীৎত', কিংবা রক্ষা-কে 'রোকখা' কিংবা কক্ষ-কে 'কোকখ'—তখন সতীৎত, রোকখা, কোকখ প্রভৃতি এমনতর আয়াসলব্ধ উচ্চারণ মাফিক কোনো বাংলা শব্দ সত্যিসত্যি বাংলা-ভাষার অভিধানে আছে কি না—সেটাও তো স্বভাবত হয়ে দাঁড়ায় এক কঠিন গবেষণার বিষয়! কাজেই দেখা যাচ্ছে, বানানের বিশুদ্ধ রূপ-রক্ষার প্রতি উদাসীন অমনোযোগী হয়ে এই পথে চলে সঙ্গীতে উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য-চর্চার স্পৃহা যদিও মনে জাগে কখনও—তাহলে উপরে বিশ্লেষিত রীতিতে পা খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটার দুর্গতি কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই এসে পড়ে অনেকের অদৃষ্টে। তবে নাকি পা খুঁড়িয়ে চলার মধ্যেও সুখ খোঁজেন এ বিরাট সংসারে এমনতর সুখ-সন্ধানীদেরও অভাব নেই,—তাদের নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র অবশ্য স্বতন্ত্র। আর এ অভিজ্ঞতাও অনেকের থাকা সম্ভব, যে, প্রত্যেকের মুখের কথার আওয়াজগুলি হুবহু সেইভাবে লেখায় আনবার চেষ্টা করলে চেষ্টাকারীকে উপরোক্ত রকমের ফ্যাসাদে পড়তেই হয়,—এই মন্তব্যের ইঙ্গিত খানিক আগেও পাঠকরা পেয়ে থাকবেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর কবিতার বহুস্থলে,—ছন্দে মাধুর্য রক্ষার খাতিরে যুক্তাক্ষর বর্জন করেছেন, এবং কবিতায় যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর স্বরূপ গণ্য করতে গিয়ে তিনি অনেক জায়গায় অনেক কৈফিয়ৎও দিয়েছেন—এসব অবশ্য প্রায়শঃ

আমাদের নজরে আসে। তাই বলে কোনো নিয়মনিষ্ঠাকে কি তিনি খামখেয়ালির বশে বিসর্জন দিয়েছেন কখনও ?—সেদিককার খবরও প্রসঙ্গত আমাদের জেনে নিতে হবে—অন্যের ভাষ্যের দ্বারা নয়, নিজের নিজের যত্ন, অধ্যবসায় এবং পর্যাপ্ত অনুশীলনের দ্বারা। কবিগুরুর আপন বৈশিষ্ট্যময় পারিবারিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আবেষ্টনকে নিয়ত চোখের সামনে উজ্জ্বলভাবে ধরে রেখে নিজেদের পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করতে জানলে আমরা অমনিতেই বুঝতে পারব,—বিশেষত যাঁদের মধ্যে অক্ষর উচ্চারণের শুদ্ধতা নিয়ে আদপেই কোনো উদ্বেগ নেই- তাঁদের মধ্যে যদি আবার কোনোক্রমে বানান-বিকৃতির ব্যাধিও ঘটানো যায় তাহলে উচ্চারণে বিশুদ্ধতা আনবার প্রচেষ্টাকে সেক্ষেত্রে কি গোড়া কেটে গাছের আগায় জল সেচনের অনুরূপ হয়ে দাঁড়ায় না ? অবশ্যি সর্বাবস্থাতে এও মনে রাখা আবশ্যক,—সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণের পরিবর্তন যেমন ঘটে আসছে চিরকাল চিরন্তন ধারায় সকল দেশে ; তেমনি তার পিছনে উত্তরাধিকারসূত্রে একাত্ম হয়ে লেগে থাকে আবার উচ্চারণকারীদের নিজস্ব অঞ্চলগত শিক্ষালব্ধ দোষগুণের অফুরন্ত প্রভাব— স্বাতন্ত্র্যবোধসম্পন্ন মানবজাতির প্রধান গৌরবময় characteristic হিসাবে। এসব কথা নিয়ে আরো আলোচনা হয়ে গেছে ইতোমধ্যে, তাই তা পুনরুল্লেখে বিরত হলাম।

গোড়া কেটে আগায় জল

তবে আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে,—প্রাচীনের পরিবর্তনে এবং অপভ্রংশতেই যেন যা-কিছু নূতনের সৃষ্টি ! হ'লই বা নূতন—তাই বলে আমাদের বর্তমান আলোচ্য সঙ্গীতানুশীলনের ক্রিয়াকলাপের ভিতর—কথা, শব্দ তথা অক্ষরাদি উচ্চারণের ক্ষেত্রেও কি আমরা চোখ-কান বুজে এমনতর অপভ্রষ্টতাকে উন্নতির সোপান বলে মেনে নেব ? বিশেষত এই প্রশ্নটির জবাব খুঁজতে গিয়ে সবিনয়ে বলতে চাই,—আমাদের ব্যবহার্য শব্দের মধ্যে ব্যাকরণরীতিসম্মত প্রচুর অর্থপূর্ণ মূল অক্ষর সমূহ এবং তৎসঙ্গীয় অতি দরকারী সাংকেতিক চিহ্নাদি পালটে দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলগত phonetics মতে অক্ষরকে লিখিতভাবে সাজিয়ে-সাজিয়ে (অর্থাৎ phonetics মতে অক্ষর সাজিয়ে শব্দ লিখবারও তো একটা বিশেষ শ্রদ্ধেয় রীতিনীতি আছে যা পৃথকভাবে অতি অবশ্য শিক্ষাসাপেক্ষ,—সেই শিক্ষাকে নিছক খামখেয়ালীর তাড়নায় একদম উপেক্ষা করে) সোজা কথায়, বানানের বিশুদ্ধ রূপটিকে ক্ষতবিক্ষত করে নিয়ে উচ্চারণ আয়ত্ত করার অভ্যাসটি প্রচলিত হলে পরোক্ষভাবে কিন্তু বিচিত্ররকমের বিকৃতিরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়—এ বিষয়টা সংশ্লিষ্ট যোগ্য ব্যক্তিরা আশাকরি অনুগ্রহপূর্বক ভেবে দেখবেন।

এখানে আমাদের বক্তব্যের মূল এই যে—কথা বলবার সময় যেমন সমগ্র sentence অর্থাৎ বাক্যটি শুনে এর মধ্যে ব্যবহৃত words তথা শব্দগুলির উচ্চারণ আমরা শিখি,—গান গাইবার বেলাতেও তাই হওয়া সমীচীন। অবশ্যি মৌখিক শব্দে প্রাদেশিক কিংবা আঞ্চলিক বিকৃতি থাকেই থাকে। তা-ও অনেক সময়

শুধরানো যায় ঐ সমগ্র বাক্য শুনে-শুনে এবং কোন একটি বিশেষ আদর্শ রক্ষার উপযোগী অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে সর্বক্ষণ বাস করে-করে। কিন্তু অনুকূল আবেষ্টনের কোনো সাহায্য নেব না, কোনো আদর্শের তোয়াক্কাও রাখব না—অথচ গান গাইবার বেলায় অকস্মাৎ গানের বাক্যের মাঝখান থেকে বেছে-বেছে শব্দ তুলে নিয়ে তার উচ্চারণ মেজেঘসে যদি আয়ত্ত করি, সেটা যে উপরোক্ত তালিকানুযায়ী কৃত্রিম জোড়াতালি গোছের কিছু হবে—সেকথা ত বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে আরো বিভিন্ন রকমের বাস্তব উদাহরণ দিয়ে উপরের তালিকাটির কলেবর বৃদ্ধি করতে পারতাম—সে-চেষ্টা বাদ দিয়ে* আপাততঃ এই বলে শেষ করতে চাই,—এতক্ষণ আলোচনা অনেকটাই হল বটে; কিন্তু এর দ্বারা রবীন্দ্রসঙ্গীতের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য যে কীভাবে সাধারণের মধ্যে বিবেচিত হবে তার তো কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া গেল না! সুতরাং অনেক জিজ্ঞাসু-গীতার্থীদের মনে নৈরাশ্য সৃষ্টির অবকাশও থেকে যাবার সম্ভাবনা এইটে স্বীকার করেই প্রসঙ্গত তাঁদের কাছে একটি অনুরোধ রাখছি:

রবীন্দ্রনাথের যে-গানটি গাইতে চান—সে গানটি ভাল করে পড়তেও শিখুন। এই সঙ্গে লিখতে পারার কাজ শিখলেও ভালো—এরদ্বারা নিজেকে সহজে শুধরানো যায়। কেন না, ভালো করে পড়তে জানলে লেখার মধ্যে বানানের কাজটা সাধারণত নির্ভুল হয়। অস্পষ্ট উচ্চারণের দ্বারা কারুরই পড়া ভাল হতে পারে না। কাজেই ভুল কিছু লেখার জন্যে উচ্চারণের অস্পষ্টতাই যে অনেকাংশে দায়ী—শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই বাস্তব জ্ঞান লাভেরও এক সুন্দর অবকাশ মেলে তখন।

কিন্তু যা বলছিলাম,—রবীন্দ্রনাথের গান পড়বার সময় গানের কথার মধ্যেকার অক্ষরগুলি যথাযথ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হল কি হল না—সেদিকে যদি সামান্য লক্ষ্য রাখেন, বুঝতে পারবেন,—কোনো বিশেষ আদর্শ কিংবা পদ্ধতি না-মেনে অক্ষর উচ্চারণ শেখার ফলে—মূলত এই অক্ষর উচ্চারণের ক্ষেত্রেতেই অসংখ্য গলদ জমে আছে অনেকের। এবং এই জমানো গলদ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হলে যেমন একান্ত সাধনার ও ধৈর্যের প্রয়োজন—তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চাই অনুকূল পরিবেশটুকুও। কেননা, যে কোনো সাধনার ক্রমোন্নতি নিজ নিজ পরিবেশের উপরেই বেশি নির্ভরশীল—তা তো কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। তাছাড়া অক্ষর অস্পষ্ট (superficial ভাবে) উচ্চারিত হলে আমাদের কথার মধ্যেও যে স্পষ্টতা কোনোমতেই আসতে পারে না এ-যুক্তিও নিশ্চয় সকলেই বোঝেন। প্রত্যক্ষভাবে আরো যাচাই করে দেখুন,—যা এই প্রবন্ধের

গান গাওয়া
গান পড়া
গান লেখা

*কারণ, শুধু শুধু বানানের অক্ষর পাল্‌টানোতে উচ্চারণে যে অবিকলত্ব আসে না—তা উপলব্ধি করবার উদ্দেশ্যে উক্ত তালিকায় নমুনা স্বরূপ প্রদর্শিত ঐ শব্দ কয়টিই বোধকরি এখানে যথেষ্ট। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথেরই লেখা ১৪ ভাদ্র ১৩৩৫ তারিখের এক পত্রেও আমরা জানতে পারি: "বানানের নূতন বিধি সবগুলি সুনীতিসঙ্গত নয়, তাছাড়া রীতিসঙ্গতও নয়।...উচ্চারণের বিচার—ধ্বনি দিয়ে, অক্ষর দিয়ে নয়"—(দেশ ১২ জুলাই ১৯৭৫)।

গোড়াতেই আরেকবার বলেছি, অতি সাধারণ কথাবার্তার বেলায় আমাদের বাঙালীদের বাংলা-উচ্চারণে কখনসখন যে অস্পষ্টতা দেখা দেয়—সেটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে আমরা তেমন অভ্যস্ত নই। অথচ এটা নিশ্চিতরূপে অনেকেই উপলব্ধি করেন, যে,—গানেরই কথার মধ্যে কিন্তু ঐ অস্পষ্টতা বেশিভাবে প্রকটিত হয়, সুরের বাঁধা সার্গামাদির সঙ্গে সব কথা অনেক সময় খাপ খেতে চায় না—বিশেষ করে কথাগুলি উচ্চারণের অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট হয়ে থাকে বলেই। সেই জন্যে শোনা যায় অনেক সুর-অভিজ্ঞজন অপবাদ দেন মূল বাংলা ভাষাটার* কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা সাধারণের দল এই নিয়ে কিছু চিন্তাই করি না, উপরন্তু বাংলাগানের অনুশীলনকারীরাও এর কারণ অনুসন্ধানের কাজে উৎসাহ দেখান খুবই কম। অথচ যত্ন ও সন্ধানপূর্বক যুক্তিসম্মত প্রশান্ত দৃষ্টি নিয়ে বিচারে উপস্থিত হলে দেখা যাবে,—এমনতর অপবাদ বাংলাভাষার বিরুদ্ধে সকলক্ষেত্রে সমূলক নয়। এখানে ফের বলতে হচ্ছে,—অক্ষর সমূহ নিয়ে গঠিত বাংলা শব্দগুলির উচ্চারণকে অনেক সময় অস্পষ্ট করে ফেলি আমরা অভ্যাসদোষে, যার পেছনে হেতুও আছে নানা ধরনের—একথা অবশ্য স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু শুদ্ধ অনবদ্য অক্ষরগুলিকেই বা জিভে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে আমাদের মধ্যে গাফিলতি কেন—বলুন? অক্ষর সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক রীতিতে উচ্চারণ করা শিখতে পারলে তা সুরের সঙ্গে খাপ খাবেই খাবে (বর্তমান নিবন্ধে কবি-কণ্ঠের যা সামান্য বিশ্লেষণ করার চেষ্টা নেওয়া হয়েছে তার প্রতি এবং চলন্ত প্যারাগ্রাফেরই পাদটীকায় উদ্ধৃত ৩নং মন্তব্যটির প্রতি পাঠকদের এই প্রসঙ্গে মনোযোগ আকর্ষণ করছি)। তবে প্রাক্-অর্জিত সংস্কারের বশবর্তী হয়ে আমরা অনেক সময় ভাবতে পারি, যে, কোনো-কোনো বাংলা অক্ষর বুঝি-বা সার্গমের বাঁধা সুরের অনুরূপ খুব জোরালো হয় না—সেটাও ঠিক—অন্তত তর্কের খাতিরে না মেনে উপায়

সাধনার ক্রমোন্নতি নিজ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল

* এই ক্ষেত্রে অতি অবশ্য প্রণিধানযোগ্য কতিপয় প্রাসঙ্গিক উক্তি: (১) "বঙ্গ-ভাষায় অ-কার যেরূপে উচ্চারিত হয়, তাহাতে মুখ ও কণ্ঠ যথেষ্ট প্রসারিত না হওয়াতে, স্বরোচ্চারণ তত পরিষ্কার ও সুললিত হয় না। এইজন্যই, যাঁহারা হিন্দুস্থান হইতে হিন্দীগান উত্তমরূপে অভ্যাস করিয়া আইসেন, তাঁহারা বলেন যে, বাংলা ভাষায় গান হিন্দীর ন্যায় মিষ্ট হয় না। একথা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। বাঙ্গালার স্বর সকল বোজা। —হিন্দীর স্বর সকল খোলা"—[গীতসূত্রসার, পৃ ৯০] (২) অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখেছেন: "বিশুদ্ধ সঙ্গীত শিক্ষা এবং কণ্ঠস্বর উত্তম করিতে হইলে হিন্দুস্থানী গান শিক্ষা করা উচিত এবং হিন্দীগানের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ভাষা শিক্ষা করিলে ভাল হয়" [গীত-প্রবেশিকা, পৃ ২৪] (৩) "ভাতখণ্ডেজী ছাত্রদের হাঁ করে গাইতে, দীর্ঘ আ-কারের সাহায্যে স্বর বার করতে শিক্ষা দিতেন। তাঁর শিক্ষায় কণ্ঠই স্বরের ভূমি,—নাক নয়। সত্যই তাই। কণ্ঠের শ্বাস যেমন বুক থেকে ওঠে, স্বরের বাসও তেমনি সেখান থেকে উঠবে।···আ-স্বর যত দিন না কণ্ঠে বাসা বাঁধছে, অর্থাৎ স্থিত হচ্ছে, ততক্ষণ রবীন্দ্রসঙ্গীত মুখ-স্থ করা উচিত নয়। সত্যই তো নয়ই। রবীন্দ্রনাথের গানে সব ক'টি স্বরবর্ণের প্রয়োগ করতে হয় এবং সাহিত্যের আদি অক্ষর অ-কার হলেও, সঙ্গীতের আদি অক্ষর আ-কার। আ-কার পাকা হলে তার দৌত্যে শ্রোতার সঙ্গে গায়কের সম্বন্ধ পাকা হবে। নচেৎ শ্রোতাকে কান খাড়া ও মন সজাগ রাখতে হবে—যে কাজটি প্রিয় নয়"—[বক্তব্য, পৃ ১২০]

নেই ;—তাইজন্যে ভাষাজনোচিত পেলবতার দোহাই দিয়ে একে অস্পষ্ট, মৃদু বা বিকৃত করা কখনই কারুর পক্ষে উচিত নয়, বরং সাধ্যমত প্রত্যেকেরই জীবনের প্রথম-শিক্ষার শুরু থেকে প্রচুর সুঅভ্যাসের দ্বারা স্পষ্ট, সবল এবং স্বাভাবিক করে নেওয়াই সর্বথা যুক্তিসঙ্গত। তাই বলি, বর্ণমালার তথা, প্রতিটি অক্ষরের ধ্বনি-স্বাতন্ত্র্য এড়িয়ে গিয়ে যেন-তেন উপায়ে অস্পষ্ট উচ্চারণে গান গাইবার জন্যে আগেভাগে চঞ্চল হয়ে ওঠার অভ্যাসটি কেউ আয়ত্ত করবেন না। চাঞ্চল্য হচ্ছে, গান—এমন কি অন্য যে-কোনো বিদ্যা শিখবার পথে প্রধান শত্রু। মন চঞ্চল থাকলে সেখানে একাগ্রতা আসতে পারে না। আমাদের মানবজীবনে যাবতীয় শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার মূল কারণই হল: একাগ্রতার অভাব। একাগ্রতা যার মধ্যে বেশি, সে-ই পৃথিবীতে অধিক জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। সেই হিসাবে অতীত ও বর্তমান সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তির জীবনেই একাগ্রতার বিপুল প্রভাব পাওয়া যায়। এ-সব অবশ্যি পৃথক আলোচনার বিষয়। তবে শুদ্ধ আবৃত্তি কিন্তু অনেক সময় ঐ একাগ্রতালাভের অন্যতম উপায় হয়ে থাকে। তাই এই সুযোগে অনুরোধ জানাই,—চাঞ্চল্যকে যথাশক্তিতে দমন করে গানের ভিতরের অক্ষর সংবলিত কথাগুলি আবৃত্তি করুন—দিনের পর দিন। আবশ্যক হলে মাসের পর মাস—এমন কি বছরের পর বছর চলুক না ঐ আবৃত্তিই। আবৃত্তি অবশ্য করতে হবে খুব স্বাভাবিক এবং খোলা গলায়* যাতে ধ্বনি-স্বাতন্ত্র্য অবাধে পারেন অনুভব করতে,—সেইরূপে। তাহলে একাজের সুফল নিজেই পাবেন হাতে-হাতে,—দেখবেন, জিব জড়তাশূন্য হয়ে বাক্যগুলি স্পষ্ট ও সাবলীলভাবে কণ্ঠে কী সুন্দর ধ্বনিত হচ্ছে। তা শুনে যেমন আপনি মুগ্ধ হবেন—তেমনি আপনার শ্রোতারাও। অতঃপর সেই ধ্বনিত উচ্চারণই যখন গানের ভিতরকার কথায় এবং সুরে প্রয়োগ করতে অভ্যস্ত হবেন তখন সেটাই হবে আপনার যথার্থ স্বাভাবিক উচ্চারণ। স্পষ্টতা এবং স্বাভাবিকতাই হল রবীন্দ্রসঙ্গীতের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের উচ্চারণ সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক করার জন্যে যে কত বেশি আবৃত্তি করতেন এবং সেজন্যে তাঁকে যে আয়াস স্বীকার করে সুনির্দিষ্ট রীতিনীতিও মেনে চলতে হত অনেকটা—সে ত আমরা তাঁর নিজ উক্তি থেকেই জেনেছি। অথচ পরিতাপের বিষয় এসব তথ্যের কোনো খোঁজই রাখেন না অনেকে,—রাখলেও তলিয়ে দেখেন না। ফলে নানা রকমের ভ্রান্তিতে পড়ে অনেক গায়ককে দেখা যায়, নিজেদের অর্জিত স্বাভাবিক সুন্দর উচ্চারণটিকেও তাঁরা কেমন যেন আড়ষ্ট অস্বাভাবিক করে তোলেন; অর্থাৎ কথা বলার স্বাভাবিক উচ্চারণকে পালটে অন্যের কাছ থেকে অস্বাভাবিক উপায়ে তাঁরা যে উচ্চারণটি কেবল গান গাইবার জন্যে সাময়িকভাবে গ্রহণ করেন—তাঁদের দ্বারা এর

* গলা চাপলেই সেখান থেকে কৃত্রিম ও বিকৃত স্বর বের হয়, উত্তম কণ্ঠস্বর তৈরির পথে বাধা জন্মে পদে-পদে—এই জ্ঞানটা কণ্ঠ ব্যবহারকারী কথক, গায়ক, বক্তা, অভিনেতা, আবৃত্তিকার মাত্রেরই জীবনভোর অনুভব ও শিক্ষাসাপেক্ষ। কারণ এই অভিজ্ঞতা-প্রাপ্তিযোগ এক-আধ দিনে আসে না কখনও।

প্রয়োগও ঘটে তদনুরূপ অস্বাভাবিক। কিন্তু গানে, এমন কি অভিনয়েও, সকল রকমের অস্বাভাবিকতা বর্জন এবং যতদূর সম্ভব তাকে স্বাভাবিক করা বা বিকৃত না-করার রীতিটি যে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম তাঁর স্বদেশবাসীদের মধ্যে প্রবর্তনে বিশেষ উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন—এই ইতিহাসটুকু যদি গীত-শিক্ষার্থীরা এবং সব আলোচকেরা প্রথম থেকেই সম্যক অবহিত হন, তাহলে তাঁদের কারো ভুল পথে যাবার আশংকা তেমন থাকে না—এবং এসম্পর্কিত আলোচনাটিও তাঁদের পক্ষে ক্রমশঃ সুন্দর সহজ ও বোধগম্য হয়ে ওঠে। তা নৈলে এ সমস্ত বিষয় ভাষা দিয়ে যথাযথ বোঝানো সুসাধ্য নয়;—বোঝাতে গেলেও সহজ যা, তা অনেক সময় কঠিন গোলমেলে এমনকি দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই মন্তব্য অনুধাবনের জন্যে বর্তমান প্রবন্ধের ভূমিকাটুকুর প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তবে সর্বশেষে এটুকুমাত্র সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়, যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতে উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য অভ্রান্তরূপে জানবার এবং বুঝবার সহজতম পন্থা হল,—কবিকণ্ঠ স্বকর্ণে শুনে রাখা। এবং এর প্রেক্ষিতে তাহলে আসল বক্তব্য গিয়ে দাঁড়াচ্ছে - স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ-নিঃসৃত উচ্চারণ যে-করেই হোক আমাদের সর্বতোভাবে শ্রোতব্য;—এবং সেটা যাতে অনুকরণীয় না হয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে অনুশীলনীয়-বিষয় হতে পারে – সেই দিকেও দৃষ্টি রাখা সমানভাবে অবশ্যকর্তব্য। এই বক্তব্যটুকু, বিশেষত রবীন্দ্রসঙ্গীত-চর্চার ব্যাপারে যদি সকল গীতশিল্পীরা যথারীতি উপলব্ধি করে চলতে পারেন তাহলে তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য কিংবা গায়কিকে, কখন-সখন আত্মবিস্মৃতির কবলে পড়ে, রবীন্দ্রনাথেরই বৈশিষ্ট্য কিংবা গায়কি বলে চালিয়ে দেবার কাজে আপনা থেকেই নিজেদের সচেতন এবং সংযত রাখারও যে একটা সমুচিত শিক্ষা পাবেন—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত আরো জেনে রাখতে হবে,—অন্যের বৈশিষ্ট্যকে অনুশীলন করে সে-সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায় এবং তা **assimilate** করাও সম্ভব—অবশ্য নিজের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে (যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'স্বীকরণ'), কিন্তু এর অন্ধঅনুকরণ কিংবা নকল করতে গেলেই—সেটা হয়ে দাঁড়াবে বিশুদ্ধ **caricature**!

কবিকণ্ঠ অবশ্যশ্রোতব্য

সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি

কবি রবীন্দ্রনাথও এককালে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন এদেশের রাজনীতিতে, তাঁর পিছনেও ছিল পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি—যে কারণে দেশের অনেক গণ্যমান্য রাজকর্মচারীরা, লেখাপড়া শেখাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের স্কুলে নিজের ছেলে-মেয়েদের পাঠাতে যে শুধু ভয় পেতেন তা নয়—উপর থেকেও তাঁদের প্রতি কঠোর নির্দেশ ছিল, না পাঠাবার। এটা, ১ ভারতবর্ষে সেই ব্রিটিশ আমলে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে স্বদেশীযুগের সূত্রপাত,—তখনকার ব্যাপার বলা হচ্ছে। আজ তা অনেকটা রূপকথার মত শোনায় বটে, আর বস্তুতপক্ষে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই কি আর তাঁর স্বদেশবাসীরা এ সব কথা যথোচিত

মনে রাখতে পেরেছিলেন ?—বোধকরি না। কারণ, এরও অনেক বৎসরকাল বাদে স্পষ্ট মনে পড়ে, মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় প্রবন্ধলেখক শান্তিনিকেতনের ছাত্র—তখন আশ্রমের বাইরে এলেই অনুযোগের পর অনুযোগ শুনেছি : তোমাদের গুরুদেব কেন দেশের কাজে নামছেন না ?—হেন তেন কত প্রশ্ন!—বয়স তখন অল্প, অর্বাচীন ত বটেই, তাই, ঐ-সব শুনেশুনে নিজের মনের মধ্যেই নিরুত্তর গতিতে পাল্টা প্রশ্নেরও ভিড় জমত তেমনি : হায় রে,—দেশের জাতীয় আন্দোলনের মূল উৎস যে কোথায়, এর পটভূমিব নির্মাতাই বা কে—এসব নিয়ে কি আর, অনুযোগকারীদের মধ্যে যাঁরা তখন বয়সে প্রবীন জ্ঞানী ছিলেন, তাঁরাও ভাবতেন না কিছু ?—তাঁরা কিছু ভাবুন বা না-ই ভাবুন—সেকথা এখন থাক্। কিন্তু আমাদের এই প্রসঙ্গে, এক্ষনি সবিস্তারে সম্ভব না হলেও, মোটামুটিভাবে অবশ্যি জানা দরকার :—

(স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয় বঙ্গভঙ্গের পর ১৯০৫ সালে। ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে, বলা যেতে পারে, সেই আমাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের যুগ।

কিন্তু তারও আগে আমবা কি ভাবে ছিলাম ?

"বস্তুত, সে-সময়টা স্বদেশ প্রেমেব সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূবে ঠেকাইয়া বাখিয়াছিলেন,"—রবীন্দ্রনাথের এই সামান্য উক্তিটুকুব মধ্যেই দেশেব তৎকালীন পরিস্থিতি সুস্পষ্ট আঁকা হয়ে আছে। তবে কলকাতার জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়িতে ছিল এই পরিস্থিতির লক্ষণীয় ব্যতিক্রম। সে বাড়ির পরিজনেরা শৈশবকাল থেকেই স্বদেশের জন্যে বেদনাব অনুভূতি নিয়ে বেড়ে উঠছিলেন,—একটু পিছনে তাকালে এব মূল কারণটিও বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের নামটাই ছিল, সেকালের অভিজাত মহলে ভারী রোমান্টিক। তিনি যেমন খুব বড়ো রকমের ধনী ও শৌখিন ছিলেন, তেমনি লক্ষ লক্ষ টাকা অকাতরে দান করে গেছেন দেশের মঙ্গলার্থে। সে-যুগে ভারতীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার প্রতি তাঁর অন্তরের সূক্ষ্মচেতনাবোধ, তাঁর প্রতিটি চাল-চলনে সুপরিলক্ষিত হত,—এসবের আরো পরিষ্কার বিশদ বর্ণনা আমরা পেতে পারি, যদি দেশের ও বিদেশের তৎকালীন ইতিহাস মনোযোগ সহকারে খুঁজি। বিলেতে গিয়ে সেখানকার বহু বিশিষ্ট উচ্চসম্ভ্রান্ত সমাজে বৎসরকাল কাটিয়ে এসেও দ্বারকানাথ ইংবেজের পোশাক পরে দেশে ফিরেন নি;—এমন কি সেদেশে থাকাকালীনও নিজের জাতীয় পোশাক পরিচ্ছদই ব্যবহাব করতেন—এই দৃষ্টান্ত, ছিল ঠাকুরপরিবারে সজীব, তাঁদের সবাইকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করেছে। আবার অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে স্বাদেশিকতার দীপ্ত প্রকাশের বিষয় যখন আমরা স্মরণ করি তখন, সেখানেও দেখতে পাই,—ইংরেজি ভাষা খুব ভাল করে জেনে এবং শিখেও দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু বাংলার তথা স্বীয় মাতৃভাষার উন্নতি এবং সমৃদ্ধি সম্পর্কে তাঁর

জাতীয় বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা রক্ষায় ঠাকুরপরিবার

যৌবনের সূচনা থেকেই গভীরভাবে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। স্বজাতি আত্মীয়জনের মধ্যে ইংরেজিভাষায় সাধারণ কথাবার্তা বলা কি চিঠিপত্র লেখা ত দূরের কথা—বাঙালী-সমাগত কোনো সভাসমিতিতে পর্যন্ত ইংরেজিতে বক্তৃতা দেবার বিরোধী ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। অথচ তখনকার দিনে ঐ ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়াই ছিল এদেশবাসীদের আভিজাত্য ও উচ্চশিক্ষা প্রদর্শনের অন্যতম মানদণ্ড। দেবেন্দ্রনাথ অতি সম্ভ্রান্ত অভিজাত হয়েও তা ভ্রূক্ষেপ করেন নি। (সকল বিষয়ের চর্চা মাতৃভাষায় সাধিত হোক—এই ছিল তাঁর জীবনের আকাঙ্ক্ষা।) এসবের বিবরণ যেমন অনেকের লেখাতেই পাওয়া যায়—তেমনি আছে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির পৃষ্ঠায়ও। সেখান থেকেই অংশবিশেষের উদ্ধৃতি নিচ্ছি এখানে। কবি জানাচ্ছেন: "বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। (স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ন ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।)···আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। · আমরা আপনা-আপনির মধ্যে কেহ কাহাকে এবং পারৎপক্ষে কোনো বাঙ্গালীকে ইংরাজি ভাষায় পত্র লিখি না—আমাদের এই আচরণটিকে যে বিশেষ-ভাবে লিপিবদ্ধ করিবার যোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিলাম, আশা করি, একদা অদূর ভবিষ্যতে তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত ও বিস্ময়াবহ বলিয়াই গণ্য হইবে। আমাদের পিতামহ ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে বেলগাছির বাগানে নিমন্ত্রণ করিয়া সর্বদা ভোজ দিতেন, একথা সকলেই জানেন। কিন্তু শুনিয়াছি, তিনি পিতাকে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন যে, ইংরাজকে যেন খানা দেওয়া না হয়। তাহার পর হইতে ইংরাজের সহিত সংস্রব আর আমাদের নাই, এবং পিতামহের আমল হইতে আজ পর্যন্ত সরকারের নিকট হইতে খেতাব-লোলুপতার উপসর্গ আমাদের পরিবারে দেখা দেয় নাই।···আমাদের বাড়ির সাহায্যে 'হিন্দুমেলা' বলিয়া একটি মেলা সৃষ্ট হইয়াছিল*।···ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়।"

হিন্দুমেলা

হিন্দুমেলাটির উদ্বোধন তারিখ হল ১৮৬৭ সালের ১২ই এপ্রিল। রবীন্দ্রনাথ তখন শিশুশ্রেণীর বৈকি! কলকাতার উপকণ্ঠে কোনো এক উদ্যানে বসত সেই মেলা। প্রথম কয় বৎসর, চৈত্রসংক্রান্তির দিনে মেলাটি অনুষ্ঠিত হত বলে, এর নাম ছিল 'চৈত্রমেলা'; পরে এই নাম বদলে 'হিন্দুমেলা' রাখা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, এখানে জাতীয়সংগীত কবিতাপাঠ, ক্রীড়াকৌতুক ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে

*এই মেলার পরিকল্পনাটি রাজনারায়ণ বসুর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আনুকূল্যে ৭ আগষ্ট ১৮৬৫ তারিখে প্রথম প্রকাশিত 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে ও উৎসাহে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের নিকট এই স্বদেশীমেলা অশেষ-প্রকারে ঋণী—(জীবনস্মৃতি। গ্রন্থপরিচয় পৃ ১৮৯)।

জনগণের চিত্তে দেশানুরাগ উদ্দীপিত করা। সেই মেলায় যোগ্য গুণিজনেরা পুরস্কৃতও হতেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারই ছিলেন একাজে বিশেষ উদ্যোগী—দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ—এঁরা ঐ উপলক্ষ্যে স্বদেশীগান রচনা করতেন। উল্লেখ্য, সত্যেন্দ্রনাথ-রচিত 'মিলে সবে ভারতসন্তান', গণেন্দ্রনাথ-রচিত 'লজ্জায় ভারতযশ গাইব কী করে' এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ-রচিত 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি'—এই গানগুলি হিন্দুমেলার অধিবেশনে গাওয়া হয় এবং বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে।

এই হিন্দুমেলাতেই, ১৮৭৫ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার দিন রবীন্দ্রনাথকে সর্বপ্রথম সাধারণের সমুখে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়।—ঐ বিশেষ তারিখটা আমাদের অবশ্যস্মরণীয় এইজন্যে, যে, মাত্র তেরো বৎসরের বালক রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত 'হিন্দুমেলার উপহার' শীর্ষক সুদীর্ঘ কবিতাটি স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করে উপস্থিত শ্রোতাদের সেখানে মুগ্ধ করেন।

ঠিক সেই সময় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'সঞ্জীবনীসভা' নামে আরেকটি সভা গড়ে উঠেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: "ইহা স্বাদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল।... দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি-কিছুই প্রয়োজন ছিল না"—(জীবনস্মৃতি, পৃ ৭৮)।

সঞ্জীবনী সভা

এই সম্পর্কে আরো কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য: "সভার অধ্যক্ষ ছিলেন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু। কিশোর রবীন্দ্রনাথও এই সভার সভ্য ছিলেন।...জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কার্যই এই সভায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।...আদি-ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকাগার হইতে লাল-রেশমে-জড়ানো বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুইপাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত-ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃত-ভারতে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এই ব্যাপারের ইহাই মূল কল্পনা। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্। সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র গান করার পর তবে সভার কার্য (অর্থাৎ কিনা গল্পগুজব) আরম্ভ হইত। কার্য-বিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্‌ভাবিত এক গুপ্তভাষায় লিখিত হইত"—(জীবনস্মৃতি পৃ ১১৭)।

উল্লিখিত হিন্দুমেলা এবং বিশেষ করে 'সঞ্জীবনীসভা'র ক্রিয়াকলাপ বালক রবীন্দ্রনাথকে এত বেশি অভিভূত করেছিল যে, এরই উৎসাহে তিনি বলছেন একজায়গায়,—তাঁর মনে হত তিনি যেন সর্বক্ষণ উড়ে চলেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দলের অন্যেরাও। লজ্জা ভয় সংকোচ তখন কিছুই তাঁদের ছিল না।

এমনতর পরিবেশে জাতীয়সংগীত রচনায় উদ্বুদ্ধ হলেন রবীন্দ্রনাথ, লিখলেন :

"ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি—
যতদিন সিন্ধু না ফেলিবে গ্রাসি—ততদিন তুই কাঁদ-রে।"

অন্যত্র লিখলেন আর একটা :

"তোমারি তরে, মা সঁপিনু এ দেহ। তোমারি তরে, মা, সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে, এ-বীণা তোমারই গাহিবে গান॥"

সেকালের কবিরা যে-সব জাতীয়সংগীত রচনা করতেন সেগুলির মধ্যে সাধারণত এই ভাবটাই বেশি করে দেখানো হত, যে, পরাধীনতার চাপে তাঁদের জীবনযাত্রাটা যেন ঠিক মানুষের দাবিদাওয়া অনুযায়ী সুসম্পন্ন হচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথের গানেতেও তুলনা করে দেখলে সেই একই অনুভবের ছায়া কিছু-না-কিছু পাওয়া যায় বৈকি ; তাহলেও তাঁর প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব তৎকালেই ফুটে উঠেছিল সেটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয়। এখানে আরো মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ তখন রীতিমত বালক—বয়স তাঁর ১৩'কি ১৪ মাত্র। সেই বয়সেই তিনি আরো লিখলেন :"অয়ি বিষাদিনী বীণা, আয় সখী, গা লো সেই সব পুরানো গান—"

অনুমান করা যায়,—এ গানগুলি 'সঞ্জীবনীসভা'র উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই রচিত। এই ধরনের আরো অনেক স্বদেশীগান হয়ত কবি লিখেছিলেন, কিন্তু ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়নি বলে সেগুলি প্রায় অশ্রুতই থেকে গেছে—ফলত আমরা আজ গবেষণা করে-করে সে-সব খুঁজে বের করছি। তবে ঐ সময়ের কাছাকাছি আরো যে সব গান তিনি লিখেছিলেন—তার মধ্যে "একসূত্রে বাঁধিয়াছি" গানটির নাম উল্লেখযোগ্য, যা আজকের দিনেও দেশবাসীর কণ্ঠে নূতন উদ্দীপনা নিয়ে ধ্বনিত হতে শোনা যায়—এর কথার মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার এবং সুরের মধ্যে কতক উত্তেজনার আভাস আছে বলেই বোধ করি।

সেই সময়ে উপাসনার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সব গান লিখতেন তাতেও তাঁর দেশভক্তির পরিচয় স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পেত, যেমন,—'শোনো শোনো আমাদের ব্যথা', 'একি অন্ধকার এ-ভারতভূমি', 'দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে', 'কেন চেয়ে আছ গো মা', 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' ইত্যাদি গান। এবং এগুলি প্রায় রচিত এবং গীত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে। তাছাড়া রবীন্দ্ররচিত "জনগণমন" গানটির কথা এবং সুর আজ এ-পৃথিবীর কে না জানে! এটিও উপাসনারই গান এবং পূর্ণমাত্রায় দেশাত্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত—মন দিয়ে পড়তে জানলে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। প্রথম এটি ছাপা হয় ব্রহ্মসঙ্গীত হিসাবে তৎকালীন তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায়, কবি তখন এর শিরোনাম দেন 'ভারত বিধাতা'। অবশ্য এ-গান লেখা হয়েছিল আরো কয়েক বৎসর পরে—বিশ শতকের প্রথমভাগে ;—সেটা যথাস্থলে উল্লেখ করা হবে। তার আগে উপরে

জনগণমন-অধিনায়ক

দেওয়া বর্ণনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিতভাবে নেওয়া যায়, যে, আমাদের সেই প্রথমোক্ত ১৯০৫ সালের স্বদেশী-আন্দোলন শুরু হবার অনেককাল আগে থেকেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জাতীয়সঙ্গীত রচনায় হাত দিয়েছিলেন। সেই উনবিংশ শতাব্দীতেই অর্থাৎ ১৮৯২ ? (বাং ১২৯৯) সালের ভিতরেই তাঁর রচিত বেশ কয়টি গান বিশেষ জনপ্রিয়তা নিয়ে পরবর্তী ১৯০৫, এমন কি আরো বহুকাল পরের ১৯২১ সালের জাতীয়-আন্দোলনেও গাওয়া হতে শোনা গেছে—তার এক মোটামুটি তালিকা এই :

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে ॥ আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে
আগে চল্ আগে চল্ ভাই ॥ একবার তোরা মা বলিয়া ডাক
আমায় বল না গাহিতে বল না ॥ তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ

এ গানগুলিকে কবি নিজেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সভাসমিতিতে এবং সমাজের উৎসবাদিতে গেয়ে লোকপ্রিয় করে তুলেছিলেন বলে জানা যায়। যথা, ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে যে কংগ্রেস অধিবেশন বসে কলকাতায়,—সেখানে উদ্বোধনসঙ্গীত হিসাবে কবি স্বয়ং অত্র উল্লিখিত 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি রামপ্রসাদী সুরে গেয়ে শোনান। ঐ একই বৎসরে 'আগে-চল্' এবং 'তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ' এদুটি গান গেয়েছিলেন কলকাতায় এক ছাত্রসম্মেলনে। 'আমায় বল না গাহিতে'—এ গানটি একাধিক জায়গায় বিশেষ উপলক্ষ্যেই গেয়েছেন তিনি। এর রচনাব ইতিহাসটুকু কবি তাঁর কোন এক পত্রে আমাদের জানিয়েছেন : "সে বহুদিন পূর্বের কথা। তখনকার দিনে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের অঞ্জলি তোলা ছিল বাজপ্রাসাদের দুর্গম উচ্চশিখর থেকে প্রসাদকণা বর্ষণের প্রত্যাশায়। একদা কোনো জায়গায় তাঁদের কয়েক জনের সান্ধ্যবৈঠক বসবার কথা ছিল। তাঁদের দূত ছিলেন আমার পরিচিত এক ব্যক্তি। আমাব প্রবল অসম্মতি সত্ত্বেও তিনি বারবার করে বলতে লাগলেন আমি না-গেলে আসর জমবে না। শেষ পর্যন্ত··· যেতে হল। ঠিক যাবার পূর্বক্ষণেই আমি···রচনা করেছিলেম—'আমায় বোলো না গাহিতে' ইত্যাদি। এই গান গাবার পরে আর আসর জমল না।* সভাস্থগণ খুশি হন নি"—(রবীন্দ্র রচনাবলী-১৪শ খণ্ড, পৃ ১০১৪)।

আমায় বল না
গাহিতে বল না

যাই হোক—এমনি করে গান রচনার ভিতর দিয়ে ক্রমশঃ দেশবাসীর চিত্তকে যে কী এক তীব্র স্বদেশানুভূতিতে জাগিয়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ,—সে-সবের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস এই ছোট প্রবন্ধে লিখে জানানো যায় না। শুধু ত গানে নয়, ১৯১৯ সালে পাঞ্জাব

* আসর না জমার হেতু ঐ গানের মধ্যেই স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখিত ছিল,—রথীন্দ্রনাথ উক্ত ঘটনার বিশদ বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন : "বাবা গাইলেন 'আমায় বলো না গাহিতে বলো না। একি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা-ছলনা ?'······গান শুনে সকলে স্তব্ধ। ডিনারপার্টি মাটি হয়ে গেল। মুখ বিষণ্ণ করে একে একে সবাই চলে গেলেন"—(পিতৃস্মৃতি, পৃ ১১)।

জালিয়ানওয়ালাবাগের অনাচারের প্রতিবাদে বৃটিশ-প্রদত্ত 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করে তিনি যে স্বদেশপ্রীতির জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখে গেছেন—সে খবর ত আর কারুর অজানা নেই।

কিন্তু এরও অনেক আগে ১৯০০ সালে 'বঙ্গদর্শন' কাগজে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশভক্তির মূলমন্ত্র প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন পূর্ণোদ্যমে। গানের পর গান লেখা ত তাঁর চলতই, তাছাড়া এই 'বঙ্গদর্শন'-এরই মাধ্যমে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে তিনি সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন ভারতের অতীত গৌরব, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির যাবতীয় কাহিনী। যাঁরা ছিলেন তখন পাশ্চাত্য রাজনীতির মোহগ্রস্ত শিক্ষিত দেশবাসী—তাঁদেরই শুনিয়েছিলেন নানা কথা। এ সবের সুন্দর প্রত্যক্ষ বর্ণনা পাওয়া যায় শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার-রচিত 'জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ'-শীর্ষক প্রবন্ধে—[দেশ, ৯ মে ১৯৪২], তা' থেকে কিয়দংশ প্রাসঙ্গিকবোধে এখানে উদ্ধার করছি :

"তখনকার দিনে যুবক ছাত্রসম্প্রদায়ের, রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। তাহারা সর্বপ্রকারে তাঁহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত, তাঁহার কথায় উঠিত-বসিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর সেইসময়ে বাংলার ভাব ও চিন্তাজগতের নেতৃত্ব প্রধানত রবীন্দ্রনাথই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই সভায় প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা করিতেন। সেই সমস্ত সভায় এত ভীড় হইত যে, বহুলোককে হতাশ হইয়া ফিরিতে হইত। এই জন্য রবীন্দ্রনাথকে এক একটি প্রবন্ধপাঠ বা বক্তৃতা ২।৩ বার সভা করিয়া করিতে হইত। তখনও বঙ্গভঙ্গ হয় নাই,—স্বদেশী আন্দোলনও আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গান বক্তৃতা ও প্রবন্ধের দ্বারা সেই সব ভাববিপ্লবেব বীজ পূর্ব হইতেই যুবকগণের চিত্তে বপন কবিতেছিলেন।"

আমরাও বাস্তবক্ষেত্রে তাইজন্যে দেখতে পাই,—যখন ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখে বঙ্গচ্ছেদ সিদ্ধান্ত ঘোষিত হল তখন সেই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে কবি তাঁব দেশবাসীব কাছে একটি সক্রিয় আবেদন প্রচার করে বলেন : "বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য এই দিনকে আমরা বাঙালির রাখিবন্ধনের দিন করিয়া, পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সুতা বাঁধিয়া দিব। রাখিবন্ধনের মন্ত্রটি এই,—'ভাই ভাই এক ঠাঁই'।" অর্থাৎ একান্তভাবে বিশেষ উদ্যোগী হয়ে—রবীন্দ্রনাথই প্রবর্তন করলেন 'রাখি-বন্ধন' অনুষ্ঠান। 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি ঐ উপলক্ষেই লিখলেন তিনি। তৎকালে কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি জনসাধারণের গভীর ও অকৃত্রিম ভালবাসার নিদর্শন আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যায়—এরই অনুবর্তী ঘটনা থেকে। রাখি-বন্ধনের দিন, প্রাতে 'বন্দেমাতরম্-সম্প্রদায়ে'র সঙ্গে নগ্নপদে গঙ্গাস্নান করতে যান রবীন্দ্রনাথ, ফিরবার পথে রাস্তায় হিন্দু-মুসলমান জাতিবর্ণ নির্বিচারে যাকে পেয়েছেন সামনে তারই হাতে রাখি পরিয়ে

রাখি-বন্ধন

দিয়েছেন। কেউ কিছু প্রতিবাদ করা ত দূরের কথা,—শোনা যায়, সবাই তাঁর সঙ্গে সানন্দে হাত মিলিয়েছিল সেদিন। ঐ একই দিন অপরাহ্নে রবীন্দ্রনাথেরই লেখা 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে' এবং 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান' —এই গান দুটি গেয়ে বিরাট শোভাযাত্রাও হয়েছিল কলকাতার রাস্তায়।

এ হল সেই ১৯০৫ সালের কথা।

গীতার্থী পাঠকেরা যদি এ-সব চলে যাওয়া দিনের ছবি মোটামুটিভাবে এঁকে নিতে পারেন নিজেদের মনের মধ্যে, তাহলে রবীন্দ্ররচিত তৎকালীন দেশাত্মবোধক গানের মূল রসাস্বাদন তাঁদের পক্ষে অনায়াসলব্ধ ত হবেই, উপরন্তু দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকালের অনেক পরে আজ এবং পরবর্তীযুগেও ঐ গানগুলি গেয়ে তেমনিভাবে অনুপ্রাণিত হবেন ওঁরা—কেবলমাত্র সেই ভরসাতেই আগের বিবৃতি এত বিস্তৃত করে দেওয়া হ'ল এখানে।

আর প্রকৃতপক্ষে—কবিগুরুর জীবনে স্বদেশীগান রচনার এক প্রধান অধ্যায় ত সেই যুগটিই—বিশেষকরে ঐ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়—তাঁর স্বদেশীগান দেশবাসীর অন্তরে যে উন্মাদনা উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল—তা অধুনা, তাৎকালিক অখণ্ড বাংলাদেশের এক উজ্জ্বল ঐতিহাসিক কাহিনীও বটে। স্বাদেশিকতার প্রবল বন্যায় তখন কী নিদারুণ ভাবেই না ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ—সে কথা আমাদের এখনও স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর রচিত নিম্নোক্ত তেজোদৃপ্ত গান কয়টি :

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে॥ আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে॥ তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে॥ যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে॥ যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক॥ বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি॥ যদি তোর ভাবনা থাকে॥ আমি ভয় করব না, ভয় করব না॥ নিশিদিন ভরসা রাখিস॥ ও আমার দেশের মাটি॥ আমার সোনারবাংলা আমি তোমায় ভালবাসি॥

এ গানগুলির অধিকাংশই কিন্তু বাউল সুরে গাঁথা। বাউল সুর বাংলার স্বকীয় সুর—সেই সুরের মাধ্যমে গানের বাণী সহজে মর্মকে স্পর্শ করে; আর তাই বোধকরি সর্বসাধারণে যাতে গাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই কবি এই বিশেষ সুরটি যোজনা করেছিলেন তখন ওই গানগুলিতে। তাছাড়া কলকাতার বাইরে শিলাইদহ অঞ্চলে বাস করা কালীন এককালে রবীন্দ্রনাথ 'বাউল' গাইয়েদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন যথেষ্ট—একথা কবি নিজেও বলেছেন, আমরাও এনিয়ে অন্যত্র আলোচনা করব। তাঁর তখনকার রচিত স্বদেশীগান 'বাউল' নামে পুস্তকাকারেও ১৯০৫ সালেই প্রকাশিত হয়। প্রাসঙ্গিক আরেকটি মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় : "স্বদেশীযুগেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম তাঁর গানগুলিকে লোকসংগীতের সুরে বসাতে সুরু করেন। আর এই সময় থেকেই তাঁর গান একটি স্বকীয়ত্ব লাভ করলো, মৌলিকত্ব লাভ করলো – যেটা তাঁর আগেকার গানে ছিলো না। গানে নবসৃষ্টির সূচনা এখন থেকেই সুরু হোলো।"—(রবীন্দ্রনাথের গান, পৃ ৮০)

১৯০৬ সালে আমরা দেখি,—কবি রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে গাওয়া :

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ-দেশে	নিশিদিন ভরসা রাখিস
আমরা পথে পথে যাব সারে-সারে	যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
এবার তোর মরাগাঙে বান এসেছে	যে তোরে পাগল বলে
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে	যদি তোর ভাবনা থাকে
আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে	আপনি অবশ হলি, তবে
ও আমার দেশের মাটি	তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি	ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস্ নে

এই গান ক'খানা রেকর্ড করে প্রচার করেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠবন্ধু হেমেন্দ্রমোহন বসু, নিজস্ব **H. Bose's PATHEPHONE** রেকর্ডে। উপরোক্ত তালিকাটি অনুধাবন করলে বেশ বোঝা যায়, যে, তৎকালীন রচিত ঐ বিশেষ কয়টি স্বদেশীগান স্বয়ং কবির খুবই প্রিয় ছিল এবং তাঁর দেশপ্রীতি সম্পর্কীয় তাৎক্ষণিক মনোভাবও এসবের মধ্যে সুপরিস্ফুট। সম্ভবত ঐ একই কালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গানটিও প্যাথিফোন-রেকর্ডে গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের দেওয়া সুরে।

'বন্দেমাতরম' গানটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'আনন্দমঠ' উপাখ্যানের অন্তর্গত। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই ঐ গানের সঙ্গে "মল্লার-কাওয়ালি তাল"-এর নাম উল্লেখ করে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই অনুসারে গানটি কেউ গেয়েছেন কিংবা ঐ রাগতাল-আরোপিত অবস্থায় এর কোনো বাঁধা-স্বরলিপি আছে বলেও জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথ একজায়গায় বলেছেন :

'বন্দেমাতরম' গানে সুরারোপ প্রসঙ্গ

"আমিই সর্বপ্রথম বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের প্রথমাংশে সুরযোজনা করিয়াছিলাম এবং কংগ্রেসের প্রথম যুগের এক অধিবেশনে আমি নিজেই কংগ্রেস-সমবেত জনতার সম্মুখে তাহা গান করিয়াছিলাম। উহার প্রথমাংশে দেশমাতৃকার যেভাবে গুণবর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে সকলেরই উহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বা উহা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হওয়া স্বাভাবিক।...বন্দেমাতরম সঙ্গীতের সহিত আমাদের জাতীয়সংগ্রামের বহু ঘটনার স্মৃতি জড়িত থাকায় এবং ঐ সঙ্গীতের জন্য বহুস্থানে বহুভাবে বহু দেশসেবককে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হওয়ায় উহা জাতীয়সঙ্গীত রূপে এখন সকলে শ্রদ্ধার সহিত গান করিয়া থাকে...উহাকে এখন আর কোন জাতীয় অনুষ্ঠান হইতে বাদ দেওয়া সম্ভবপর নহে"—(ভারতবর্ষ ১৩৪৪ অগ্রহায়ণ)। বন্দেমাতরম গানে সুর দেওয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এ-সব কথা বলেছিলেন ১৯৩৭ সালে। তা এখানে সংকলন করলাম এই প্রত্যাশায়, যে, এর সাহায্যে কবিগুরুর সুরে ও সঙ্গীতে স্বদেশভক্তির আসল রূপটি, পাঠকচিত্তে হয়ত স্পষ্টতর হতে পারে। 'বন্দেমাতরম'-গানে রবীন্দ্রনাথের সুরটি কিন্তু দেশ-রাগিণীতে রচিত। এই গানের ভাষা এবং তার অভ্যন্তরবর্তী ভাবসমূহ-দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতবর্ষের আরো একাধিক

গুণী সঙ্গীতজ্ঞসুরকার এতে বিভিন্ন সুর আরোপ করেছেন, গেয়েছেন এ-গান বিভিন্ন স্থলে—তার প্রমাণও পাওয়া যায় যথেষ্ট;—সে-সব পৃথকভাবে আলোচনার ও গবেষণার বিষয়। তবে 'বন্দেমাতরম্' আমাদের মধ্যে জাতীয় মহাসঙ্গীতের পবিত্র মর্যাদা লাভ করে এসেছে প্রচণ্ড বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়ে,—এমনকি 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিটিও—সেই ব্রিটিশ শাসনাধীন-কাল থেকেই,—এই গৌরবের ইতিহাস অবিস্মরণীয়।

এবার আগের কাহিনীতে ফেরা যাক্,—যেখানে বলেছিলাম—H. Bose's PATHEPHONE রেকর্ডেও 'বন্দেমাতরম্' গানটি গেয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই সম্পর্কে তখন 'এইচ-বসুর রেকর্ড-তালিকা'য় যে বিজ্ঞপ্তিটুকু প্রচারিত হয়, তাও এখানে তথ্যসন্ধানীদের জন্যে তুলে দিচ্ছি:

36250 বন্দেমাতরম্

বঙ্গের গৌরব অমর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণোন্মত্তকারী জাতীয় সঙ্গীত।

এতদুপরি স্বয়ং রবিবাবু তাহার গায়ক।

[এতৎসহ কবিকণ্ঠের বর্ণনাও লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়, দ্রঃ রবীন্দ্রসঙ্গীতসুষমা', পৃ ১১]

উক্ত Mr. H. Bose কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের তখনকার স্বকণ্ঠে গাওয়া গান কয়টি রেকর্ড করা সম্বন্ধে সবিস্তার ছবি ও প্রামাণিক তথ্যাদি সহ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন "কবিকণ্ঠ" নামীয় গ্রন্থ-প্রণেতা সন্তোষকুমার দে ও কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য। এঁরা সর্বজনের ধন্যবাদার্হ। অপিচ ১৩৭২ সালের ২৫, ২৬ এবং ২৭শে মার্চ তারিখে 'গান্ধর্বী-আয়োজিত রবীন্দ্রসঙ্গীত-সম্মেলনে'র* স্মারকগ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় শ্রীসন্তোষকুমার দে লিখেছেন: "বহুদিন অব্যবহৃত গুদাম ঘরের পরিত্যক্ত বাক্সের মধ্যে, অন্যান্য নানা টুকিটাকির মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের নিজকণ্ঠের বন্দেমাতরম্ গানটির রেকর্ডখানি পাওয়া যায়।...তখন ঐ রেকর্ডখানির ছবি তুলে 'কবিকণ্ঠ' গ্রন্থে দিয়ে এই মহামূল্যবান রেকর্ডটির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, অমৃতবাজার পত্রিকার পূজা-সংখ্যাতেও সচিত্র প্রবন্ধে বিষয়টি আলোচনা করি। পরে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে ভারত-সরকারের চৈতন্য উদয় করাবার পর ঐ সুপ্রাচীন এবং একান্ত দুর্লভ মহামূল্যবান রেকর্ডখানির 'টেপ' রেকর্ড তৈরী করিয়ে আকাশবাণীর হাতে দেওয়া হয় এবং কলকাতায় 'রবীন্দ্র-সদন' ভবনটির উদ্বোধনে সর্বপ্রথম সেই টেপ্ বাজিয়ে জনসাধারণকে শোনানো হয়"—ইত্যাদি।

কিন্তু আমরা ভেবে যুগপৎ দুঃখিত এবং আশ্চর্য হই,—সেই টেপটি 'রবীন্দ্র-সদন' উদ্বোধন উপলক্ষে ১৯৬১ (?) সালে সহসা একবারই শোনানো হয়েছিল বটে, আর

*এই ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ কলিকাতার 'অবন-মহলে'। এর উপদেষ্টা সমিতিতে ছিলেন সর্বশ্রী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমান ঘোষ, রণজিৎকুমার সেন, কিরণশশী দে;—এবং সুবিনয় রায় ও সন্তোষ ঠাকুর ছিলেন এর যুগ্ম-আহ্বায়ক।

বোধকরি শোনানো হয় নি। এরপরে বেশ কয়েকটা বৎসর গড়িয়ে গেছে—সুতরাং এই রেকর্ডখানির অস্তিত্ব সম্পর্কেই যে দেশবাসী অনেকের ধারণা আজ নিতান্ত শোচনীয় ভাবে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে—সেটা নির্ভুলভাবে অনুমান করা যায়।, কিন্তু আরো ভবিষ্যতেও যদি এমনি করে চলতে থাকে তাহলে কাজটা খুব সমুচিত হবে কি,—তা এখন থেকেই প্রত্যেকের অনুভব করা দরকার। মোটেরউপর—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে গাওয়া 'বন্দেমাতরম্' গানের রেকর্ডটি আবিষ্কৃত হয়েও—আমাদের কাছে এত সুন্দর প্রগতির যুগেতে,—তা যে কোন্ অজ্ঞাত কারণে অনাবিষ্কৃতের মতই থেকে গেল—এটাই বড়ো আপশোষের কথা! তবে সকলে জানেন,—অধুনা স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয়সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করেছে বঙ্কিমচন্দ্রের এই 'বন্দেমাতরম্' গান এবং এর অনুমোদিত সুরটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের। সুতরাং বিশেষ করে এই-তথ্যের প্রেক্ষিতে এবং কবির দেওয়া সুরের প্রামাণিকতা বিচারের উদ্দেশ্যে কবির স্বকণ্ঠে গাওয়া রেকর্ডখানি তাঁর স্বদেশবাসী সকলেরই অন্তত কানে শুনে রাখারও যে বিশেষ গুরুত্ব আছে—একথার বোধকরি আলাদা ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না*।

কিন্তু বলছিলাম এইচ-বসুর প্যাথিফোন-রেকর্ডে কবিকণ্ঠে গাওয়া উক্ত 'বন্দেমাতরম্' গানটি ছাড়া অন্যান্য রেকর্ডগুলি আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেককাল আগেই নানা কারণে বিনষ্ট হয়ে যায়। সে-সময়কার পুলিশের দৌরাত্ম্য এর একটি বিশেষ কারণ বটে। এমনতর সব উৎপাতের সম্মুখীন হয়েও কিন্তু জাতীয়সংগীত রচনার কাজে রবীন্দ্রনাথ কখনো নিরস্ত হননি। এর পরেও বিভিন্ন সময়ে তাঁর লেখনী বাংলার সেই অগ্নিময় দিনে মাতৃভূমি ও দেশবাসীর উদ্দেশ্যে কত স্বদেশভক্তির গান যে সৃষ্টি করেছিল, তা সঠিক এবং ধারাবাহিক ভাবে নির্ণয় করা খুব সহজ কাজ নয়। তবে পূর্ব্বে উল্লেখিত গানগুলি ছাড়া অবশ্যস্মরণীয় এবং গেয় হিসাবে আরো কয়টি মাত্র গানের নাম এখানে সংযোজিত হল। যথা:

আমরা পথে পথে যাব সারে সারে॥ এখন আর দেরি নয়॥ জননীর দ্বারে আজি ঐ॥ সার্থক জনম আমার॥ অয়ি ভুবনমনোমোহিনী॥ আমাদের যাত্রা হল শুরু॥ এ ভারতে রাখ নিত্য, প্রভু॥ ওরে নূতন যুগের ভোরে॥ চল যাই চল॥ জনগণমন-অধিনায়ক জয়হে॥ দেশ দেশ নন্দিত করি॥ দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান

*বন্দেমাতরম্ গানের একটি সুর ধৃত আছে H. 570 হিন্দুস্থান রেকর্ডে,—তার লেবেলে লেখা "Specially trained by Dr. Rabindranath Tagore ···Musical Direction by Sj Haripada Chatterjee" ইত্যাদি। রেকর্ডটি শ্রোতব্য ত নিশ্চয়ই—বিশেষত এইকারণে যে, এর মধ্যে কবির নিজস্ব গায়কিটুকুও অনুভব করার সুযোগ পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে ১৮ ডিসেম্বর ১৯৪৭ তাং যুগান্তরে "বন্দেমাতরম্ গানের সুর" শীর্ষক পত্র এবং আরো পরে ১৯৭৩ সালের শারদীয়া সুরছন্দা পত্রিকায় বর্ত্তমান লেখক রচিত "বন্দেমাতরম্ গানের সুর-প্রসঙ্গ" নামীয় প্রবন্ধটির প্রতি গবেষণানিষ্ঠ পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

গাহিয়ে॥ মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন॥ শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান॥ সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান॥ হে ভারত আজি॥ সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ॥ হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে॥ ইত্যাদি—

এই গানগুলির রচনা-তারিখ মিলিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, বিশেষতঃ ১৯০৫ সালে এবং তার আগেই রবীন্দ্রনাথ জাতীয়সংগীত লিখেছেন বেশি। জনসাধারণ সেগুলিই মনের আনন্দে গ্রহণ করেছেন, গেয়েছেন—কবি নিজেও তার মধ্যে মনের সহজ আবেগ—সুরে এবং কথায় তেমনিভাবে প্রকাশ করেছিলেন বলেই হয়ত। বঙ্গভঙ্গের অর্থাৎ ১৯০৫ সালের পরেও জাতীয়সংগীত রচনা করেছেন বটে রবীন্দ্রনাথ,—তা সংখ্যায় অল্প এবং তার অন্তর্নিহিত ভারধারাও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত। অনেকের ধারণা,—সেগুলির কথা যেন অধিক যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট এবং রাগরাগিণীও তেমনি গুরুগম্ভীর হয়ে পড়ায় জনসাধারণ তা আগের মত সহজভাবে আয়ত্তে আনতে পারেন নি। ফলতঃ একটা বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে এর চর্চা আজও প্রায় সীমাবদ্ধ। তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেননা, এর নির্ভুল বিচারের জন্যে আমাদের একথা মনে রাখতেই হবে যে, ববীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন অ সাধারণত্ব লাভ করেছিল, তার প্রকাশও ছিল তেমনি বিচিত্র—যার অনুভব অনুশীলনসাপেক্ষ ত বটেই।

কবি-রচিত 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে' গানটি আজ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় সংগীত। আয়তনে এ গান বেশ দীর্ঘ—সর্বসমেত পাঁচটা কলিতে গ্রথিত। স্বয়ং পূজনীয় গুরুদেবকে আমি তা গাইতে শুনেছি একাধিক বার। এমতাবস্থায়, কোনো সুরকার-রচিত সুরেব প্রামাণিকতা সম্পর্কে একদা আমার অনেক কিছু বলবার এবং জানবার সুযোগ এসেছিল গুরুদেবেরই কাছে—তা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। তদুপরি সঙ্গীতগুরু দিনেন্দ্রনাথ গেয়েছেন, শিখিয়েছেন এই গান আমাদেরে শান্তিনিকেতনে—এ সম্পদের মূল্যও তো অপরিমেয়। তাঁরা যে-ভাবে গাইতেন, সে-ভাবে এর প্রকাশিত স্বরলিপি অনুসরণ করে বহু নিষ্ঠাবান অবাঙালী ছাত্র-ছাত্রী গীতরসিক শিখেছেন এই গান আমার সাহায্যে পাঁচটা কলি সমেত সম্পূর্ণটাই—দিল্লীতে, সিমলায়, সিংহলে, বোম্বাই-আহমেদাবাদে—যখন যেখানে গিয়েছি। পরে কানে এসেছে, তা গেয়েছেনও এঁরা সর্বত্র বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে। এ হল ১৯৩৫ থেকে ১৯৪২-৪৩ সালের ভিতরের ঘটনা। তখন আমাদের দেশ ছিল ব্রিটিশের অধীন। সেই কারণেই হয়ত দেখতাম, পূজনীয় গুরুদেবের এই 'জনগণমন' বিশেষ গানটিরই শুধু কথা নয়—সুর, ছন্দ, উচ্চারণ প্রভৃতি যথারীতিতে কণ্ঠে আয়ত্ত করে নেবার প্রতি ভারতীয়-অভারতীয় তথা স্বদেশী-বিদেশী গায়ক-গায়িকা সর্বজনের কী প্রগাঢ় অনুরাগ ও আকর্ষণ,—ঐ সব দেখে-শুনে গর্বে বুক ভরে উঠত। আজ তা তন্নতন্ন করে ভাবতে বসি যখন, মন কত ভাবে না আনন্দে অভিভূত হয়! সেই স্মৃতিটুকু বিধৃত করবার মানসে এবং বিশেষ করে ইতিহাস গবেষণাপ্রিয় আমার সুধীপাঠকবৃন্দের

গোচরার্থে আলোচ্য গানের মুদ্রিত স্বরলিপিরই মাত্র প্রথম কলিটার নকল এখানে সংযোজন করা হল :

I সা রা গা গা | গা গা গা গা | গা -া গা গা | রা গা মা -া I
জ ন গ ণ ম ন অ ধি না ০ য় ক জ য় হে ০

I গা -া গা গা | রা -া রা ন্‌া | ন্রা -া সা -া | -া -া সা -া I
ভা ০ র ত ভা ০ গ্য বি ধা ০ তা ০ ০ ০ প ন্

I পা -া পা পা | -া পা পা -া | পা -া পা ক্ষা | পা -ক্ষা ধপা -া I
জা ০ ব সি ন্ ধু গু জ্ রা ০ ত ম রা ০ ঠা ০

I মা -া মা মা | মা -া মা গা | রা -মা গা -া | -া -া -া -া I
দ্রা ০ বি ড উৎ ০ ক ল বং ০ গ ০ ০ ০ ০ ০

I সগা -া গা গা | গা -া গা রা | পা পা পা -া | মা -া মা -া I
বি ন্ ধ্য হি মা ০ চ ল য মু না ০ গ ০ ঙ্গা ০

I গা -া গা গা | রা রা রা ন্‌া | ন্রা -া সা -া | -া -া -া -া I
উ ০ চ্ছ ল জ ল ধি ত র ০ ঙ্গ ০ ০ ০ ০ ০

I গা গা গা গা | গা -া গা -মা | রা -গা মা -া | -া -া -া -া I
ত ব শু ভ না ০ মে ০ জা ০ গে ০ ০ ০ ০ ০

I গা মা পা পা | পা -া মা গা | রা -মা গা -া | -া -া -া -া I
ত ব শু ভ আ ০ শি ষ মা ০ গে ০ ০ ০ ০ ০

I সগা -া গা -া | গা গা রা রা | ন্‌া রা সা -া | -া -া -া -া I
গা ০ হে ০ ত ব জ য় গা ০ থা ০ ০ ০ ০ ০

I পা পা পা পা | পা -া পা ক্ষা | পা -া পা পা | ক্ষা ধা ধপা -া I
জ ন গ ণ মং ০ গ ল দা ০ য় ক জ য় হে ০

I মা -া মা মা | গা -া গা গমা | রা -মা গা -া | -া -া না না I
ভা ০ র ত ভা ০ গ্য বি ধা ০ তা ০ ০ ০ জ য়

I র্সা -া -া -া | -া -া না ধা | না -া -া -া | -া -া পা পা I
হে ০ ০ ০ ০ ০ জ য় হে ০ ০ ০ ০ ০ জ য়

I ধা -া -া -া | ধসা সা রা রা | গা গা রা গা | মা -া -া -া I
হে ০ ০ ০ জ য় জ য় জ য় জ য় হে ০ ০ ০

(গীত-পঞ্চাশিকা ১৩৪২ সালের সংস্করণ এবং ভীমরাও শাস্ত্রীকৃত সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি ১৯২৭)

পুনশ্চ এক্ষেত্রে স্মরণ করিয়ে দেওয়া অসঙ্গত হবে না, যে, শুধু আজ বলে নয়, বহুকাল আগে থেকেই বহু উপলক্ষে, বহু জনসভায় এটি যুগপৎ জাতীয়সঙ্গীত এবং ভগবৎসঙ্গীত হিসাবে গীত হয়ে সমগ্র ভারতে এমনকি বহির্ভারতেও জনপ্রিয়তা অর্জন করে এসেছে প্রচুর ;—সম্ভবত এর ভিতরকার বাণী সুর ও ছন্দ, রচয়িতা কবিগুরুর স্বকীয় দীপ্তিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান—সেইজন্যেই তা একেবারে রচনাকালের শুরু থেকেই জনগণের বিশেষ শ্রদ্ধা এবং

প্রীতির অধিকারী বলেও পরিচিত হয়েছে—এঘটনা ঐতিহাসিক। ভরসা রাখি, আগামী দিনের রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং সাহিত্য-প্রেমীরা একে কেন্দ্র করে এতৎসংক্রান্ত ঘটনাবলীর তারিখের ক্রমপর্যায়ের সুসংবদ্ধ বিবৃতি (chronological record) সোৎসাহে খুঁজে নিয়ে যথানিয়মে লিখতে-পড়তে যত্নবান হবেন,—ফলে ঐতিহাসিক সন্ধিৎসা নিজেদের মধ্যে ব্যাপকভাবে গড়ে উঠবে আরো অনেক বেশি।

উল্লেখ্য, 'জনগণমন' গানের প্রথম কলিটাই মাত্র অধুনা সচরাচর গাওয়া হয়ে থাকে এবং দ্রুতলয়ে। এই গানের রচনা তারিখ ১৯১১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস।

ভানুসিংহের পদাবলী

১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মহর্ষি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে জলপথ ভ্রমণে বের হোন। জানা যায়, পিতার সঙ্গে এইটেই ছিল রবীন্দ্রনাথের ব্যাপকভাবে বঙ্গদেশ ভ্রমণ। সেই সময়ে পড়বার জন্য দেবেন্দ্রনাথ অনেকগুলি বই নিয়েছিলেন সাথে। তারই ভিতর থেকে অতি পুরনো ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত 'গীতগোবিন্দ'-খানি রবীন্দ্রনাথের হাতে আসে। বাংলা অক্ষরে একটানা ছাপা,—অর্থাৎ ছন্দ অনুসারে তার পদের ভাগ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তখন সংস্কৃত কিছুই জানতেন না। বাংলা জানতেন ভাল, তাই পদাবলীতে লেখা অধিকাংশ শব্দের অর্থ বুঝতে পারতেন। তিনি বলেন : "সেই গীতগোবিন্দ-খানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না।...গদ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত—সেইটেই আমার বড়ো আনন্দের কাজ ছিল। যেদিন আমি 'অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণি-ভূষণং হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণং'—এই পদটি ঠিকমত যতি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম, সেদিন কতই খুশি হইয়াছিলাম। জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝিই নাই,—অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম"—(জীবনস্মৃতি, পৃ ৪১-৪২)। কবিগুরুর এই উক্তি থেকে সহজে অনুমেয়, যে, বাল্যবয়সে ছন্দ আয়ত্ত করার কাজে তাঁর ধৈর্য ছিল অপরিসীম এবং 'পদাবলী' রচনার মূল উৎসও ছিল তা-ই। তিনি নিজেও ১৩১৭ সালের ২০ আষাঢ় তারিখের এক পত্রে স্পষ্টভাবে আমাদের আরো জানিয়েছেন :

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব

"আমার বয়স যখন তেরো-চৌদ্দ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণবপদাবলী পাঠ করেছি, তার ছন্দ রস ভাষা ভাব সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্পষ্ট অস্ফুট রকমেও বৈষ্ণবধর্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশ লাভ করেছিলুম"—(প্রবাসী ১৩৩৪ পৌষ)।

অধিকন্তু অনুবর্তী তথ্যটিও তো উপেক্ষিত হতে পারে না, যে, রবীন্দ্রনাথের পিতামহ

প্রিন্স "দ্বারকানাথ প্রথম বয়সে একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার দেবদ্বিজে বিশেষ ভক্তি ছিল। তিনি প্রত্যহ হোম, তর্পণ, জপ কবিতেন। অন্যান্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণেব ন্যায় স্বহস্তে গৃহদেবতা ৺লক্ষ্মীজনার্দন শিলাব নিত্য পূজা কবিতেন। যে পূজক নিযুক্ত ছিল, সে ভোগাদি পাক কবিয়া ভোগ দিত ও আবত্রিক কবিত"—('মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব আত্মজীবনী' পবিশিষ্ট-পৃ ৩১০)। কাজেই এই সূত্রে বৈষ্ণবধর্মতত্ত্বাদিব প্রতি দ্বাবকানাথের পৌত্র ববীন্দ্রনাথেব আকষণ, বংশপবাম্পবাগতই বলা যায়। আমবাও সেইজন্য সহজভাবেই বলতে পা ব,– বৈষ্ণবসাহিত্যেব প্রতি ববীন্দ্রনাথেব যে একটা নিবিড আকর্ষণ ছিল তা অতি অল্প বযসেই প্রকাশ পায় তাঁব বচিত কবিতাতে—যে কবিতাগুলি, বিশেষভাবে 'ভানুসিংহেব পদাবলী' বলে পবিচিত এবং আমাদেব বর্তমান আলোচনাবও এক বিষয় বটে।

ববীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকেরা নিশ্চয় জানেন,—এমনতব পদাবলী বচনাব প্রেরণা কবি লাভ কবেছিলেন সেই যুগেব (১৮৭৪-৭৬) সাহিত্যসেবক অক্ষয়চন্দ্র সরকাব ও সারদাচবণ মিত্র কর্তৃক সংকলিত 'প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ' পড়ে। সেই কাব্যসংগ্রহে ছিল (১) বিদ্যাপতি (২) চণ্ডীদাস (৩) গোবিন্দদাস ৪) বামেশ্বরেব সত্যনাবায়ণ ৫ মুকুন্দবাম কবিকংকণেব চণ্ডীমঙ্গল।) তাছাড়া ইতিপূর্বে ইংবেজ বালককবি Thomas Chatterton-এর কাহিনী শুনেছিলেন তিনি তাঁব দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথেব বন্ধু অক্ষয়বাবুব কাছে। কাহিনীটিব মধ্যে যে একটা নাটকিয়ানা ছিল তা বাঙালী বালককবি ববীন্দ্রনাথেব কল্পনাকে বেশ 'সরগবম' কবে তুলেছিল। আবাব অন্য দিকে—পূর্বোক্ত প্রাচীনকাব্য-সংগ্রহগুলি আসত ঠাকুববাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথেব কাছে। কিন্তু বাডিব বডোবা কেউ ঐ সবের পাঠক ছিলেন না,—ববীন্দ্রনাথ এগুলি নিজে জড় কবে এনে পড়তেন। তখন তাব বয়স মাত্র ১৩ কি ১৪। এসবেব মধ্যে বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলেই রবীন্দ্রনাথেব মন সেদিকে আকৃষ্ট হত বেশি। এব কাবণটিও সুন্দব উপমা দিযে কবি বুঝিয়েছেন: "গাছেব বীজের মধ্যে যে-অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন, ও মাটিব নীচে যে বহস্য অনাবিষ্কৃত,—তাহাব প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদেব বচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন কবিতে করিতে একটি অপবিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি আধটি কাব্যবত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে,—এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল"—(জীবনস্মৃতি, পৃ ৭৬)।

মোটের উপব নিতান্ত অল্প বয়সেই ববীন্দ্রনাথ বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়তেন ওই 'প্রাচীনকাব্য সংগ্রহ' এবং তদসঙ্গীয় টীকাব উপর নির্ভব না করে নিজে থেকেই সব কথার অর্থ বুঝবার চেষ্টা করতেন। কোনো কঠিন শব্দ পেলে পব নোট করে রাখতেন নিজেব ছোট্ট একটা বাঁধানো খাতায়। সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধবনেব পদ রচনারও প্রয়াস চলছিল তাঁব। এই ব্যাপারে কবি বলছেন:

"একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে

বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন-কুসুমকুঞ্জ-মাঝে'। লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম।"—

(জীবনস্মৃতি, পৃ ৭৬)।

তক্ষুনি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে আশ্চর্য রকমের এক আত্মবিশ্বাস এসে গেল। অক্ষয়বাবুর মুখে গল্প শোনা—সেই যে ইংরেজ বালককবি চ্যাটার্টন যিনি একদা তাঁর নিজ দেশের প্রাচীন কবিদের নকল করে কবিতা লিখে খ্যাত হয়েছিলেন,—তেমনি এই দেশের বালককবি রবীন্দ্রনাথও হয়ত আর পিছিয়ে থাকবেন না সেই চ্যাটার্টনের চেয়ে;—এই রকমের বিশ্বাস নিয়ে ছদ্মনামে ঐ প্রাচীন কবিদের পদাবলী-অনুরূপ মৈথিলী ও ব্রজভাষায় রীতিমত কবিতা লেখা শুরু হল রবীন্দ্রনাথের। এবং নিজেকে 'রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ' করবার ইচ্ছায় 'ভানুসিংহ' হল তাঁর স্ব-পরিকল্পিত ছদ্মনাম।

তাহলে,—সর্বাগ্রে ছন্দ আয়ত্ত করার আনন্দে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' পাঠ—অতঃপর বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ বিশিষ্ট বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনুসরণ,—এবং ক্রমশঃ দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হবার মধুর আকাঙ্ক্ষা;—এই কয়টির সম্মিলিত প্রভাবেই বলা যেতে পারে 'ভানুসিংহের পদাবলী'র জন্ম। ১৮৭৭ থেকে ১৮৮৪ সালের মধ্যে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁর ১৬ থেকে ২৩ বৎসর বয়স মধ্যে ঐ কবিতাগুলি লিখেছিলেন। এবং সেইগুলিতে, পুরানো কালের কবিদের অনুসরণে তিনি প্রতি পদের ভনিতায় 'ভানুসিংহ' এই ছদ্মনামটি আরোপ করেছেন।

ভানুসিংহের পদাবলীগুলি যখন 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগল তখন রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বালক; অথচ তাঁর লিখিত পদাবলীর ভাব ও ভাষা উঁচুস্তরের। কাজেই এমনতর সব পদাবলী যে বালক রবীন্দ্রনাথই লিখতে পারেন সে কথা বিশ্বাস করাও ছিল সেই দিনে অনেকের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। (এ-সব কাহিনী কবির জীবনস্মৃতি গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত আছে।) সে যাই হোক, ভারতীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের উক্ত কবিতাগুলি পরে ১২৯১ (১৮৮৪) সালে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।

(এখানে স্মরণযোগ্য, যে, এই পদাবলী-রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতি বহুল পরিমাণে জড়িত। বিশেষকরে তাঁর বৌঠাকুরাণী [অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী (১৮৫৯-৮৪)] সেই সময়ে ছিলেন তাঁর প্রায় সমবয়সী; সাহিত্য কাব্যাদি চর্চার প্রধান এবং একমাত্র সঙ্গী—উৎসাহদাত্রী ত বটেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "সাহিত্যে বউঠাকুরাণীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে—তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চায় আমি অংশী ছিলাম"—(জীবনস্মৃতি, পৃ ৭২)। এই উক্তির সূত্র ধরে অনুমান করা যায়, পদাবলী-আকারে নবরচিত এই কবিতাগুলি 'ভারতী'তে প্রকাশকরাকালীন কিংবা আগে,

রবীন্দ্রনাথ পড়ে শোনাতেন তাঁর বৌঠাকুরাণীকে—বিনিময়ে সাধুবাদও পেতেন নিশ্চয়। তাই আমরা দেখি, 'ভানুসিংহঠাকুরের পদাবলী'র উৎসর্গপত্রে সেই স্মৃতির করুণ ছবিটিও আঁকা হয়েছে বড় নিবিড় ভাবে,—সেখানে কবি লিখেছেন :

"ভানুসিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি আমাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন সে অনুরোধ পালন করি নাই। আজ ছাপাইয়াছি,—আজ তুমি আর তাহা দেখিতে পাইলে না।"

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে যে-সব গান রচনা করতেন সেগুলির মাথায় চলিত প্রথামত রাগরাগিণীর নাম উল্লেখ করে দিতেন তিনি নিজেই,—এ বিষয় নিয়ে আগে এক অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। তারই পরিপ্রেক্ষণে, যেহেতু ('ভানুসিংহের পদাবলী' রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনা—সুতরাং এই গ্রন্থে, প্রচলিত রীতি অনুসারে, কবির প্রিয় রাগরাগিণীর নাম উল্লেখান্তেই পদাবলীগুলি সাজানো পাওয়া যায়*। তার সন্ধান নিয়ে পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে, রাগিণীর নামোল্লেখ থাকা সত্বেও কোনো-কোনো গানে সুরারোপ করতে গিয়ে (সম্ভবত পরবর্তীকালে) কবিগুরু তার মধ্যে কিঞ্চিৎ হেরফের ঘটিয়েছেন, যেমন—'মরণরে, তুঁহু মম শ্যামসমান' গানটি পূরবী রাগিণীতে ব্যবহার করার নির্দেশ আছে লিখিতভাবে,—কিন্তু কার্যতঃ এতে সুর বসিয়েছেন তিনি ভৈরবী। এবং অন্যান্যগুলির সুর, যে ভাবে স্বরলিপিবদ্ধ অবস্থায় আমরা সচরাচর দেখতে পাই তা যে ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের এবং তাঁর অগ্রজ সঙ্গীতবিদ্ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একেবারে প্রভাব মুক্ত—সেকথা ঘোষণা করা চলে না;—আর বস্তুতপক্ষে স্বরলিপিগ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণেও এ সম্পর্কে অল্পাধিক অস্পষ্টতা যখন বর্তমান। তবে এই পদাবলীগুলির সুর নিঃসন্দেহে তাৎকালিক সাঙ্গীতিক পরিবেশে রচিত এবং কথার সঙ্গে মানিয়েও বেশ একটি সহজ মাধুর্য ফুটে উঠেছে সেখানে—মনে হয় অনেকটা যেন কীর্তন-ঢঙের। কিন্তু কীর্তনের প্রচলিত আখরাদি নেই,—কঠিন তালও তেমন ব্যবহার করা হয়নি এতে। (বর্তমান আলোচ্য) পদাবলীর গায়ক কিংবা শ্রোতা যে-কেউ স্বচ্ছন্দে এ-সব অনুভব করতে পারেন। তদুপরি এ জাতীয় পদ রচনা, নিতান্ত-অল্পবয়সের বলে চিহ্নিত হলেও, সংগীত-সৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যে অন্যতম বিশিষ্ট সম্পদ—সে কথা ত অবশ্যই স্বীকার্য।

এখানে প্রাচীন-কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস-রচিত পদের যৎসামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি ছন্দ বিভাগ করে,—এর সঙ্গে তেমনি তুলনামূলক হিসাবে ঠিক পাশাপাশি ভানুসিংহ ঠাকুর রচিত পদেরও উল্লেখ রইল। এর দ্বারা আশাকরি কৌতূহলী পাঠকেরা অনুভব করতে পারবেন, এই পদগুলির ছন্দঝংকার যে কী ভাবে অনেকটা একই সুরে যেন অনুরণিত হয়ে চলেছে। যেমন,—

*স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক রাগরাগিণীর নামোল্লেখিত "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"র সূচীপত্রের এক সম্পূর্ণ নকল রবীন্দ্রগীতিপ্রবাহ-১ম ভাগের ৩২-৩৩ পৃষ্ঠায় সংযোজিত আছে।

[১] জয়দেব (গীতগোবিন্দ) :	ভানুসিংহ :
ললিতল বঙ্গল ভা৹পরি শী৹লন	চকিতগ হননিশি দূ ৹ রদূ ৹রদিশি
কো৹মল মলয়স মী৹৹রে ৹৹৹৹	বা৹জত বাঁ৹শিয়ু তা৹৹নে ৹৹৹৹

[২] বিদ্যাপতি :	ভানুসিংহ :
তুঙ্গজগ তা৹ বণ দী৹নদ য়া৹ময়	গ রজে৹ ঘন ঘন বহুভর পা৹ওব
অভহিতু হারিবিশো য়া৹৹৹ সা৹৹৹	কহে৹ভা ৹মুতব দা৹৹৹ স৹৹৹

[৩] গোবিন্দদাস :	ভানুসিংহ :
শ্যা৹ময় না৹গর গুণগণ আ৹গব	হৃদয়উ দা৹সয় নয়নউ ছা৹সয়
কো৹ধনি বিছুরয় পা৹৹র	দা৹রুণ মধুময় গা৹৹ন

অধুনা 'ভানুসিংহের পদাবলী' নামে যে স্বরলিপি-পুস্তিকা বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত, তার ভূমিকায় নিম্নোক্ত তথ্য পরিবেশিত আছে :

"এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালে উহাতে ২১টি পদ ছিল ;···প্রত্যেকটি রচনার সুর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে প্রথমাবধি উল্লিখিত থাকিলেও, অনেকগুলি গানের সুর হারাইয়া গিয়াছে মনে হয়। পূর্বে যেগুলির স্বরলিপি প্রকাশিত ছিল এবং সম্প্রতি শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবী যে-গুলির সুর স্মৃতি হইতে উদ্ধার করিয়া স্বরলিপি করিয়া দিয়াছেন, তাহাই এইগ্রন্থে প্রকাশিত হইল। কাব্যগ্রন্থের পাঠের সহিত গানের তথা স্বরলিপির পাঠ সর্বদা মেলে না।"

এই স্বরলিপি পুস্তিকাটিতে সর্বসমেত দশটি গান পাওয়া যায়, যথা—

(১) আজু সখি মুহু মুহু
(২) গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে
(৩) বাজাও রে মোহন বাঁশি
(৪) মরণ রে তুঁহু মম শ্যামসমান
(৫) শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা
(৬) শুন লো শুন লো বালিকা
(৭) সজনি সজনি রাধিকা লো
(৮) সতিমির রজনী, সচকিত সজনী
(৯) সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি
(১০) হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে

স্বরলিপি পুস্তিকাতে উল্লেখ আছে, 'সুন্দরি রাধে আওয়ে বনি' গানটি বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের পদ, এবং সুর রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। প্রসঙ্গত বলা যায়, কবি বিদ্যাপতির সুবিখ্যাত 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগ ছিল। এতে নিজে সুর দিয়ে বর্ষাকালে প্রায়ই এগানটি গাইতেন তিনি। তাঁর দেওয়া সুরটি স্বরলিপিবদ্ধ হয়েছে 'কেতকী' গ্রন্থে—যা অধুনা স্বরবিতান-১১শ খণ্ড বলে পরিচিত।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ যেমন গান লিখেছেন, তেমন সুরও দিয়েছেন তাতে—তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু সেই গান ও সুরের বিচার যখন করতে বসব তখন মনে রাখতে হবে—

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলতঃ কবি ;—আর সেজন্যেই তাঁর গানের আবেদন কাব্যধর্মী। সুরজ্ঞ না হলে সুরের মর্ম সকলে ঠিক বোঝে না ; তবে কাব্য মানুষের মনের ভাষা নিয়ে গড়ে ওঠে বলেই হয়ত এর মর্ম সেই তুলনায় অনেকটা সহজবোধ্য। তাই কোনো-কোনো বাংলাগানের কথা ও সুর শুনে যখন নেহাৎ আনাড়ি সঙ্গীত-অনভিজ্ঞও মন্তব্য প্রকাশ করেন : 'আরে! এ-তো রবীন্দ্রসঙ্গীত!' তখন তা শুনে অবাক হবার কিছু নেই, বরং ধরে নেওয়া যায়, এই সঙ্গীতের মূলে যে হৃদয়স্পর্শী আবেদন রয়েছে তা শুধু-শুধু সুরে নয়,—সুরে এবং বাণীতে একাত্ম, আর নিশ্চিতভাবে কোনো এক বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বয়ংদীপ্ত স্বয়ংপূর্ণ—স্বপ্রকাশ। এর পরিচয় লিখে কিংবা বলে বোঝাতে যাওয়া অনেকটা চাঁদের আলো-কে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেখাবার মতন। তবে প্রদীপেরও প্রয়োজন আছে—নচেৎ দীপালী উৎসব জমে না। সেই উৎসবের পূজারী সেজে উপকরণও জোটাতে হয় প্রত্যেককে তেমনি সাধ্যমত। এখানে অংশ নেবার পরিকল্পনা সম্প্রতি আমাদেরও,—আয়োজন যেমন সেই অনুপাতেই।

রবীন্দ্রনাথ গান লিখতে আরম্ভ করেন, যখন তার বয়স ১৪ কি ১৫ তখন থেকেই,—আর তা শেষ হয় তাঁর মৃত্যুর মাস দুই-এক আগে। সেই হিসাবে একটানা প্রায় ৬৬ বৎসর কাল গান রচনা করেছেন তিনি। সুর-সহ এবং সুর-বিহীন অবস্থায় সেগুলো সংখ্যায় হবে, বিশ্বভারতী-প্রকাশিত গীতবিতান' তিনখণ্ডের সাহায্যে কোনো কোনো অঙ্কবিলাসীর গণনা মতে* আড়াই হাজারেরও বেশি। তার মধ্যে যেগুলিতে কবি সুর দিয়েছেন, সেই সুরগুলি কিন্তু অধিকাংশই একেবারে তাঁর নিজস্ব নূতন ধরনের,—তবে পুরাতন ধরনকে অস্বীকার করে নয়। কেননা, গীতরচনায় নূতনের সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছেন তিনি পুরাতন থেকেই—একথা বারবার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এই যে তার বিরাট সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্ব—এর পরিচয় যথাযথভাবে পেতে হলে আমাদের সব সময় এ-কথাটা মনে রাখতে হবে, যে, রবীন্দ্রনাথ চিরকালই অন্ধ অনুকরণের বিরোধী ছিলেন পুরাতনকে তিনি নকল কিংবা অনুকরণ করেন নি,—পুরাতন থেকে প্রেরণা অর্জন করেছেন নূতনকে সৃষ্টি করবার। সঙ্গীত-প্রসঙ্গে—পুরাতন রাগরাগিণী যা তিনি ছেলেবেলা থেকে বহু বিশেষজ্ঞের কণ্ঠে শুনে এসেছিলেন—সেগুলিরই রূপচিন্তা তাঁর মনের মধ্যে প্রেরণা যোগিয়েছে এবং ক্রমশঃ স্বকীয় ভাব ও চিন্তাধারার মাধ্যমে এসে বাঁধা পড়েছে তাঁর গানে। সেইজন্যে এর মধ্যে রাগরাগিণীর মিশ্রণ বলে যে ব্যাপারটা আমরা কখন-সখন অনুভব করি,—সেটা তো বিশেষ কোনো শাস্ত্র কিংবা ব্যাকরণের পূর্বপ্রচলিত পথ বা মত মেনে নিয়ে তিনি সব সময় করেন নি। সঙ্গীতজগতে এই সাধনা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব, একান্তভাবে আত্মপ্রত্যয়বিদ্ধ। আর বস্তুত

কবি-রচিত গানের সংখ্যা

* কোনো মহান্ স্রষ্টার সৃষ্টির পরিমাণ-নির্ধারণ কি কখনও এইভাবে সম্ভব? আমার কিন্তু ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশের জন্যে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে ইচ্ছা করে কবি মাইকেল মধুসূদনের একটি উক্তি : "কে পারে—গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে?"—(মেঘনাদবধ কাব্য)।

এসব কারণেই কবিগুরুর জীবনধারণের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই,—প্রাত্যহিক ও জৈবিক ক্রিয়াকলাপের মতই গানের সাধনা কিংবা গান-লেখাটা ছিল তাঁর একটা নিয়মবদ্ধ অভ্যাস। তাঁকে বলতেও শোনা যায়: "গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয় এমন আর কিছুতে হয় না"।

তাহলেও এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কেবলমাত্র গান রচনাই ত রবীন্দ্রনাথের কাজ ছিল না, আরো কত অজস্র সাহিত্য কাব্য সম্পদ তিনি রচনা করে আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন, তবু আশ্চর্য এরই ফাঁকে-ফাঁকে এত গান লিখলেন কি করে —শুধু লেখা ত নয়—এসবেতে আবার নিজেই সুর আরোপ করেছেন! অতঃপর, যেমন আপন ভাষাভাষী—তেমনি অপর ভাষাভাষী বহুজনকে গাইতে উৎসাহিত করেছেন,—সর্বত্র গাইছেন তাঁরই সুরারোপিত গান! এক জীবনে কোনো শিল্পী কিংবা কবি স্বীয় প্রতিভার পরিচয়, এত বিপুল সফলতার সঙ্গে দিয়ে যেতে পেরেছেন—তেমন ঘটনার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই বিরল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বহুবিধ সৃষ্টির ভিতরে তাঁর সৃজনীপ্রতিভার এক পরম বিস্ময়কর দিক হল এই 'রবীন্দ্রসংগীত'। তার মধ্যে বাণীর অফুরন্ত প্রাচুর্য যেমন রয়েছে তেমনি আছে সুরের নানা বৈচিত্র্য-ও। বিষয় বৈচিত্র্যের ত অন্তই নেই রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত শুধু ত আকাশকে নয়, মাটিকেও নয়—বিশ্বসংসারের সমাজ ও ব্যক্তি, সমস্ত কিছুকেই অবলম্বন করে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। জীবনের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত—তাঁর কাব্যের অন্তরে-অন্তরে এই কথাই বারবার প্রবাহিত হয়েছে:

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই—'

তাইজন্যে সম্ভবত, আমাদের প্রত্যেকের মনের সকল রকমের অনুভূতির সন্ধান মিলে যায় তাঁর গানে—তাঁর সুরে, কিংবা এও বলা চলে, মানবধর্মের সমস্ত অনুভূতি সংগৃহীত হয়ে ভাষা পেয়েছে—এই রবীন্দ্রসঙ্গীতে। কণ্ঠে সুর নিয়ে যে জন্মায় সে ত এ গান গায়ই,—আবার যার একেবারে সুর নেই—সেও না গেয়ে পারে না, অন্তত, প্রকাশ্যে না হোক,—

সুর রচনায় কবিগুরুর আত্মবিশ্বাস

আপন মনে। প্রাত্যহিক জীবনের সুখেদুঃখে, আনন্দেবিষাদে, মিলনেবিচ্ছেদে— রবীন্দ্রসংগীত আমাদের নিত্যসাথী। সঙ্গীত-বিদ্যায় কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত বহু মানবচিত্তই যে রবীন্দ্রনাথের গানের নব-নব রসধারায় কোনো-না-কোনো মুহূর্তে অবগাহিত —পরিপ্লাবিত হয়ে চলেছে কখন উজ্জ্বল কখন-বা অনুজ্জ্বল গতিতে;— এই বিশ্বাসটুকু যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে এখানে এঁকে স্থায়ী করে রাখার সুযোগ খুঁজি তাহলে— তাতে খুব ভুল হবে না আশাকরি।

এই সম্পর্কে কবিগুরুর নিজ ভাষাটা শোনা যাক্: "দেখো রবিঠাকুর গান মন্দ লেখে না, এক রকম চলনসই তা বলতেই হবে। চিনিতে পাবে রজনীগন্ধার গন্ধ মিশেছে সমীরে,

ধীরে-ধীরে—কম গান লিখেছি? হাজার হাজার গান, গানের সমুদ্র···দেশকে গানে ভাসিয়ে দিয়েছি। আমাকে ভুলতে পার, আমার গান ভুলবে কী করে?"—(মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৭৯)। 'আলাপচারী-রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থেও পরিবেশিত আছে ঐ একই ধরনের উক্তি: "আমি জানতুম বাংলাদেশকে আমার গান গাওয়াবই। সব আমি জোগান দিয়ে গেলুম,—ফাঁক নেই। এ না গেয়ে উপায় কী! আমার গান গাইতেই হবে—সব কিছুতে।"

এই আত্মপ্রতীতি কবিগুরুর অন্তরে জীবনভর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই তাঁর আপন সঙ্গীতচিন্তা-বিষয়ক এমনতর আরো কত মূল্যবান কথা সব তিনি আমাদের শুনিয়ে গেছেন—সেগুলির সমস্ত হয়ত অনেকের জানা নেই। জানা থাকলে যে কারুর মধ্যেই অযথা বাকবিতণ্ডার কোন অবকাশ মেলে না তা তো সকলেই বোঝেন। তবু ইচ্ছায় হোক্ বা অনিচ্ছায় হোক্—বাকবিতণ্ডা আমাদের মধ্যে আশ্চর্যরকমে জন্ম নেয় নানা সূত্রে,—সেই বিবেচনায় প্রাসঙ্গিকবোধে, বিশেষত এই 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিচয়' নিয়ে আলোচনাব ক্ষেত্রে, মাত্র দুইটি উক্তি নিয়ে উদ্ধৃত করছি।

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলছেন: "আমার গান দেশে অনেকেই সুরে-বেসুরে গেয়ে থাকে, কিন্তু যাঁরা সমজদার বলে খ্যাত তাঁরা কেউ ওটাকে আমল দেন না। অর্থাৎ আকন্দফুলে শিবের পূজো চলে, কিন্তু আকন্দ গাছটা থাকে বাগানের বাইবে। আবামেই থাকে, ফ্যাশান-দোরস্ত বাগানবিলাসীরা একে দেখে নাক সিটকোয় না"—(সাহিত্যসংখ্যা দেশ ১৩৮০, পৃ ২০)। ১৯৩৫ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন এক চিঠিতে: "মাঝে-মাঝে গান রচনার নেশায় যখন আমাকে পেয়েছে তখন আমি সকল কর্তব্য ভুলে তাতে তলিয়ে গেছি। আমি যদি ওস্তাদের কাছে গান শিক্ষা করে দক্ষতার সঙ্গে সেই সকল দুরূহ গানেব আলাপ করতে পারতুম তাতে নিশ্চয়ই সুখ পেতুম,—কিন্তু আপন অন্তব থেকে প্রকাশেব বেদনাকে গানে মূর্তি দেবার যে আনন্দ, সে তার চেয়ে গভীর। সে-গান শ্রেষ্ঠতায় পুরাযুগের গানের সঙ্গে তুলনীয় নয়, কিন্তু আপন সত্যতায় সে সমাদরের যোগ্য। নব নব যুগের মধ্যে দিয়ে এই আত্মসত্যপ্রকাশেব আনন্দধারা যেন প্রবাহিত হতে থাকে—এইটেই বাঞ্ছনীয়"—(সুর ও সঙ্গতি, পৃ ৯৪)।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য,—ববীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বকবি, তাঁর রচিত অধিকাংশ গানই—বিশ্বপ্রকৃতির, বিশ্বধাতার, বিশ্বমানবের—আব তাই বোধকরি কোনো বিশেষ ধর্মেব কিংবা সম্প্রদায়ের স্থান নেই তাঁর সঙ্গীতের ভাবধারায়। অবশ্য তাঁর প্রথমজীবনের রচিত কোনো কোনো গান বাদ দিয়েই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আর বস্তুতঃ এ সবের ঊর্ধ্বে বলেই ত আজ রবীন্দ্রসঙ্গীত সার্বজনীনতা লাভ করেছে—সম্ভবত এর আক্ষরিক অনুবাদ হচ্ছে বিভিন্ন ভাষায়, সেই অনুবাদ প্রচারিতও হচ্ছে,—দিকে দিকে কবিপ্রদত্ত সুর-ছন্দ অবলম্বনেই। আর তা হবেই বা না কেন? যে মর-জগতে এসে কবি বলতে পেরেছিলেন অকুণ্ঠে:

'লুকায়ে আছেন যিনি জগতের মাঝে,
আমি তারে প্রকাশিব সংসারের কাজে'—

এ কথাটি'ত একেবারে সামান্য কথা নয়—এই বাণীর সার্থক রূপদাতা রবীন্দ্রনাথ নিজেই। প্রকাশ করেছেন অদেখাকে, অব্যক্তকে, অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে—তাঁর সাহিত্যে, কবিতায়, গানে, গল্পে, সুরে,—সেই সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাঁর প্রকাশকে মনেপ্রাণে সর্বতোভাবে উপলব্ধি করবার যোগ্যতা অর্জনের জন্যই ত আমাদের মধ্যে আজ এই ব্যাপক ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা। এই চর্চা যদি সফল হয় তাহলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যথাযথ পরিচয় পাওয়াও, এরই মাধ্যমে হবে আমাদের পক্ষে সম্ভব।

তাছাড়া,—রবীন্দ্রনাথ, 'গীতবিতান' গ্রন্থে তাঁর রচিত গানগুলিকে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে নিজেই—পূজা, প্রেম, প্রকৃতি ইত্যাদি নামে বিষয়-বিন্যাস করে সাজিয়ে রেখে বলেছেন: "এই উপায়ে, সুরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।" সুতরাং কবিগুরুর এই বক্তব্য অনুযায়ী যাঁরা একেবারে বাস্তব ও সামগ্র্যভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিচয়-সংকলনে উৎসাহী তাঁদের এই বিশেষক্ষেত্রে বিশ্বভারতী-গীতবিতান তিন খণ্ডের সাহায্য নিতে অনুরোধ করি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য

রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনার ব্যাপারেও গীতবিতান তিনটি খণ্ড অপরিহার্য। সমগ্র গীতবিতান অনুশীলন করলে যে-কোনো পাঠক বুঝতে পারবেন, বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের গান যে কত বহুমুখী। (অন্যান্য গীতরচয়িতাদের সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করে এর সম্যক বর্ণনা দেওয়া এই ছোট প্রবন্ধে সম্ভব নয়,—তাছাড়া সহস্রাধিক রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে নির্বাচন করে একটা বিশেষ অংশ নিয়ে আলোচনা করলে,—এতে সমগ্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে কারুর পরিচয় ঘটে না,—কেবলমাত্র ঐ আংশিক পরিচয় লাভের সাহায্য করে মাত্র। তা-হলেও, এ যেন হয় অনেকটা—সমুদ্র থেকে মাত্র কয়েক ফোটা জল তুলে নিয়ে এসে সারা সমুদ্রকে চেনাবার বালসুলভ হাস্যকর প্রয়াস। উপমাটা টানলাম এইজন্যে যে, আমরা যদিও অনেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গে সগৌরবেই বলে থাকি,—এর সৃষ্টি-প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্যের মহিমা শতমুখে প্রচার করেও শেষ করা যায় না ইত্যাকার নানা কথা; —তবু আশ্চর্য, আমাদের নিজ-নিজ সীমিত বিদ্যাবুদ্ধি অনুপাতে মাত্র দু-একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের নাম উদ্ধৃত করে সমগ্র রবীন্দ্রসঙ্গীতকেই বোঝাবার এবং চেনাবার জন্য আবার আমাদের মধ্যে ব্যাকুলতার শেষ নেই॥ কার্যকর হিসাবে এমনতর কাজ যথোচিত হয় কি, হয় না—এর বিচার আমরা তেমন করিনে। কেননা ওই বিচার না করার খুশিতেই আমরা অভ্যস্ত ও অনেক সময় অল্পাধিক আত্মবিস্মৃত। তাই এই লাগা পুরোবর্তী অধ্যায়ের শুরুতেই সেই কথাই বলেছিলাম, যে প্রদীপ জ্বালিয়ে আকাশের আলো-কে দেখানো যায় না বটে, তবু

দীপালী উৎসব জমাবার জন্যে পৃথিবীর বুকে প্রদীপ সাজিয়ে রাখারও দরকার আছে বৈকি কিছু-না-কিছু; এতেও কাজ দেয়।)

অনেকের মুখে শুনা যায়,—রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর গানগুলি ছাড়া সারাজীবনে আর কিছু না-ও লিখতেন—তাহলেও তাঁর সৃজনধর্মী প্রতিভা জগৎবাসীর চিত্তে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকত,—কেবলমাত্র ঐ গানগুলিরই জন্যে। কথাটা মিথ্যা নয়। কারণ, রবীন্দ্রপ্রতিভার যা কিছু সুন্দর মহৎ বরণীয় ও স্মরণীয়—এর সমস্তই তাঁর গানে এমন ভাবে একাত্ম হয়ে আছে যে কবি রবীন্দ্রনাথকে জানবার ও বোঝবার জন্যে আর কিছু খুঁজতে হয় না—তাঁর গানগুলিই যথেষ্ট।

আগেই বলা হয়েছে,—ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে কবিগুরু নিজেই তাঁর গানগুলিকে বিভিন্ন পর্যায়ে সাজিয়েছেন—পূজা, প্রেম, প্রকৃতি ইত্যাদি নামে। আবার এইগুলিব মধ্যেও আছে বিষয়-বিন্যাসের অপূর্ব বৈচিত্র্য;—ভিন্ন ভিন্ন নামেতে সাজানো। যথা—

পূজা পর্যায়ে: গান॥ বন্ধু॥ প্রার্থনা॥ বিরহ॥ সাধনা ও সংকল্প॥ দুঃখ॥ আশ্বাস॥ অন্তর্মুখে॥ আত্মবোধন॥ জাগবণ॥ নিঃসংশয়॥ সাধক॥ উৎসব॥ আনন্দ॥ বিশ্ব॥ বিবিধ॥ সুন্দর॥ বাউল॥ পথ॥ শেষ॥ পরিণয়॥ স্বদেশ॥

প্রেম পর্যায়ে: গান॥ প্রেমবৈচিত্র্য॥

প্রকৃতি পর্যায়ে: সাধারণ॥ গ্রীষ্ম॥ বর্ষা॥ শরৎ॥ হেমন্ত॥ শীত॥ বসন্ত॥ বিচিত্র॥ আনুষ্ঠানিক॥

উল্লিখিত পূজা, প্রেম, প্রকৃতি পর্যায়ের অতিরিক্তও কয়টি গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য রচনা করে—কবি রবীন্দ্রনাথ, আমাদের বাংলাগানে যে এক নূতন-অধ্যায়ের সূচনা করে গেছেন—তার কোনো তুলনাই মেলে না। (এ সমস্তই গীতবিতানগ্রন্থের তিন খণ্ডে সুসংকলিত হয়েছে।) আরো বিশেষ কথা, কবিগুরু একবার বলেছিলেন: "গান জিনিষটা গগনেব, ছবি জিনিসটা হচ্ছে অবনীব। অসীম যেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি,— অসীম যেখানে সীমাহীনতায় সেখানে গান। রূপরাজ্যের কলা ছবি, অরূপরাজ্যের কলা গান। কবিতা উভচর, ছবির মধ্যেও চলে,—গানের মধ্যেও ওড়ে। কেননা কবিতার উপকরণ হচ্ছে ভাষা। ভাষার একটা দিকে অর্থ, আর-একটা দিকে সুর—এই আথব যোগে ছবি গড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান"—(রবীন্দ্র-বচনাবলী ১৪শ খণ্ড, পৃ ৯৯১)। (এ সকল কথার তাৎপর্য, 'গীতবিতান' আদ্যন্ত পড়লে অনুধাবন করতে কোনো অসুবিধা হয় না কাবো। তাই মনে হয়, সুরের মায়া লাভের এবং কবিতা পাঠের আনন্দ একত্রে মিশিয়া যাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি শুধুমাত্র পড়বারও সুযোগ পান—পড়ে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারেন, —এবং সুরের আলপনায় আপন চিত্তপটে ছবি আঁকবারও অবকাশ পান যাঁরা, তাঁরা যথার্থই বড়ো ভাগ্যবান।

গান, ছাব, কবিতা, ভাষা

এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতির সূত্র ধরে যদি ভাবি তাহলে বোঝা যায়,—বিরাট বিশ্বে মানব-সংসারের নানা ফসলের সন্ধান নিয়ে বয়ে চলেছে রবীন্দ্র-গীতি-প্রবাহ। এই গীতি-বদ্ধ সুর ও বাণীগুলি শোনামাত্রই অন্তর ভরে ওঠে কত অজানা অনুভূতিতেই না! সমুখের আবরণ আশ্চর্যভাবে সরে যেতে থাকে একটার পর একটা,—যা ভাবিনি কখনও তাই অনুভব করি,—যা দেখিনি তা-ই দেখতে পাই! এমন কত কিছু সব প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে থাকে—যা আমাদের এই জীবনেরই অন্তর্গত—অথচ অজ্ঞানতার আড়ালে ঝাপসা হয়ে ছিল অনেক কাল,—ছিল বহুদূরে,—সেই সমস্তই কাছে এসে ক্রমশ ঘিরে দাঁড়ায়—অনুভবের ভিতর স্পষ্ট রূপ নেয়। আসলে, প্রতিদিনকার আবেষ্টনজনিত শিক্ষা ও সংস্কারের প্রভাবে আমরা নিজেরাই অনেক সময়, নিজেদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকি,—সেই ঔদাসীন্য থেকে আমাদের মুক্তি দেয় এই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরই গান! অত্যন্ত ক্ষণিক এবং অস্পষ্ট আকারে হলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈচিত্র্যময় সুর ও বাণী কিন্তু আমাদের অনেকের কাছে—এক অদৃশ্য বন্ধনমুক্তির মন্ত্র-স্বরূপ। কবিগুরুর নিজ বর্ণনাতেই পাওয়া যায়,—গান তাঁর বাণীর প্রতীক, তাঁর অন্তরের প্রেরণা—একেই আশ্রয় করে বিশ্বনিয়ন্তার সঙ্গে 'সুরে-সুরে তালে-তালে' তার সেতু নির্মাণের অন্তহীন আলাপন। আজকের দিনে এসব কথা কার বা অজানা,যে, একেবারে শৈশব থেকে প্রাণের সন্ধ্যা ও রাত্রি পর্য্যন্ত দীর্ঘ-কালের পথ-চলার অপূর্ব সব কাহিনী কবিগুরুর গানের বাঁশিতে বেজেছে, আলোয় জ্বলেছে; মনের নীরবতায় ধ্বনিত হয়েছে তাঁর এই দরদময় সৃষ্টির বৈচিত্র্য। গানকেই করলেন তিনি তাঁর 'শেষপারানীর কড়ি'। সাথ-সাথ বললেন: 'পার হব কি নাই হব, তার খবর কে রাখে।' এখানেই রইল তাঁর অটল বিশ্বাস এই বলে: 'আমি যাবই যাব—কেন তোমরা মিছে ভাব'। 'গানের ভিতর দিয়ে' ভুবনকে দেখলেন, চিনলেন তিনি; এই দেখার চোখটি আমাদেরও তৈরি-করে দিলেন তেমনি ভাবে। 'অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরা'র অনুভবটুকুও ত পেলাম আমরা তাঁরই গানের সুরে,—তাঁরই গানের কথায়! গানে গানে তিনি জানিয়ে গেছেন কত বড় দুঃসহ সৌভাগ্য বহন করতে হয়েছিল তাঁকে,—অবসর ত তিনি চান নি। 'আসা-যাওয়ার পথের ধারে' গান শুনিয়েই তাঁর দিন কেটেছে। তবু আক্ষেপ করেছেন, 'যে গান গাইতে' হেথায় এসেছিলেন 'তা আজও হয়নি গাওয়া'। তাই বোধকরি সুরের তার বাঁধতে গিয়েই, সে-তারে তৃপ্তির সুর বাজল যখন, বললেন: তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে-ক্ষণ'। তবু 'যেন এই কথাটি বাজে মনের সুরে'—বলে নিজের মধ্যেই নিশ্চিন্ত হতে চাইছেন: 'তুমি আমার কাছে এসেছ আমায় ভালো বেসেছ…সেই অজানা পারাবারে এক তরীতে তুমিও ভেসেছ'। এ সবের ভিতরে আছে চিরন্তন উপদেশটুকু-ও: 'জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে।' সারা জীবনই যদি কাটল গানের সাধনায় তবু বললেন: 'নতুন নতুন বাঁকে বাঁকে গান দিয়ে যাই ধরিত্রীরে'। গানের সুরের মালায় জীবনের সুখদুঃখ

হাসিকান্নাকে গেঁথে নিয়ে তেমনি একদিন বরও চেয়ে রাখলেন : 'মরণ হতে যেন জাগি গানের সুরে'।

(এমনিভাবে গঙ্গাজল দিয়ে গঙ্গাপূজো সারার মত আর কত উদাহরণ টানব? ঘুরেফিরে সেই আগের কথাতেই আসতে হয়,—রবীন্দ্রগীতসমুদ্র থেকে যৎসামান্য বারিবিন্দু আহরণ করে এনে অপরকে তা দেখাবার মধ্যেও আছে আমাদের এক বালসুলভ আকুলতা, পরিতৃপ্তি—যদিও সবাই জানেন, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বিষাদে মিলনে-বিচ্ছেদে ; এককথায়,—নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে—কোথায় বা নেই রবীন্দ্রসঙ্গীত!)

যাঁরা শান্তিনিকেতন-আশ্রমে গেছেন তাঁরা দেখে থাকবেন,—সেখানকার নানা উৎসবের উপযোগী কত বিচিত্রভাবের গান রচনা করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর রূপসৃষ্টির প্রতিভাকে ভাষা দিয়ে বোঝাবার স্পর্ধা রাখিনে, তবে অতি সাধারণদের চোখ দিয়ে কবিগুরুরই জীবদ্দশায় যা প্রত্যক্ষ করেছি, তা একটু বলি প্রসঙ্গত : তাঁর নিজস্ব বিচিত্র কল্পনাকে যখনই বাস্তবে রূপায়িত করতেন তিনি, তখনই তা হয়ে দাঁড়াত অতুলনীয় অকল্পিত কিছু। যেমন,—প্রতি বৎসর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, কত নব নব ঋতু আমাদের দুয়ারে এসে ফিরে ফিরে যায়—ক'জনেই বা তার খবর রাখে! কিন্তু পূজনীয় গুরুদেব আমাদের শেখালেন,—ঋতুগুলি, দিবস-রজনীরই অনুরূপ অদৃশ্য অগম্য বিধাতার পদক্ষেপ মাত্র,—এদেরও আমন্ত্রণ জানানো উচিত গানের মাধ্যমে—তাহলে হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায় তাঁর আবির্ভাব। সৃষ্টি করলেন 'ঋতু উৎসব',—গানে গানে মুখর হয়ে উঠল তা। এই ধরনেরই আরো উৎসব অনুষ্ঠানের নাম করা যেতে পারে যা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছিল আমাদের ভারতবর্ষে,—তাদেরে নূতন রূপ দিয়ে সংগীত-মুখরিত ও বৈশিষ্ট্যময় করে তুললেন সুরেরগুরু কবি রবীন্দ্রনাথ। নিঃসংশয়ে বলা যায়,—এযুগে এ-সমস্ত তাঁর শুচিশুভ্র প্রবর্তনারই বিস্ময়কর নিদর্শন।

আরো কত কি নববর্ষের উৎসব, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, গৃহাদির ভিত্তিস্থাপন, গৃহপ্রবেশ, বিভিন্ন রকমের প্রতিষ্ঠাদিবস, সভাসমিতি, সম্মেলন ইত্যাদি উপলক্ষ্যে গাইবার উপযোগী অসংখ্য গান রচনা করলেন তিনি। বোধকরি কোনো বিষয়ে কোনো দিক দিয়েই বাকী রাখেন নি। খেলার গান, পথে চলতে চলতে গাইবার গান, বিদায়ের গান, চাষ করা ও ধান কাটার গান, হাসি তামাসার গান, বিবাহ ও জন্মদিনের গান, মৃত্যুদিনের গান—এ সব নিয়েও এক সুদীর্ঘ তালিকা তৈরি করা চলে। সোজা ও সহজ ভাষায় আমরা বলতে পারি, কবিগুরু এমন কতকগুলি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গান রচনা করলেন যা নিয়ে গান রচনা করার কথা আধুনিক জগতে এমন করে তাঁর আগে কেউ সম্ভবত ভাবতেই পারেন নি। দেশের সমস্ত গীতিকারের খবর জানিনে, জানা সম্ভবও নয়—তবে এটা ঠিক যে আমাদের কঠোর বাস্তব জীবনকে নানা দিক থেকে নানা রূপেতে সংগীতের রসে আপ্লুত করবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ করেছেন আপ্রাণ—আমরণ। এবং প্রতিটি চেষ্টা তাঁর, সার্থক রূপ নিয়েছে তাঁরই লোকোত্তর প্রতিভার গুণস্পর্শে।

সর্বশেষে এইটুকু বলি—উপরে পূজা, প্রেম ও প্রকৃতি পর্যায়ের যে তালিকাবিন্যাস করা হয়েছে—এর মধ্যে বহুগানকে কিন্তু আবার অন্যভাবেও বিচার করা চলে,—অর্থাৎ পরিবেশের পার্থক্যে এক একটি গান নূতনতর উজ্জ্বলতর হয়ে দেখা দেয়—গানের মালায় তার রং বদলায়। মোটকথা রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে বিষয়বস্তু বৈচিত্র্য অধিকতররূপে উপলব্ধির জন্যে রবীন্দ্রগীতশিক্ষার্থী, গীতশিল্পী এবং আলোচক মাত্রেরই রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাট্য প্রবন্ধাদির সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয় রাখা সর্বতোভাবে একান্ত কর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য

বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া ও মায়ার খেলা—এই তিনটি রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্য বলে সুবিদিত বটে, কিন্তু তা ছাড়াও একটু অন্য ধরনের আরো কয়টি গীতিনাট্য লিখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, যথা: বসন্ত, ঋতুরঙ্গ, নবীন ও শ্রাবণ-গাথা। আর তাঁর নৃত্যনাট্যগুলি হল: চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ও শ্যামা। এইসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে,—কবিগুরু তাঁর প্রথম জীবনের লেখা 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যটিকে শেষ বয়সে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করার আয়োজন করেছিলেন। সে আয়োজন কবির জীবিতকাল মধ্যে কতটুকু পূর্ণতা লাভ করেছিল—এর বর্ণনা বিশ্বভারতী গীতবিতান-৩য় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

এই চলতি নিবন্ধে কেবলমাত্র বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া, মায়ারখেলা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ও শ্যামা—এই কয়টিরই সংক্ষিপ্ত আখ্যান দেওয়া হচ্ছে।

॥ বাল্মীকিপ্রতিভা ।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমবারই বিলেত থেকে কতকগুলি আইরিশ মেলাডিজ শিখে নিয়ে স্বদেশে ফিরেছিলেন ১৮৮০ সালে, তখন তাঁর বয়স কুড়ি বৎসর সম্পূর্ণ হয়নি। সেইবয়সেই তৈরি করলেন 'বাল্মীকিপ্রতিভা'—তাঁর প্রথমগীতিনাট্য। এই সম্পর্কে কবি লিখেছেন: "দেশী ও বিলাতীসুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে;··· সঙ্গীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। সঙ্গীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকলপ্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল।···বস্তুত, বাল্মীকিপ্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সঙ্গীতের একটি নূতন পরীক্ষা"—(জীবনস্মৃতি, পৃ ১০৭)।

'বাল্মীকিপ্রতিভা' গীতিনাট্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

'রামায়ণ' রচয়িতা বাল্মীকি কবিত্ব লাভের আগে প্রথমজীবনে দস্যুদল নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন।···কোনো এক অমাবস্যায়, তাঁর নির্দেশ মত, দলের দস্যুরা একটি অসহায়

মেয়েকে কালীপূজার জন্য বলির উদ্দেশ্যে ধরে নিয়ে আসে। ···মেয়েটি তখন স্বভাবতঃ ভয়ে কাঁদতে লাগল। সেই করুণ দৃশ্য বাল্মীকিকে অভিভূত করে এবং বাল্মীকি তক্ষুনি তাকে ছেড়ে দেবার আদেশ দেন।···

সেই থেকে বাল্মীকির মনে আসে এক অদ্ভুত পরিবর্তন। দল নিয়ে বনে বনে শিকারের উদ্দেশ্যে ঘোরেন বটে, কিন্তু নির্মম হত্যায় তাঁর মন আর আগের মত তেমন সায় দেয় না। ফলে, তাঁর অনুগামীরা তাঁকে ছেড়ে চলে যায়।··

একদিন···গাছের ডালে বসা একজোড়া পাখিকে শিকার করতে উদ্যত দুটি' ব্যাধকে বাধা দিলেন বাল্মীকি। ব্যাধরা সে-বাধা গ্রাহ্যই করল না এবং তাদের নিক্ষিপ্ত বাণে বিদ্ধ হয়ে একটি পাখি যেই না মাটির উপর আহত হয়ে পড়ল অমনি বাল্মীকি অভিশাপ দিলেন: 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং'···

বাল্মীকি নিজেই তা শুনে অবাক,—কী ভাবে যে তাঁর রসনায় সহসা এমনতর দেবভাষা উচ্চারিত হল! ··তিনি এতদিন ছিলেন কালী-প্রতিমার একনিষ্ঠ সাধক, আজ সেই কালীর স্থলেই দেখতে পেলেন সরস্বতী-প্রতিমা।

সরস্বতী দেখা দিয়েই অদৃশ্য হলেন।···

বাল্মীকি কিন্তু সেই ছলনায় ভুললেন না। তিনি কালীকে ছেড়ে উন্মত্তের মত খুঁজতে বেরুলেন সেই হারিয়ে-যাওয়া সরস্বতীকে।···

তখন তাঁর সামনে লক্ষ্মী এসে উপস্থিত। বলেন: আমি তোমায় ধনরাশি সব দিচ্ছি—সরস্বতীর সন্ধান তুমি ছেড়ে দাও।

লক্ষ্মীর কথা শুনলেন না বাল্মীকি।···

অতঃপর তাঁর আকুল অন্বেষণে সরস্বতীর হল পুনরাবির্ভাব।

এবার এই আবির্ভাবের মধ্যেই বাল্মীকি দেখলেন সেই মেয়েটিকে, যাকে দস্যুরা একদিন ধরে বেঁধে নিয়ে এসেছিল তার কাছে, বলির উদ্দেশ্যে—আর বাল্মীকি মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

বাল্মীকির চৈতন্য হল। বুঝলেন, আগে দস্যুবৃত্তির মাধ্যমে তিনি যখন অবলীলায় জীবহত্যা করতেন তখন তাঁর পাষাণহৃদয়কে এসে গলিয়েছিল যে মেয়েটি—সে অন্য কেউ নয়—স্বয়ং সরস্বতী, জ্ঞানের আলো। তাঁর অন্তর আগে ছিল অজ্ঞানে ঢাকা তাই সরস্বতীর রূপটি তিনি দেখতে পাননি এতকাল! এবার গাইলেন:

"এই-যে হেরি গো দেবী আমারি!···
তুমিই কি দেবী ভারতী!·· রব চিরকাল চরণ ধরি তোমারি!"

এই সরস্বতীর হাত থেকে, পরিশেষে, বাল্মীকি বীণা উপহার পান,—আর পান কবিত্ব লাভের পুণ্য আশীর্বাদ।

[বাল্মীকিপ্রতিভা: গীতিনাট্য ॥ প্রকাশকাল: ১২৮৭ (ইং ১৮৮১) ফাল্গুন]

॥ কালমৃগয়া ॥

'বাল্মীকিপ্রতিভা'র গান রচনায় উৎসাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ এবই পরের বৎসর আরেকটি গীতিনাট্য লিখলেন ওই একই শ্রেণীর—নাম দিলেন 'কালমৃগয়া'। বিষয় হল: রাজা দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ এবং পরে দশরথের প্রতি অন্ধমুনির অভিশাপ। এই প্রসঙ্গে কবি জানিয়েছেন, তাঁদের জোড়াসাঁকো-বাড়ির তেতালার ছাদে ষ্টেজ খাটিয়ে এর প্রথম অভিনয় হয়েছিল। উপস্থিত শ্রোতারা এর রসে অত্যন্ত বিচলিত হন। অবশেষে এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকিপ্রতিভার (২য় সংস্করণের) সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যে কারণে তাঁর তৎকালীন গ্রন্থাবলীতে 'কালমৃগয়া' ছিল অপ্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তাঁর জীবনস্মৃতি গ্রন্থের ১০৮ পৃষ্ঠায়: "বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যে-উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে-উৎসাহে আর-কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে।···একটা দস্তুরভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা। এইজন্য উহাদের মধ্যে তাল-বেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি-বাংলার বাছবিচার নাই। আমার অনেক মত ও রচনারীতিতে আমি বাংলাদেশের পাঠকসমাজকে বারম্বার উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছি,—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সংগীত সম্বন্ধে উক্ত দুই গীতিনাট্যে যে দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কেহই কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই এবং সকলেই খুশি হইয়া ঘরে ফিরিয়াছেন।"

'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

একটি মাত্র পুত্রকে নিয়ে তপোবনে থাকেন অন্ধঋষি।

বনে ফুল ফোটে, ফল ধরে, পাখিরা কলরব করে আনন্দে, অদূরে সরযূ নদী কুলুকুলু ধ্বনিতে বয়ে যায়। এই পরিবেশের মধ্যে বেদ-অধ্যয়ন করেন—শান্তিতে দিন কাটান ওঁরা। আর আছেন সেখানে ঋষিকুমারের খেলার সঙ্গিনী লীলা।

একদিন তৃষ্ণার্ত হয়ে অন্ধঋষি তাঁর পুত্রের কাছে জল চাইলেন।

পুত্র বেরুল জল আনতে।···আকাশে তখন ঘনঘটা—বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে অবিরত।

অন্যদিকে···অযোধ্যার রাজা দশরথ বেরিয়েছেন মৃগয়ায়। সঙ্গের শিকারীদের পাঠিয়েছেন বনের এদিক-ওদিক।···নিজেও মৃগয়া-উপযোগী হস্তিশাবকের অনুসন্ধানে হঠাৎ এসে পড়লেন অজানা এক গভীর বনের ভিতর। লক্ষ্যচ্যুত হয়ে বলেছেন: যাক্ না যাবে সে কত দূর—আমি যাব পিছে-পিছে······

কিন্তু, অন্য শব্দ শুনে বিভ্রান্ত হলেন রাজা দশরথ। তবু তাঁর সংকল্প, এ শিকার তাঁর হাত-ছাড়া হবে না—চোখের আড়ালে লুকালেও।

জটিল বন, তার উপর চারিদিকে ঘোর অন্ধকার—দৃষ্টি তাঁর স্বভাবত আবদ্ধ।

ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে শুধু কান পেতে শুনলেন, বুঝি-বা ঐ হস্তিশাবক জলপান করছে কোথাও। তাই অন্য কিছু না ভেবে 'শব্দভেদী' বাণ ছুঁড়লেন দশরথ।...সেই মুহূর্তেই কিন্তু অন্ধমুনির পুত্র নদী থেকে পাত্র ভরে জল তুলছিলেন তাঁর তৃষ্ণার্ত পিতার জন্যে। ঐ জল তোলার শব্দ অনুসরণ করেই দশরথের নিক্ষিপ্ত বাণ এসে ঋষিকুমারকে বিদ্ধ করল।......

ঘটল অঘটন অতর্কিতে।...

বাণবদ্ধ কুমারের মৃতদেহ নিয়ে রাজা দশরথ অন্ধঋষির কাছে গেলে পর পুত্রশোকে-আবিষ্ট ঋষি তাঁকে অভিশাপ দেন :

॥ পুত্র ব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাংপ্রতম্
এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যসি ॥

তা শুনে সকাতরে ক্ষমা চাইলেন দশরথ।

...অন্ধঋষি কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থেকে অবশেষে বললেন : "শোক তাপ গেল দূরে—মার্জনা করিনু তোরে!"—এরপর বললেন মৃতপুত্রকে উদ্দেশ করে : "যাওরে অনন্তধামে মোহমায়া পাশরি—দুঃখ আঁধার যেথা কিছু নাহি। জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে-লোকে, কেবলি আনন্দস্রোত চলিছে প্রবাহি।...যাও বৎস, যাও সেই দেব সদনে।"

[কালমৃগয়া : গীতিনাট্য ॥ প্রকাশকাল : অগ্রহায়ণ ১২৮৯ (১৮৮২ ইং)]

॥ মায়ার খেলা ॥

রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৮৬ সালে 'সখিসমিতি' নামে একটি মহিলা সমিতি স্থাপন করেন। এ-নামটি কবি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। উক্ত সখিসমিতিরই কোনো এক শিল্পমেলায় অভিনীত হবার উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ, তাঁর 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনার অনেককাল পরে ১৮৮৮ সালে 'মায়ার খেলা' নাম দিয়ে রচনা করলেন আরেকটি গীতিনাট্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন : "মায়ার খেলা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা,—'মায়ার খেলা' তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, 'মায়ার খেলা' যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়া ছিল।"

কবিগুরুর উপরোক্ত বক্তব্য বিশেষভাবে স্মরণ রেখেই 'মায়ার খেলা' অনুধাবনে প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন। তাছাড়া 'মায়ার খেলা' লেখার পরেও কবির মনে সংশয় জেগেছিল—তত্র পরিবেশিত বিচ্ছিন্ন গানগুলির মধ্যে এই নাট্যকাব্যের আখ্যান সংগ্রহ করা পাঠকদের পক্ষে দুরূহ বোধ হতে পারে; তাইজন্যে এর সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা নিজেই রচনা করেছিলেন। এখানে সেই সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকাকেই আরো সংক্ষিপ্ত করা হল :

* * *

মানবহৃদয়ে নানাবিধ মায়ার সৃষ্টি করে মায়াকুমারীরা।

একদিন ওরা স্থির করল, মায়ার খেলা খেলবে—যুবক-যুবতীদের নবীনহৃদয়ে নবীনপ্রেম রচনা করে।...

এই নাট্যের নায়ক অমর—নবযৌবনে বিকশিত। এর প্রতি শান্তার ভালবাসা পূর্বাবধি! তা-সত্ত্বেও অমর সহসা এক অপূর্ব আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে এবং উদাসভাবে অনুরূপ মূর্তির সন্ধানে বেরিয়ে যায়। ফলে তাব পূর্বানুরাগিনী শান্তা উপেক্ষিত হয়।

মায়াকুমারীরা পরিহাসচ্ছলে গেয়ে ওঠে: 'কাছে আছে দেখিতে না পাও, কাহার সন্ধানে দূরে যাও!'

প্রমদা নামে আরেকটি কুমারী মনের আনন্দে হাসে, খেলে, বেড়ায়। তার প্রতি অনুরক্ত দুইটি যুবক,—অশোক ও কুমার। কিন্তু প্রমদা তা ভ্রূক্ষেপ করে না। মায়াকুমারীরা হাসে, মন্তব্য করে: 'এ গর্ব তোমার থাকবে না চিরদিন'।...

এদিকে অমর তার মানসীমূর্তি খুঁজতে খুঁজতে প্রমদার ক্রীড়াকাননে এসেছে। প্রমদাকে দূর থেকে লক্ষ্য করছে। প্রমদাও এই আগন্তুক-অমরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার সখিদের বলে, 'ওকে একবার জিজ্ঞেস করে আয়,—ও কী চায়?' সখিরা অমরের কাছ থেকে কোনো স্পষ্ট জবাব পেল না।

শুধু মায়াকুমারীরাই বুঝল যে, প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে।

অমরের মনে ক্রমশ: প্রমদার প্রতি আসক্তি প্রবল হতে থাকে। তেমনি, অমরের প্রতি প্রমদার। কিন্তু প্রমদার সখিরা অমরকে পারে না বিশ্বাস করতে। উপরন্তু মাঝখানে এসে ভর্ৎসনা করে। এর ফলে সরলহৃদয় অমর প্রকৃত অবস্থাটি না বুঝে হতাশ্বাসে ফিরে যায়।...প্রমদাও লজ্জায় বাধা দিতে পারে না।

অমরের অসুখী অশান্ত মন ফিরে দাঁড়াল শান্তার দিকে। দীর্ঘবিরহে শান্তার অচ্ছেদ্য-গূঢ়বন্ধন মর্মেমর্মে অনুভব করল অমর এবং শান্তার কাছেই আত্মসমর্পণ করল।...অন্যদিকে প্রমদার সখিরা ভেবেছিল, অমর বুঝি আবার ফিরে আসবে;—কিন্তু অমর ফিরল না।

শান্তা এবং অমরের মিলনোৎসব।...শান্তার গলায় যেই না অমর ফুলের মালা দিতে যাচ্ছে অমনি সেখানে ম্লান ছায়ার মত প্রমদা এসে দাঁড়ায়। তাই দেখে আত্মবিস্মৃত অমরের হাত থেকে ফুলের মালা খসে পড়ে। ফলত শান্তা আর অন্য সবাই ভাবে,—অমর ও প্রমদা উভয়ে বুঝি গোপনে প্রেমাবদ্ধ। শান্তাও তাই, অমর এবং প্রমদার মিলন সংঘটনে প্রবৃত্ত হয়।

কিন্তু আপত্তি জানায় প্রমদা।

অমর ত আগেই শান্তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, এবার আরো বিশদভাবে শান্তাকে লক্ষ্য করে বলল: 'আমি মায়াচক্রে পড়ে নিজের সুখ নষ্ট করেছি, এখন আমার এই ম্লান মালা কা'কে দেব,—কেই বা নেবে?'

শান্তা ধীরভাবে আশ্বাস দেয়: 'আমি নেব। আমি বইব তোমার দুখের ভার।

তোমার সাধের ভুল প্রেমের মোহ কেটে গেছে,—এই ভুলভাঙ্গা দিবালোকে তোমারই মুখপানে চেয়ে আমার হৃদয়ের গভীর প্রশান্ত সুখের কথা তোমায় শোনাব।'

এইরূপে অমর ও শান্তার মিলন হয়। প্রমদা ফিরে যায় তার শূন্যহৃদয় নিয়ে। মায়াকুমারীরা গান করে :

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মিলে না,
শুধু সুখ চলে যায়,—এমনি মায়ার ছলনা।

ওদের মায়ার খেলারও সমাপ্তি এখানেই—

[মায়ার খেলা : গীতিনাট্য ॥ প্রকাশ কাল : অগ্রহায়ণ ১২৯৫ (১৮৮৮ ইং)]

॥ চিত্রাঙ্গদা ॥

রবীন্দ্রনাথ একবার শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা যাচ্ছিলেন রেলগাড়িতে। তখন বসন্তকাল। যাবার পথে রেল লাইনের ধারে প্রাকৃতিক দৃশ্য কবিকে আকৃষ্ট করে। তিনি তাই লিখলেন : 'কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তাহলে সে তার স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে।' ইত্যাদি—

বস্তুত এইটাই হল রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক রচনার গোড়াকার কথা। উক্ত ভাবটিকে, কবি বলেছেন, যখন নাট্যাকারে রূপ দেবার ইচ্ছা হল তখনই মনে পড়ল তাঁর মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। উড়িষ্যার পাণ্ডুয়া বলে এক নিভৃত পল্লীতে গিয়ে ১২৯৯ সালে তিনি লিখলেন 'চিত্রাঙ্গদা'। সেই চিত্রাঙ্গদাটিকেই আরো বহু বৎসরকাল পরে, ১৩৪৩ সালে কবি নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেন।

'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মণিপুররাজের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে, তাঁর বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তাসত্ত্বেও ঐ রাজকুলে জন্ম হল চিত্রাঙ্গদার। রাজা তাকে পুত্ররূপেই পালন করতে লাগলেন। এর পরিণতিতে রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করলেন, শিখলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজদণ্ডনীতি এই সব। নারীদের অনুরূপ কোনো বিলাস-চাতুরী নেই তাঁর,—পুরুষবেশে যুবরাজরূপে তাঁর যত্রতত্র যাতায়াত।

পাণ্ডুপুত্র অর্জুন বারো বৎসরের ব্রহ্মচর্যব্রত নিয়ে বনে বনে ভ্রমণ করছিলেন।

সেইসময়—সহসা একদিন তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন চিত্রাঙ্গদা। এবং নিজ অপ্রাকৃত পৌরুষের পরিচয় দিতে গিয়ে অর্জুনের কাছে যখন উপেক্ষিত হলেন, তখন বুঝলেন, নারী হয়ে নারী জীবনের সার্থকতা লাভের সুযোগ যেন ব্যর্থ হল তাঁর।

পরদিন এই অনুভবের ফলশ্রুতিতে চিত্রাঙ্গদা তাঁর পুরুষবেশ ছেড়ে পরলেন রক্তাম্বর,

কংকণকিংকিনীকাঞ্চি। আবার বেরুলেন অর্জুনকে দেখবার প্রত্যাশায় অঙ্গে ঐ অনভ্যস্ত সাজ নিয়ে—একান্ত সসংকোচে।…কিন্তু যখন দেখা হল, চিত্রাঙ্গদা শুনলেন অর্জুন বলছেন: 'পতিযোগ্য নহি, বরাঙ্গনে! আমি ব্রহ্মচারিব্রতধারী—ক্ষমা কর আমায়।'

প্রত্যাখ্যানের গ্লানিতে চিত্রাঙ্গদার মন ভরে উঠল। অথচ অর্জুন তাঁর আজন্মের বিস্ময়।…বেদনাহত চিত্তে তিনি আরাধনা করলেন মদনের।…

মদনের বর পেয়ে মণিপুর রাজকন্যার অঙ্গ পুষ্প-লাবণ্যে অতুল্য হয়ে উঠল।

এবার অর্জুন মুগ্ধনয়নে তাকালেন নবরূপী দেহলাবণ্যময়ী চিত্রাঙ্গদার প্রতি।

চিত্রাঙ্গদা তখন সশ্রদ্ধ আহ্বানে অর্জুনকে বলেন: 'আর্য, তুমি অতিথি আমার। এ বনভূমি আমারই আশ্রয়। বল, কী সংকারে তুষিব তোমায়!'

অর্জুনের সম্যক পরিচয় পেলেন চিত্রাঙ্গদা। তবু তিনি ভাবতে থাকেন, তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল বটে, কিন্তু মদনদেবের কাছ থেকে বর হিসেবে পাওয়া এ-রূপটি যে তাঁর মিথ্যে, সজ্জাও মিথ্যে—এই দিয়ে কি নিজের প্রেমাস্পদকে কখনও প্রবঞ্চনা করা চলে! কাজেই তাঁকে জানাতে হয় স্পষ্টোক্তি: হে পার্থ, বীর তুমি। তুমি বিশ্বজয়ী। আমি ত শুধুমাত্র নারী—এ ক্ষণিকের অর্ঘ্য কি আর তোমার যোগ্য উপহার!

অর্জুন অভিনন্দন জানান: 'এসো সখি, দুঃসাহসীপ্রেম বহন করুক আমাদের—অজানার পথে।'…

চিত্রাঙ্গদা নিজের মনকে নিঃশংক করতে না পেরে আবার গেলেন মদনের কাছে।

মদন আশ্বাস দেন: ভয় নেই, ফুলের খেলা সাঙ্গ হলেই ত ধরবে ফল।…

চিত্রাঙ্গদা তাঁর লব্ধ বরটি মদনকে ফিরিয়ে দিয়ে অর্জুনের কাছে এসে এবার নিজের পরিচয় দিচ্ছেন: আমি মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা। আমি ত দেবী নই, নই সামান্যা নারী। আমাকে পুজো করে উঁচুতে তুলে রাখবে—সে আমি নই; আবার হেলায় পিছনে ফেলে রাখবে—সেও আমার কাম্য নয়। যদি তোমার সংকটে-সম্পদে আমায় কাছে রাখ, আর সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে,—তাহলেই আমায় চিনতে পাবে তুমি। আজ শুধু এটুকুই নিবেদন করি,—আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী।

চিত্রাঙ্গদার এই বর্ণনায় অর্জুন বিমুগ্ধ,—কৃতার্থ হন।

[চিত্রাঙ্গদা: নৃত্যনাট্য ॥ অভিনয় উপলক্ষে প্রথম প্রকাশ: মার্চ ১৯৩৬]

॥ চণ্ডালিকা ॥

'চণ্ডালিকা' নামে নাটক প্রথম রচিত হয় গদ্যে ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বরে, তখন উক্ত নাটকে মূলতঃ 'প্রকৃতি' এবং 'মা' এই দুটি মাত্র চরিত্রই ছিল।

রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে জানা যায়: "রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত নেপালী

বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দুলকর্ণাদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাই থেকে এই নাটিকার গল্পটি গৃহীত। গল্পের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী।"

'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' রচনার পরে কবিগুরু এই 'চণ্ডালিকা' নাটকটিকেও তদনুরূপ নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করার কাজে হাত দেন। ফলতঃ নাটকটির বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে আদ্যন্ত ছন্দে ও সুরে যখন রচিত হল তখন ১৯৩৮ সাল।

'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রকৃতি চণ্ডালের মেয়ে—সে অস্পৃশ্যা।

একদিন শ্রাবস্তীনগরে লাঞ্ছিত হল সে। টের পেল, কেউ তাকে ছুঁতেও চায় না। তাই আত্মধিক্কারে সংকল্প কবে, এই অপমানের অন্ধকারে যে তাকে পাঠিয়েছে—সেই দেবতাকে সে আর পুজো কববে না। বিষণ্নমনে সারাক্ষণ নিজ অদৃষ্টের কথা ভাবে; ফলে ঘরের কাজে আসে অমনোযোগ। তার মা কিন্তু এর কারণ কিছু বুঝতে পারে না—শুধুই তিরস্কার করে যায় প্রকৃতিকে।

সেই সময়…অনাথপিণ্ডদের উদ্যানে প্রবাস যাপন করছিলেন প্রভু বুদ্ধ।

তাঁর প্রিয়শিষ্য আনন্দ এক গৃহস্থের বাড়ীতে আহার শেষ করে বিহারে ফেরবার পথে তৃষ্ণা বোধ করলেন।

কুয়ো থেকে জল তুলছিল প্রকৃতি—তাব সামনে এসে দাঁড়ালেন আনন্দ।

বললেন: জল দাও

প্রকৃতি বলে: "প্রভু ক্ষমা কর, আমি চণ্ডালের কন্যা। আমার স্পর্শ জল অশুচি।"

এ জবাব শুনে আনন্দের কণ্ঠে বেজে ওঠে মানবধর্মের সত্য বাণী, অকুণ্ঠে তিনি বললেন: "ওগো কন্যা, যে মানব আমি—সেই মানব যে তুমিও। তুমি চণ্ডালী। সেকথা মিথ্যা—দারুণ মিথ্যা।…শ্রাবণেব কালো যে মেঘ, তার নাম যদি দাও 'চণ্ডাল'—তাবলে কি জাত ঘুচিবে তার—অশুচি হবে কি তার জল?" মন্ত্র দিয়ে গেলেন আনন্দ, প্রকৃতির কানে—বললেন: "নিন্দে করো না নিজেকে। মানবের বংশ তোমার,—মানবেরই রক্ত তোমার নাড়ীতে। আত্মনিন্দা পাপ, আত্মহত্যার চেয়েও বেশি।…বাজার বংশে দাসী জন্মায় অসংখ্য—তুমি সেই দাসী নও,…দ্বিজের বংশে চণ্ডাল কত আছে—নও তুমি সেই চণ্ডালী।"

আনন্দের মুখে এমনিতর সব কথা শুনে আর তাঁর রূপ দেখে প্রকৃতি মুগ্ধ হল। তাকে পাবার অন্য কোনো উপায় না দেখে সাহায্য চাইল মায়ের কাছে। তার মা জানত জাদুবিদ্যা, আকর্ষণীমন্ত্র প্রয়োগ করল সে।

অন্যদিকে—ভিক্ষু আনন্দ এই জাদুর শক্তি রোধ করতে পারলেন না—এসে উপস্থিত হলেন প্রকৃতির কাছে। প্রকৃতি তখন আত্মনিবেদন করে জানায়: "প্রভু,

এসেছ আমায় উদ্ধার করতে—তাই এত দুঃখই না পেলে। ক্ষমা কর।…ওগো নির্মল, পায়ে তোমার ধুলো লেগেছে—সার্থক হবে সেই ধুলো লাগা। আমার মায়া-আবরণ পড়বে খসে তোমার পায়ে—ধুলো সব নেবে মুছে। জয় হোক,—তোমার জয় হোক।"

'কল্যাণ হোক' বলে আশীর্বাদ করলেন আনন্দ।

কিন্তু—আনন্দের মনে তখন পরিতাপ উপস্থিত হল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন তিনি। ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধমন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালীর বশীকরণ বিদ্যা দুর্বল হয়ে গেল এবং আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।

[নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা স্বরলিপিসহ গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৩৪৫]

॥ শ্যামা ॥

শ্যামা নাট্যগীতিটি 'পরিশোধ' নাম নিয়ে ১৩৩৬ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম অভিনীত হয় কলিকাতা আশুতোষ-হলে। তার মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: " 'কথা ও কাহিনী'তে প্রকাশিত 'পরিশোধ' নামক পদ্য-কাহিনীটিকে নৃত্যাভিনয় উপলক্ষ্যে নাট্যাকৃত করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্তই সুরে বসানো। বলাবাহুল্য, ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়া অসম্ভব ব'লে কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্য।"—এই 'পরিশোধ' আরো কয়েকবৎসর পর ১৩৪৬ সালে কবিকর্তৃক পরিবর্তিত পরিবর্ধিত এবং সমৃদ্ধতর হয়ে যে রূপ নেয় সেটাই 'নৃত্যনাট্য শ্যামা' নামে পরিচিত। প্রসঙ্গত জানা দরকার,—'কথা ও কাহিনী' কাব্যে কবিগুরুর 'পরিশোধ' কবিতার শিরোনাম পার্শ্বে "মহাবস্তবদান" কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং ঐ মূল কবিতারই সাহায্যে নিম্নলিখিত বর্ণনা এখানে পরিবেশিত হল।

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের সংক্ষিপ্ত আখ্যান

রাজকোষ থেকে চুরি হয়ে গেছে—তাই রাজার আদেশ, যে করেই হোক চোর ধরা চাই; নৈলে নগরপালের 'মুণ্ড রহিবে না দেহে'।

সেই নগরে ব্যবসার উদ্দেশ্যে এসেছে বিদেশী বণিক বজ্রসেন। দস্যুর হাতে পড়ে সে দৈবাৎ নিঃস্ব। ভয়ে এদেশ ছেড়ে যখন পালাচ্ছিল তখন তাকেই চোর ভেবে নগরপালেরা বন্দী করে ফেলে।

সেই দৃশ্য দেখতে পায় নগরের প্রধানা সুন্দরী শ্যামা। নগররক্ষীকে ডেকে বলে: "আমার যা আছে তাই নিয়ে বিদেশী নির্দোষী বন্দীরে মুক্তি দাও।" রক্ষী জানায়, শ্যামার অনুরোধ রাখতে সে অসমর্থ।—তাসত্ত্বেও বন্দীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে শ্যামা দুদিনের সময় চাইল। প্রহরী রাজী হলে শ্যামা ঘোষণা করে: রাজপ্রহরীরা অন্যায়

অপবাদে—নিরীহের প্রাণ বধিবে বলে কারাগারে বাঁধে। ওগো শোনো—আছ কী বীর কোনো, দেবে কি ওরে জড়িয়ে মরিতে অবিচারের ফাঁদে—অন্যায় অপবাদে ॥

শ্যামাকে ভালবাসত বালক কিশোর উত্তীয়। সে শুনে বলে: "আমি ন্যায় অন্যায় জানিনে—শুধু তোমারে জানি। ওগো সুন্দরী, তুমি যা চাও—যা বল তাই আমি করব।"

…শ্যামা তখন রাজঅঙ্গুরী খুলে উত্তীয়কে দেয়।

উত্তীয় পরিতৃপ্ত মনে বেরিয়ে এসে প্রহরীকে ডেকে বলে: "প্রহরী, লহ মোরে বাঁধি। বিদেশী নহে সে তব শাসনপাত্র—আমি একা অপরাধী।"

"তুমিই তবে করেছ চুরি?"—সবিস্ময়ে শুধালো প্রহরী।

এর জবাবে শ্যামার দেওয়া রাজঅঙ্গুরীটি দেখিয়ে উত্তীয় প্রমাণ করে, যে, সে-ই চোর।

…এইভাবে ব্যর্থপ্রেমিক উত্তীয়, শ্যামার অনুনয়ে চুরি-অপবাদ শিরে নিয়ে, বিসর্জন দেয় আপন প্রাণ।…

অপর দিকে—বজ্রসেন বন্দীশালায় বসে মৃত্যুর অপেক্ষায় ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করছিল। শ্যামা শেষরাত্রে সেখানে গিয়ে বজ্রসেনকে নিঃশব্দে বের করে নিয়ে আসে।…

বজ্রসেন হতবুদ্ধি হয়ে জানতে চায় কী করে এটা ঘটল।

কিন্তু শ্যামা সব খুলে বলছে না।…ঘাটে বাঁধা ছিল তরী—বজ্রসেনকে নিয়ে সে, তরী ভাসিয়ে দেয় স্রোতে। এরই মধ্যে বারবার প্রশ্ন করে বজ্রসেন: "কহ মোরে প্রিয়ে, আমারে করেছ মুক্ত কি সম্পদ দিয়ে?" তবু শ্যামা নিরুত্তর। বজ্রসেন বলে সকৃতজ্ঞে: "মোর লাগি কি করেছ জানি যদি প্রিয়ে, পরিশোধ দিব তাহা এ জীবন দিয়ে।"

কিন্তু শ্যামার ঐ একই উত্তর: "সে কথা এখনো নহে।" তারপর….

'গুটায়ে সোনার পাল সুদূরে নীরবে—দিনের আলোকতরী চলি গেল যবে অস্ত-অচলের ঘাটে,—তীর উপবনে লাগিল শ্যামার নৌকা সন্ধ্যার পবনে।'

তখন…সুযোগ ও সময় বুঝে শ্যামা জানালো কিশোর উত্তীয়ের সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

সমস্ত শুনে বজ্রসেন ক্ষুব্ধস্বরে বলে: "কাঁদিতে হবে রে পাপিষ্ঠা, জীবনে পাবি না শান্তি।" অভিশাপ দিয়ে সে শ্যামাকে ছেড়ে চলে যেতে চায়। কিন্তু—'সহসা যুবার জানু সবলে বাঁধিয়া বাহুপাশে—শ্যামা উঠিল কাঁদিয়া: ক্ষমা কর নাথ'।

তবু শ্যামাকে আঘাত করে চলে গেল বজ্রসেন। ক্ষিপ্তের মত সারাদিন বাইরে ঘুরে ঘুরে অতঃপর 'দিনশেষে জ্বরতপ্ত দগ্ধ কলেবরে—ছুটিয়া পশিল গিয়া তরণীর 'পরে,—পতঙ্গ যেমন বেগে অগ্নি দেখে ধায় উগ্রআগ্রহের ভরে। হেরিল শয্যায় একটি নূপুর আছে পড়ি; শতবার রাখিল তা নিজ বক্ষে চাপি।' ডাকিল আকুল কণ্ঠে: "এসো এসো প্রিয়া।"

"এসেছি প্রিয়তম"—এবার বজ্রসেনের পায়ে পড়ে অনুতপ্ত শ্যামা বলতে থাকে: "ক্ষম মোরে ক্ষম। গেল না তো সুকঠিন এ পরাণ মম—তব নিঠুর করুণা করে।"

বজ্রসেন নীরবে তাকাল ক্ষণকাল। আলিঙ্গন করবে বলে হাত বাড়িয়ে—আবার চমকে উঠে, শ্যামাকে তিরস্কার করে: "কেন—কেন এলি ফিরে। যাও, যাও চলে যাও।"

অতঃপর বজ্রসেনকে দূর থেকে প্রণাম করে শ্যামা 'নামি নদীতীরে—আঁধার বনের পথে চলি গেল ধীরে'। তখন,···

বজ্রসেন বলছে: "ক্ষমিতে পারিলাম না যে—ক্ষমহে মম দীনতা পাপীজনশরণ প্রভু!"

* * *

বিঃ দ্রঃ—রবীন্দ্ররচিত তিনটি গীতিনাট্য এবং তিনটি নৃত্যনাট্যের কাহিনীগুলি অত্যন্ত সংক্ষেপেই উপরে উপস্থাপিত করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে,—কেবল এই বিবৃতির উপর নির্ভর করলে মূলরচনার রস-প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবারও সম্ভাবনা আছে পাঠকদের। কেননা, রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা কাহিনীগুলি মোটেই সংক্ষিপ্ত নয়, বরং প্রচুর ভাববৈচিত্র্যের দ্বারা সমৃদ্ধ—কোনো কোনো ক্ষেত্রে full of mysticism বললে ভুল হবে না হয়ত, যে-কারণে নিজ-নিজ বিদ্যাবুদ্ধি অনুপাতে অনেক পণ্ডিতজন আবার ভিন্ন ভিন্ন টীকা সমেত ঐগুলির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ কিংবা ব্যাখ্যা প্রকাশেরও যথেষ্ট অবকাশ পান। সেই বিবেচনায়, অপর কোনো ভাষ্যকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে কবিগুরুর লেখা গীতিনাট্য **বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া, মায়ারখেলা** এবং নৃত্যনাট্য **চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা**—এই মূল অর্থাৎ original গ্রন্থগুলির সাহায্যে এর ভিতরকার তাৎপর্য অনুধাবনে যত্নবান হবার জন্যে সুধী পাঠকবৃন্দের তথা রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিক্ষার্থীদের বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে, রচনাটি আপাতত এখানে শেষ করা হল।

রবীন্দ্রনাথের গানে প্রাদেশিক ও পাশ্চাত্যসঙ্গীতের প্রভাব

রবীন্দ্রনাথ তার ছেলেবেলায় কী-ভাবে গান শিখেছিলেন এবং সেই শিক্ষার পরিণতিতে নিজেই বা গান তৈরির কাজে উদ্বুদ্ধ হলেন কোন্ সূত্রে—এ সবের বর্ণনা আগের অধ্যায়-গুলিতে অল্পবিস্তর যা পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায়, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে নিয়মিত যত সব ভাল ভাল ওস্তাদ গায়কগুণীদের আসর বসত, তাঁদের গান রবীন্দ্রনাথ শুনে এসেছেন খুব ছোটবেলা থেকেই। সঙ্গীতে নিয়মবাঁধা পাঠ যদিও তিনি কারুর কাছে নিতেন না তবু সেই অল্পবয়স থেকে 'সঙ্গীত-শ্রোতা' হিসাবে তাঁর অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যেত নানা দিকে। অনেক অজানা নূতন-নূতন গানের কঠিন-কঠিন সুর অল্প সময়ের মধ্যে অনায়াসে আয়ত্ত করার বিশেষ অধিকারী ছিলেন তিনি। কবি নিজেও বলেছেন: "শিশুকাল হইতে গানচর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

তাহার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে, শিক্ষা পাকা হয় নাই”—(জীবনস্মৃতি, পৃ ৭২)। এটা কবিগুরুর প্রথম জীবনের কথা বটে এবং তা নিতান্ত স্থূলভাবে গ্রহণ করলে এর তাৎপর্য অনুধাবনে আমাদের ত্রুটি থেকে যাবে কিছু-না-কিছু। কেননা, যে-রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বাংলার সঙ্গীতকে অভিনব সাজে সাজিয়ে বৈচিত্র্যময় করে তুললেন,—যাঁর রচিত গানগুলি জগৎসভায় এক বিশিষ্ট স্থান নিয়ে আজ তাঁর দেশবাসী সবাইকে গৌরবান্বিত করছে নানাভাবে—তা কি শুধু শুধু ঘটেছিল, উক্ত সঙ্গীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ অতি সাধারণ শিক্ষার্থীদের মত সঙ্গীতে তালিম নিতে পারেন নি বলেই,—না তিনি এক অসামান্য বিরাট প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলে। এই প্রতিভাকে যদি স্বীকার করা যায় তাহলে তেমনি তার অসামান্য উন্মেষশালিনী ধী-শক্তির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ যে সঙ্গীতসম্বন্ধীয় জ্ঞান কী পরিমাণে আয়ত্ত করেছিলেন এবং পরে সেই আয়ত্তাধীন জ্ঞানের সাহায্যে যে-সঙ্গীত তিনি সৃষ্টি করলেন—তাতে কোন্ দেশের কোন্ রাগরাগিণীর কিংবা ‘স্টাইলে’র প্রভাব এসে কতটুকু পড়ল বা না-পড়ল, কিংবা আদৌ তিনি বাইরের কোন কিছুব দ্বারা প্রভাবিত কিনা—এই সমস্তের চুলচেবা নির্ভুল বিচার সাধারণদের পক্ষে কতটুকুই বা সম্ভব হতে পাবে—এটাই কিন্তু তখন এক্ষেত্রে হয়ে উঠবে আসল বা মূল বিবেচনার বিষয়।

তবে মোটামুটিভাবে সকলেই জানেন যে,—বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদুভট্ট থেকে আরম্ভ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধীনে গান-রচনার শিক্ষানবীশিকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে-সব গান শুনেছেন বা শিখেছেন ঐ সবের উপর ছিল হিন্দুস্তানী রীতিরই প্রাবল্য বেশি। ঠিক এইখান থেকে শুরু করে আমরা যদি একটা ধারা-বিবরণী আঁকার চেষ্টা করি তাহলে দেখব,—মাত্র সতরো বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিলেত যান। সেখানকার সঙ্গীতের সুর-তালের অভিনবত্ব তাঁকে আকৃষ্ট করে (অবশ্যি বিলেতীসঙ্গীতের চর্চা নিজেদের বাড়িতেও তিনি দেখে গিয়েছিলেন বিলেত যাবার আগে)। এই সম্পর্কে তাঁর ‘জীবন-স্মৃতি’তে লিখেছেন : “গান শুনিতে শুনিতে ও শিখিতে শিখিতে য়ুরোপীয়সঙ্গীতের রস পাইতে লাগিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার এই কথা মনে হয় যে, য়ুরোপের গান এবং আমাদের গানের মহল যেন ভিন্ন; ঠিক এক দরজা দিয়া হৃদয়ের একই মহলে যেন তাহারা প্রবেশ করে না।…য়ুরোপীয়সঙ্গীতের মর্মস্থানে আমি প্রবেশ করিতে পারিয়াছি, একথা বলা আমাকে সাজে না। কিন্তু বাহির হইতে যতটুকু আমার অধিকার হইয়াছিল তাহাতে য়ুরোপের গান আমার হৃদয়কে একদিক দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত এ সঙ্গীত ‘রোমান্টিক’।…ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে।”

এটুকু পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায়, মনের এই অনুভূতিগুলি রবীন্দ্রনাথের মত সর্বতোমুখী প্রতিভাধরের কাছে ত উপেক্ষণীয় নয়ই, বরং তার কবিজনোচিত জ্ঞানবুদ্ধিকে

উজ্জ্বলতর করে তোলার বিশেষ পাথেয় বলা যেতে পারে। এ-ছাড়া পাঠকরা লক্ষ্য করে দেখবেন, রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণশক্তি সেই বয়সেই ছিল কত অসাধারণ রকমের গভীর ও সংযত! পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে আমাদের দেশীয় সঙ্গীতজ্ঞদের গায়নরীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণও তিনি ঐ একই অধ্যায়ে সুললিত ভঙ্গিমায় আরো করে গেছেন প্রচুর, তার সমস্তটাই অপূর্ব,—রবীন্দ্রসঙ্গীতচর্চাকারী মাত্রেরই জেনে রাখার বিষয় বটে, বিশেষত যাঁরা এই নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনায় অবতীর্ণ হতে উৎসাহী—তাঁদের পক্ষে ত অতি অবশ্যই। সংশ্লিষ্ট গুণী আলোচকবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের মূল 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থমধ্যে "বিলাতি সঙ্গীত" শীর্ষক পরিচ্ছেদটি পাঠ করে আলোচ্য বিষয়ে সম্যক অবগত হবেন সেই ভরসায় কবিগুরু-প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক উক্তির উদ্ধৃতি আর অধিকমাত্রায় এখানে তুলে ধরা হল না। কিন্তু ভাবতে গিয়ে বিস্ময় বোধ করি, প্রকৃতপক্ষে সেবার বিলেত থেকে দেশে ফিরে এসে এই সবেরই জোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল, আমরা দেখতে পাই—তাঁর সর্বপ্রথম রচিত 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যে। অর্থাৎ পাশ্চাত্যসঙ্গীতাদির প্রেরণায়ই যে অনেকটা—ঐ দুই গীতিনাট্যের সৃষ্টি, তা অনস্বীকার্য। তখনও রবীন্দ্রনাথের বয়স উনিশ-কুড়ির ভিতরে।

এর পরে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন তিনি সহরের বাইরে শিলাইদহে। সেখানকার গ্রাম্য বাউলদের সঙ্গে মিশেছেন, তাদের কণ্ঠে গান শুনে সে-গানের সুর আরোপ করেছেন নিজের গানেতেও—তাঁর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে। এ-সব তথ্য কবিগুরুর স্বীয় জবানি থেকেই আমরা জানতে পারি। এ নিয়ে আরো বিশেষ আলোচনা হবে পরবর্তী অধ্যায়ের যথাস্থলে। তাছাড়া, কবির অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ কর্মোপলক্ষে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস করাকালীন রবীন্দ্রনাথেরও সে-সব জায়গায় যাতায়াত ছিল। সেই প্রদেশীয়, বিশেষত গুজরাত, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়বাসী গায়কদের গানও রবীন্দ্রনাথ শুনেছেন,—এবং তখন তদ্দেশীয় গীতধারার বৈশিষ্ট্য নিশ্চয় তাঁর সূক্ষ্ম অবধান এড়িয়ে যায় নি। ঐসব প্রাদেশিক সঙ্গীতের সুর থেকেও তিনি অনেক প্রেরণা পেয়েছেন গান রচনায়। এই প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবীর লেখা পড়ে জানা যায়: "কবি নিজে যেখানে যে-ভালো সুরটি শুনেছেন, অথবা অন্য লোকে দেশবিদেশ থেকে যে-সব গান আহরণ করে তাঁকে এনে দিয়েছেন, তার প্রায় সবগুলিই তিনি পূজার বেদীতে নিবেদন করেছেন"—(রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণীসঙ্গম পৃ ১-২)। ঠিক এই ধরণের আরেকটি উক্তি সরলাদেবীর স্মৃতিকথা থেকে এখানে নিচ্ছি: "প্রাণের গভীরে আমার যে সুরদেবতা অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁকে নিত্য হবিঃ দানে তাঁর পুষ্টিসাধনা করে তাঁর দ্বারা আমারও পুষ্টিবিধানের হোতা হলেন রবিমামা।··· কর্তাদাদামহাশয় চুঁচড়ায় থাকতে তাঁর ওখানে মাঝে মাঝে থাকবার অবসরে তাঁর বোটের মাঝির কাছ থেকে অনেক বাউলের গান আদায় করেছিলুম। যা কিছু শিখতুম তাই রবিমামাকে শোনাবার জন্যে প্রাণ ব্যস্ত থাকত—তাঁর মত সমজদার আর কেউ ছিল না।

যেমন-যেমন আমি শোনাতুম—অমনি-অমনি তিনি সেই সুর ভেঙ্গে, কখনো-কখনো তার কথাগুলিবও কাছাকাছি দিয়ে গিয়ে এক-একখানি নিজের গান রচনা করতেন।…মহীশূরে যখন গেলুম সেখান থেকে এক অভিনব ফুলের সাজি ভরে আনলুম। রবিমামার পায়ের তলায় সে-গানের সাজিখানি খালি না-করা পর্যন্ত, মনে বিরাম নেই। সাজি থেকে এক-একখানি সুর তুলে নিলেন তিনি, সেগুলিকে মুগ্ধচিত্তে নিজের কথা দিয়ে নিজের করে নিলেন—তবে আমার পূর্ণ চরিতার্থতা হল।…আমার সব সঙ্গীত-সঞ্চয়ের মূলে তাঁকে নিবেদনের আগ্রহ লুকিয়ে বাস করত। দিতে তাকেই চায় প্রাণ,—যে নিতে জানে। বাড়ির মধ্যে শ্রেষ্ঠগ্রহীতা ছিলেন রবিমামা,—তাই আমার দাত্রীত্ব পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল তাঁতে" (জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ৩৩)।

এমনতর সুরসংযোজনার পরীক্ষা-নিরীক্ষার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচিত গানগুলিতে যদি বা স্পষ্টতঃ পাওয়া যায়, তবু তাঁর পরবর্তী জীবনের রচিত গানের সঙ্গে,—কী ভাবে, কী ভাষায়, কী রচনায়—এদের তুলনা চলে না কখনও। তা করতে গেলে বস্তুত, রবীন্দ্রসঙ্গীতে অপূর্ব সৃষ্টির মহিমা তথা রবীন্দ্রনাথেরই স্বকীয়সৃষ্টির ঐশ্বর্যের আসল রূপ উপলব্ধি থেকে আমরা বঞ্চিত হই। একথাটা গীতার্থী মাত্রকেই ভেবে দেখবার জন্য অনুরোধ করি। কেন না, রবীন্দ্রনাথের গান কেবলমাত্র তাঁরই গান, তাঁরই অন্তরতম বিত্ত—বাঙ্গালীর হৃদয়মন্থনকরা অমৃত। বাংলার সঙ্গীতের যে নিজস্ব ধারা,—কথা ও সুরের সমন্বয়ে সৃষ্ট—রবীন্দ্রনাথ হলেন সেই ধারারই এক বিশিষ্ট যুগান্তকারী বাহক। কাজেই কোনোপ্রকারের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা তাঁর সঙ্গীতবৈশিষ্ট্যের মূল্যনিরূপণও হয়ত অভ্রান্ত থাকতে পারে না। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজ ভাষাটাই শোনা যাক: "একটা কথা বলা কর্তব্য—গান রচনায় আমি নিজে কী করেছি, কোন পথে গেছি, গানের তত্ত্ববিচারে তার দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা অনাবশ্যক। আমার চিত্তক্ষেত্রে বসন্তের হাওয়ায়, শ্রাবণের জলধারায় মেঠোফুল ফোটে,—বড়ো বড়ো বাগানওয়ালাদের কীর্তির সঙ্গে তার তুলনা তোমরা কোরো না"—(সুর ও সঙ্গতি, পৃ ৬৬)। অনুকরণেরও তিনি ছিলেন ঘোরবিরোধী,—তাই একজায়গায় বলেছেন: "অতি বাল্যকাল থেকে হিন্দুস্থানী সুরে আমার কান এবং প্রাণ ভর্তি হয়েছে, যেমন হয়েছে য়ুরোপীয় সাহিত্যের ভাবে ও রসে। কিন্তু অনুকরণ করলেই নৌকাডুবি;—নিজের টিকি পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। হিন্দুস্থানী সুর ভুলতে ভুলতে তবে গান রচনা করেছি"—(সুর ও সঙ্গতি, পৃ ২)। আবার অন্যের কাছ থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা সম্পর্কে একদা দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে যা বলেছিলেন তা যথাযথ জানতে পারলে, রবীন্দ্রনাথের গানে মিশ্রণ-সৃষ্টি সম্বন্ধীয় বহু অমূলক লোকপ্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা যে অনেকের মন থেকে সম্পূর্ণ নিরসন হবার অবকাশ পাবে তাতে সন্দেহ নেই। সেই প্রত্যাশায় উক্ত আলোচনারও কিয়দংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

কবি বলছেন: "প্রাণের একটা শক্তি হচ্ছে গ্রহণ করার শক্তি, আরেক শক্তি—দানের। যে মন গ্রহণ করতে জানে না, সে ফসল ফলাতেও জানে না,—সে তো মরুভূমি। যদি বাঙালীর বিরুদ্ধে কেউ এ অভিযোগ আনে যে, তার মনের উপর য়ুরোপীয় সভ্যতা সব আগে প্রভাব বিস্তার করেছে তাহলে আমি তাতে বিন্দুমাত্রও লজ্জা পাই না, বরং গৌরব বোধ করি। কারণ এই-ই তো জীবনের লক্ষণ। আমি তো একবার দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সম্বন্ধে লিখেছিলাম যে. তাঁর গানের মধ্যেও য়ুরোপীয় আমেজ যদি কিছু এসে থাকে তবে তাতে দোষের কিছু থাকতেই পারে না, যদি তার মধ্য দিয়ে একটা নূতন রস আপন মর্যাদায় ফুটে ওঠে। আর দেখো, য়ুরোপীয় সভ্যতা আমাদের দুয়ারে এসেছে, আমাদের পাশে শতবর্ষ বিরাজ করেছে। আমি বলি—আমরা কি পাথর, না বর্বর যে তার উপহারের ডালি প্রত্যাখ্যান করে চলে যাওয়াই আমাদের ধর্ম বলে মানব? যদি একান্ত অবিমিশ্রতাকেই গৌরবের বিষয় বলে গণ্য করা হয়, তাহলে বনমানুষের গৌরব বড়ো হয়ে দাঁড়ায়—মানুষের গৌরবের চেয়ে? কেননা, মানুষের মধ্যেই মিশেল চলছে, বনমানুষের মধ্যে মিশেল নেই"—(সাঙ্গীতিকী, পৃ ১৫৩-১৫৪)।

গ্রহণের শক্তি দানের শক্তি

রবীন্দ্রনাথের ইত্যাকার সব কথা ভাল করে পড়ে, জেনে, এদের অর্থ বুঝে নিয়ে—তারপরে যদি তাঁর গানে কোথাকার প্রভাব কখন কী ভাবে এসে জুটেছে তা বিচার করা যায়, তখন সেটাই হবে যথার্থ যুক্তি-সঙ্গত বিচার। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বিচারকদেরও সর্বদেশীয় গান সম্পর্কে সমান আগ্রহ, সমান শিক্ষা ও জ্ঞান থাকা চাই। নচেৎ শুধু-শুধু অন্য-কৃত তালিকা মুখস্থ করে কিংবা অন্যের মুখে মন্তব্যাদি শুনে এর বিচারে অবতীর্ণ হলে কেবল যে বাক্-বিলাসিতারই প্রশ্রয় দেওয়া হবে তা নয়, এরদ্বারা অনেকক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝিরও আশংকা থেকে যাবে প্রচুর। তা-ছাড়া অসম্পূর্ণ জ্ঞান কিংবা নিছক একদেশদর্শিতার মনোভাব নিয়ে এই সকল ব্যাপারে 'বিচারক' সাজবার প্রয়াসটুকুও তো পণ্ডশ্রম মাত্র।

আজ রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরাগী মাত্রেই জানেন, তৎকালীন অখণ্ডবাংলার সঙ্গীতজগতে রবীন্দ্রনাথের সুখ্যাতি প্রচারিত হয়েছিল তাঁর অতি অল্প বয়সেই। গায়ক এবং সুরকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যে মাত্র ২২।২৩ বৎসর বয়সের মধ্যেই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন—এরও ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। আর, পরিণত বয়সে তো তিনি সত্যসত্যই একজন বিশ্ববন্দিত বিশিষ্ট 'বাগ্গেয়কার'।

গান তৈরির বেলায়, রবীন্দ্রনাথ সুর আগে কি কথা আগে তৈরি করতেন তা বলা শক্ত। তবে, কথা এবং সুর উভয়েরই শুভসম্মেলন ঘটেছে তাঁর গানে—ঠিক হরগৌরীর মত। আর সেজন্যেই বিশেষকরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমাদর আজ বিশ্বজনীন, সার্বজনীন। সর্বোপরি বহু দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন রবীন্দ্রনাথ—একবার নয়, অনেকবার এবং যখন যেখানে

গেছেন সেখানের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শোনার সুযোগ ঘটেছে তাঁর। রবীন্দ্রনাথের মত একজন উৎকৃষ্ট শ্রোতা বিরল—এ কথাটি সম্যক রূপে অধিগত হলে—আমরা এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হতে পারি যে, যখনই যেখানের সঙ্গীত মনঃপূত হয়েছে—তার অন্তর্নিহিত মাধুরী তথা রস-বৈভব মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করেছেন তিনি এবং পরিশেষে তা একান্ত আপন করে নিয়ে চালিয়ে দিয়েছেন স্ব-জাতিদের প্রাণের মধ্যেও। অনুকরণ কিংবা নকল তিনি করেন নি,—সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেছেন নানা দেশের নানা সঙ্গীত থেকে—এবং তাঁর অসামান্য শিল্পপ্রতিভা ও বীশক্তির গুণেতেই গানের মধ্যে যে-নূতন রূপ এসে ধরা দিল—সেটাই পরবর্তীকালে অর্থাৎ এই যুগে হয়ে উঠেছে বাঙালীর এমন কি সমগ্র ভারতীয়েরই গৌরবময় এক নিজস্ব সম্পদ। —কাজেই রবীন্দ্রনাথের গানের উপর প্রাদেশিক ও পাশ্চাত্যসঙ্গীতের প্রভাব নিয়ে সঠিক আলোচনায় এগোতে হলে রবীন্দ্রসঙ্গীত-অনুশীলনকারীদেব যে সর্বদেশীয় সঙ্গীত সম্পর্কে আবো গভীর পড়াশুনা এবং এর আলোচনার ক্ষেত্রেও অতি বিশেষ বকমের সাবধানতাব প্রয়োজন আছে—সেকথা এখানে আরো বাড়িয়ে বলা বাহুল্য বোধ করি; তাছাড়া বর্তমান গ্রন্থের ৫৫ ৫৬ পৃষ্ঠায় ঐ একই দৃষ্টিকোণ থেকে অন্য একটি বিষয়েরও আলোচনা যখন আগে একবার হয়েই গেছে।

রোরোপণে কবির
লক্ষণীয় নৈপুণ্য

সে যাইহোক প্রাদেশিক এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতাদির প্রভাবে যে-সমস্ত গান রবীন্দ্রনাথ বচনা কবে গেছেন বলে প্রকাশ—সে সব গানের পুরোবর্তী আদর্শ, বাগ-তাল এবং প্রকাশসূত্র সহ এক বিস্তারিত তালিকা আমবা বহুকাল আগে লাভ করেছি কবিগুরুব ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর দাক্ষিণ্যে। এই সম্পর্কে বেশি জ্ঞানার্জন করে নিখুঁত গাণিতিক হিসাব সংরক্ষণে যারা ইচ্ছুক তাদের পক্ষে ইন্দিরা দেবী-রচিত 'রবীন্দ্রসঙ্গীতেব ত্রিবেণীসঙ্গম' নামক পুস্তিকাটির সাহায্য নেওয়া সমীচীন। সেই পুস্তিকায় নির্মিত তালিকা থেকেই সম্ভবমত আনুষঙ্গিক তথ্যাদিসহ মাত্র কয়েকটি গানের নাম, যথারীতি শ্রেণী-বিভাগ করে নমুনা স্বরূপ, এই প্রবন্ধেও উৎকলিত হল।

রবীন্দ্রনাথের বাংলা গান		পুরোবর্তী আদর্শ
হিন্দী ভাঙ্গা		
মন জাগো মঙ্গললোকে (ভাঁয়ারো-ত্রিতাল)	॥	জাগো মোহন প্যারে
তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে (খাম্বাজ-একতাল)	॥	আজ শ্যাম মোহালিয়ে
পাঞ্জাবী		
বাজে বাজে রম্যবীণা (ইমনকল্যাণ-তেওরা)	॥	বাদৈ বাদৈ রম্যবীণা
গুজরাতী কিংবা গুজরাটী		
এ কি অন্ধকার এ-ভারতভূমি (ভজন-একতাল)	॥	
যাও রে অনন্তধামে (প্রভাতী-ঝাঁপতাল)	॥	

মরাঠী

বিশ্ববীণারবে (শঙ্করাভরণ-তালফেরতা) ॥ নাদবিদ্যা পরব্রহ্মরস

দক্ষিণী

বাজে করুণ সুরে ॥ নিতুচরণ মূলে

মহিশূরী

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে (ভজন-একতাল , ॥

কর্ণাটি কিংবা কানাড়ী

আজি শুভদিনে (খামাজ-তালফেরতা) ॥ পূর্ণচন্দ্রাননে

বড় আশা করে। ঝিঁঝিট-কাওয়ালী) ॥ সখি বা বা

সকাতরে ঐ কাঁদিছে (ভজন-একতাল) ॥ চাবি বর্ষা পর্যন্ত

বাংলার লোকসঙ্গীত

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে ॥ হরিনাম দিয়ে জগত মাতালে

আমার সোনার বাংলা ॥ আমি কোথায় পাব তারে

তেলেনা

হায় কে দিবে আর সান্ত্বনা (দেশ-ত্রিতাল) ॥ তানানা দ্রে দ্রে

গৎ ভাঙ্গা

মোর ভাবনারে (গৌড়মল্লার-ত্রিতাল) ॥ সেতারের গৎ

এসো শ্যামলসুন্দর (দেশ-ত্রিতাল) ॥

পাশ্চাত্য সঙ্গীত

কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া· ॥ Drink to me only

কালী কালী বলরে আজ [বাল্মীকিপ্রতিভা] ॥ Nancy Lee

একটানা এতসব বলা সত্ত্বেও,—উপসংহারে প্রসঙ্গত আরেকটু বলতে চাই : প্রভাব প্রতিপত্তির কথা তুলে লাভই বা কি ! এ'তে শুধু বাগবিতণ্ডা বেড়ে চলে—নিষ্পত্তি হয় না এর। কেননা, কার কোন্ সৃষ্টিতে কোথাকার কোন্ প্রভাব যে কী কৌশলে জড়িয়ে আছে সেটা ত বড় কথা নয়। আর বস্তুতপক্ষে গভীরভাবে চিন্তা করলে যে-কেউ দেখতে পাবেন,—এ বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনো সৃষ্টিই আজ পর্যন্ত একেবারে প্রভাব-হীন অবস্থায় গড়ে ওঠেনি। আজকাল বাঙালীদের মধ্যে যাঁরা কিছু কিছু লেখবার চেষ্টা করেন,—বিশেষতঃ গল্প উপন্যাসাদি,—তাঁরা অধিকাংশই কি আর রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশংকর প্রমুখের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত নন ? তাই বলে এঁদের লেখার মধ্যে আমরা কি কেউ কখনও রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশংকর প্রমুখের প্রভাব খুঁজে বেড়াই ? এই তো অনেকে বলেন, সেক্সপিয়ার, দান্তে, মিলটনের

প্রভাব, প্রেরণা

প্রভাবে নাকি কাব্য রচনা করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত; তা যদি হয় তাহলে তেমনি করে রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকেও কি আর বিহারীলালের প্রভাবের ছাপ দেখানো যেতে পারে না? রবীন্দ্রনাথ যে যৌবনে উপন্যাস লিখতেন—তার আগে কি তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পড়েন নি কখনো? —খুব পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথের তখনকার লেখা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বিচার করলে—বঙ্কিমের ভাবধারার সুবাস কি আর তা'তে মিলবে না,—কিছু-না-কিছু? মনে করুন, যদি দৈবাৎ অনেকটাই মিলে যায়—তাহলে কী রবীন্দ্র-সৃষ্টির মৌলিকত্ব, অপূর্বত্ব এবং স্রষ্টার অনন্যসাধারণ প্রতিভার বিষয়টা আমাদের ভুলে থাকতে হবে! এমনতর পরিস্থিতিতে মোটকথাটি হল,—বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে সব দিক সুসংযতভাবে পর্যালোচনা করতে পারলে এসব জিনিসকে কখনও প্রভাব বলা ঠিক নয়, আমরা বলব 'প্রেরণা'। 'এই প্রেরণা যেখান থেকেই লাভ করা হোক না কেন—আমাদের শেষ লক্ষ্য থাকবে, সৃষ্টির চেহারাটা দেখা। সৃষ্টির চেহারাটা যে কী রকম দাঁড়ালো—সেটাই হবে আমাদের মূল বিবেচ্য'।

সুরেরগুরু রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট সমুদয় গানের স্বরূপ-বিচারের বেলায়ও তা-ই।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে কীর্তন ও বাউলের প্রভাব

কীর্তন ও বাউল গানের সঙ্গে বাঙালীমাত্রেরই পরিচয় আছে অল্পবিস্তর এবং এ-গান তাদের নিজস্ব সম্পদ বলেও অনেকের ধারণা। কিছু দুঃখের বিষয়, এর চর্চা বিশিষ্ট বাঙালী গায়ক শিল্পীদের মধ্যে আশানুরূপ সচল নয়। এই মন্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে পারেন যে-কেউ,—যদি সহরের এত সব অগণিত সঙ্গীত-শিক্ষায়তনগুলিতে খোঁজ নেন। সেখানে দেখবেন, খাঁটি বাউল-কীর্তন অনুশীলনের ব্যবস্থা কোথায় কতটুকুই বা! খুবই সীমাবদ্ধ নয় কি? মোটের উপর এইটে ত সত্যি যে, আমরা তথাকথিত সহরবাসী সঙ্গীতবিলাসীরা, সঙ্গীত বলতে সাধারণত উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেরই চর্চা করে এসেছি দীর্ঘকাল এবং একেই সম্মান দিয়েছি সাধ্যমত। বিশেষ করে দেশের গণ্যমান্য সঙ্গতিপন্নেরাও যখন উক্ত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করে জনগণের মনোযোগ সেদিকেই আকৃষ্ট করেছেন বেশি, তখন এর ফলে বাংলার বাউল-কীর্তন তৎসহ অন্যান্য লোকসঙ্গীত প্রায় অবহেলিতই থেকে গেছে। আর বাস্তবক্ষেত্রে, যে-কোনো শিল্পের উন্নতি অনেকাংশে সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিদের সহানুভূতির উপরই যে নির্ভরশীল তা কে অস্বীকার করবে! এসবের ইতিহাস নিয়ে চুলচেরা বিচার করা আমার বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়,—তবে আমরা আজকাল সুনিশ্চিতভাবে এইটুকুই প্রত্যক্ষ করছি যে,—সহরাঞ্চলে উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞমহলে কীর্তন-বাউল মর্মান্তিকরূপেতেই অপাংক্তেয়,—যদিও বা এসবের কিছু-কিছু সমাদর ও অনুশীলন কোথাও থাকে—সেটা আছে গ্রামাঞ্চলেই।

তাছাড়া, যাঁরা বিভিন্ন দেশ-পরিভ্রমণে অভ্যস্ত তাঁরা হয়ত দেখে থাকবেন, কীর্তন গাইবার প্রথা ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচলিত। অবশ্য তা বিভিন্ন রীতিতে গাওয়া হয়ে থাকে বিভিন্ন অঞ্চলে। প্রিয়তম কোনো কিছুর মহিমা, গুণ-বর্ণন বা যশঃখ্যাপনই তো হল 'কীর্তন' —তা যে-কোনো ভাষাতেই হোক না কেন। এ-কে কেউ বলেন 'কীর্তন'—কেউ বা বলেন 'ভজন'। এর মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলবাসী গায়কদের গাইবার ধারায় কখন-সখন তারতম্য স্পষ্টত দেখা দিলেও আসলে ভাবের দিক থেকে এই দুটি শব্দের অর্থে কোনো অমিল আছে বলে মনে করি না—অন্তত বাংলার গীত-ভক্ত ও রসিক মহলে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "আত্মপ্রকাশের জন্যে বাঙালী স্বভাবতই গানকে অত্যন্ত করে চেয়েছে। সেই-কারণে সর্বসাধারণে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতরীতির একান্ত অনুগত হতে পারে নি। সেইজন্যেই কানাড়া, আড়ানা, মালকোষ, দরবারীতোড়ির বহুমূল্য গীতোপকরণ থাকা সত্ত্বেও বাঙালীকে কীর্তন সৃষ্টি করতে হয়েছে। গানকে ভালবেসেছে বলেই সে গানকে আদর করে আপন হাতে আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করতে চেয়েছে। তাই, আজ হোক্ কাল হোক্, বাংলায় গান যে-উৎকর্ষ লাভ করবে সে তার আপন রাস্তাতেই করবে আর-কারও পাথর-জমানো বাঁধা রাস্তায় করবে না"—(রবীন্দ্র রচনাবলী-১৪শ খণ্ড, পৃ ৯১৩)। আবার তিনি বলেছেন অন্য জায়গায়: "বাংলাদেশে কীর্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ"—(সুর ও সঙ্গতি, পৃ ৮৩)।

কবিগুরুর এইসব আশার বাণীর সূত্র ধরেই আমরা যদি দেখতে শিখি, তিনি এই প্রসঙ্গে আরো কোথায় কী-কী মতামত প্রকাশ করেছেন, তাহলে এর দ্বারাই তার গানে কীর্তন বাউলের প্রভাব সম্পর্কেও একটা মোটামুটি ধারণা, সংশ্লিষ্ট গীতার্থী এবং আলোচকদের পক্ষে যে গড়ে নেওয়া সহজ ও সম্ভব হবে তা'তে কোনো সন্দেহ নেই।

তবে শুরুতে এইটে জেনে রাখা ভাল, যে, আমাদের মধ্যে লোকসঙ্গীত বা জনসঙ্গীত বা—দেশিসঙ্গীতও তাই-ই, আর কীর্তন-বাউল হল এরই অঙ্গবিশেষ। কাজেই রবীন্দ্রনাথ যদি স্বদেশে থেকে এবং তার আবহাওয়ায় বর্ধিত হয়ে নিজেই লোকসঙ্গীতের তথা দেশি সঙ্গীতের দ্বারা কোনো-না-কোনো প্রকারে প্রভাবিত হয়ে থাকেন এবং আনুষঙ্গিক কারণে কীর্তন-বাউলের প্রভাব তাঁর রচিত গানে এসেই পড়ে—তাহলে সেটা তো অস্বাভাবিক কিংবা আশ্চর্যকর কিছু নয়। এ ক্ষেত্রে আসলে, সেই কার্যকারণটুকুরই বিশ্লেষণ আবশ্যক।

জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়িতে মহর্ষির আমলে ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীত এবং বিদেশীয় সঙ্গীতচর্চার যেমন নানাবিধ ব্যবস্থা ছিল—তেমনি সেখানে স্ব-দেশীয় তথা তদানীন্তন বৃহত্তর বাংলার যাত্রাগান, কবিগান, কথকতা, ঢপকীর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠানেরও সমাদর হত যথেষ্ট। এ সমস্তই রবীন্দ্রনাথ শিশুকাল থেকে দেখে আসছিলেন। এর ইতিবৃত্ত পরে বর্ণনা করেছেন এই বলে: "সেকালের জীবনযাত্রায় সঙ্গীতের সমাদর দেখেছি…

[উচ্চসঙ্গীত ছাড়াও, দেশে] জনসঙ্গীতের প্রবাহ—সেও ছিল বহু শাখায়িত। নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাঙ্গণে-প্রাঙ্গণে যেমন ছোট-বড় নদী-নালা স্রোতের জাল বিছিয়ে দিয়েছে, তেমনি বুয়েছিল গানের স্রোত নানা ধারায়।···যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, কবির গান, কীর্তন মুখরিত করে রেখেছিল সমস্ত দেশকে। (লোকসঙ্গীতের এত বৈচিত্র্য আর কোনো দেশে আছে কিনা জানিনে)। শখের যাত্রা সৃষ্টি করার উৎসাহ ছিল ধনী সন্তানদের। এই সব নানা অঙ্গের গান ধনীরা পালন করতেন; কিন্তু অন্যদেশের বিলাসীদের মত এ-সমস্ত তাঁদের ধনমর্যাদার বেড়া-দেওয়া নিভৃতে শুধু নিজেদেরই সম্ভোগের বস্তু ছিল না। বাল্যকালে আমাদের বাড়িতে নল-দময়ন্তীর যাত্রা শুনেছি। উঠোন-জোড়া জাজিম ছিল পাতা—সেখানে যারা সমাগত তাদের অধিকাংশই অপরিচিত; এবং অনেকেই অকিঞ্চন, তার প্রমাণ পাওয়া যেত জুতো-চুরির প্রাবল্যে ?···বিদেশী অলংকারশাস্ত্র পড়বার বহু পূর্ব থেকে আমাদের নাট্য,—যাকে আমবা যাত্রা বলি, সে তো গানের সুরেই ঢালা। সে যেন বাংলাদেশের ভূসংস্থানের মত, সেখানে স্থলের মধ্যে জলের অধিকারই যেন বেশি। কথকতা যেন অলংকারশাস্ত্রমতে ন্যারেটিভ শ্রেণীভুক্ত, তার কাঠামো গদ্যেব হলেও স্ত্রীস্বাধীনতা যুগের মেয়েদের মতই গীতকলা তার মধ্যে অনায়াসেই অসংকোচে প্রবেশ করত। মনে তো পড়ে একদিন তাতে মুগ্ধ হয়েছিলুম”—(রবীন্দ্র রচনাবলী-১৪শ খণ্ড, পৃ ২১১-২১৩)। কবিব এই উদ্ধৃতি পড়লে বোঝা যায়,—পাঁচালি-গান, কথকতা ইত্যাদি অল্পবয়সে তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাতে তাঁর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা ছিল সুগভীর। তাছাড়া বাড়িতে রবীন্দ্রাগ্রজেরা যে নানা উপলক্ষ্যে শখের নাটকাদি করতেন, তার মধ্যে সঙ্গীত-সংযোজন ও পরিবেশনের ব্যবস্থাদি নিশ্চয় স্বদেশীয় গীতিকলাব মূল রীতিকে উপেক্ষা কবে কখনো হত না। তখন এসবে সক্রিয় অংশ নিতে পারার মত বয়স হয়ত রবীন্দ্রনাথেব ছিল না, কিন্তু তিনি নিবিষ্টমনে লক্ষ্য করতেন সব—এবং তাঁব পর্যবেক্ষণশক্তি ছিল অ-সাধারণ,—এই কথা মনে রেখে যদি বিচার করি তাহলে, উপরোক্ত জনসঙ্গীত বা লোকসঙ্গীতের অর্থাৎ দেশিগানের এবং এর সুরের প্রতি কবির স্বাভাবিক আকর্ষণ ও প্রীতিবোধ প্রসঙ্গে আমরা আরো দেখতে পাই,—খুব ছেলেবেলায়ই তিনি: (১) তাঁর পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যের কাছে শিখেছিলেন একাধিক পাঁচালি-গান, (২) দেশিগান শেখা তাঁর শুরু হয়েছিল বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে—নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে ছড়ার মাধ্যমে, (৩) অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বন্ধু অক্ষয় চৌধুরীর কণ্ঠে তিনি শুনেছেন বহুবার, —হয়ত শুনে শিখেছেনও তখনকার দিনের 'বাংলা কত উদ্‌ভট গানই', (৪) নিজ বাড়িতে দেশীয়-সংস্কৃতির প্রতি বয়স্ক পারিবারিক-গণেরও যেমন অগাধ শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ছিল তেমনি সেইকারণে তাঁদের সাহায্যেও দেশিগানের সন্ধান পেয়েছেন কিছু-কিছু; সর্বোপরি (৫) (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পদ্মানদীর উপর যখন বোটে ঘুরে বেড়াতেন তখন মাঝিদের কাছ থেকে এবং আশেপাশে

রবীন্দ্রনাথের দেশি-গান শিক্ষার উৎস

গ্রাম্য গাইয়েদের কণ্ঠে নানা রকমের দেশি গান শুনে মনের মতন কত বিচিত্র সুরই না সংগ্রহ করেছেন। ঐ-সব ঘটনা তাঁর নিতান্ত বালক ও কিশোর বয়সের, এবং এরই ফলশ্রুতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যে পরবর্তীকালে তাঁর স্ব-রচিত গানে এ-দেশীয় সারিগান, রামপ্রসাদী, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতির সুর আরোপণে অনুপ্রাণিত হন—তা তো আপনা থেকেই অনুমেয়। তবে বিশেষ করে কীর্তন গানের প্রতি তিনি যে করে আকৃষ্ট হন এর কোনো সঠিক তারিখ জানা যায় না। জিজ্ঞাসুরা যাতে সেই সময়টা খুঁজে নিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে কবির একেবারে প্রথম জীবনে, কীর্তন ও রামপ্রসাদী সুরে রচিত কয়েকটি গানের নাম উদাহরণস্বরূপ এখানে তুলে দিচ্ছি :

"গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে (মিশ্র-কীর্তন সুর) ॥ আমি শুধু রইনু বাকী (রামপ্রসাদী) ॥ আমি জেনেশুনে তবু (কীর্তন সুর) ॥ শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা (রামপ্রসাদী) ॥ আবার মোরে পাগল করে (কীর্তন সুর)। সুখে আছি, (মিশ্র-কীর্তন সুর)"—

[রবীন্দ্রসংগীত I, পৃ ১৪]

এই গানগুলি রবীন্দ্রনাথ তাঁর ২৭ বছর বয়সের আগেই লিখেছিলেন বলে প্রকাশ। অতঃপর তিনি যখন তাদের জমিদারী চালাবার দায়িত্ব নিয়ে শিলাইদহ-কুষ্টিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে চলে যান তখন গ্রামদেশের বাউল, কীর্তনীয়া এদের নিকটতম সংস্পর্শে আসার প্রচুর সুযোগ-সুবিধা ঘটে তাঁর। সেই সময় গ্রাম্য পরিবেশটিও তাঁর মনকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছিল। জীবনের সেই নূতন অভিজ্ঞতা কবি একবার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনন্যসুলভ ভাষাতেও লিখেছিলেন : "পৃথিবী বাস্তবিক কী আশ্চর্যসুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়"। এতদিন তিনি কলিকাতা-সহরাঞ্চলে প্রচলিত কীর্তনাদি শুনে আসছিলেন, এবার সরাসরি গ্রামের সুরের সঙ্গে সুর মেলালেন,—রবীন্দ্র-চিত্তাকাশের দ্বার সেই সুর-স্পর্শে বিশাল ও উন্মুক্ত হল। বস্তুতপক্ষে এখান থেকেই তাঁর সঙ্গীত-চিন্তাধারার এক নূতন পরিচয় আমরা পেলাম।

সঙ্গীত-রচনার নতুন পথ

রবীন্দ্রনাথ তার, সঙ্গীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে জটিলতর শৈলী প্রবর্তনে অতিরিক্ত উৎসাহী ছিলেন বলে প্রমাণ মিলে কম, বরং এর বিরোধীই ছিলেন বরাবর। তাঁকে, বিভিন্নকালে বিভিন্ন আলোচনায় বলতেও শোনা যায় : "আমি গান রচনা করতে করতে, সে-গান বারবার নিজের কানে শুনতে শুনতেই বুঝেছি যে, দরকার নেই 'প্রভূত' কারু-কৌশলের। যথার্থ আনন্দ দেয় রূপের সম্পূর্ণতায়,—অতি সূক্ষ্ম, অতি সহজ ভঙ্গিমার দ্বারাই সেই সম্পূর্ণতা জেগে ওঠে।"—তিনি আরো বলেছেন : "ললিতকলার কোনো-একটি রচনায় প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে এই, যে, তাতে আনন্দ দিচ্ছে কি না? যদি দিচ্ছে হয়, তাহলে তার মধ্যে উপাদানের যতই স্বল্পতা থাকবে ততই তার গৌরব। বিপুল ও প্রয়াসসাধ্য উপায়ে একজন লোক যে ফল পায়, আর-একজন সংক্ষিপ্ত ও স্বল্পায়াস উপায়েই সেই ফল

গেলে—আর্টের পক্ষে সেইটেই ভালো।…বলতে হবে, আর্টে প্রগল্‌ভতার চেয়ে মিতভাষ, বাহুল্যের চেয়ে সারল্য শ্রেষ্ঠ"—(তীর্থংকর, পৃ ১৩৯)।

কিন্তু এখানে বলছিলাম,—রবীন্দ্ররচিত কীর্তনাঙ্গ গানেতে আমরা দেখি,—কীর্তনের মধ্যে যে-সকল জটিলতর পদ্ধতি সাধারণত পাওয়া যায়, যথা—কথা, দোঁহা, আখর, তুক, ছুট ইত্যাদি,—এসব যথারীতি অনুসরণ করে সঙ্গীত রচনায় হাত দেন নি রবীন্দ্রনাথ। কীর্তন-সুরের অনুপ্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন অবশ্যি, একথা সবাই জানেন* তবে সেগুলি, সংখ্যায় খুব পর্যাপ্ত নয়, তাহলেও, ভাবের-সৌরভে এবং গঠনের-সৌন্দর্যে অতুলনীয় তো বটেই। উপরন্তু কীর্তনগানের দ্বারা তিনি যে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত, অনুপ্রাণিত—এরও সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে তাঁর নিজ একাধিক উক্তিতেই। যেমন:

"বাঙালীর কীর্তনগানে সাহিত্যে-সঙ্গীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে প্রিমিটিভ এবং ফোক্ ম্যুজিক ব'লে উড়িয়ে দিলে চলবে না। উচ্চ অঙ্গের কীতন গানের আঙ্গিক খুব জটিল ও বিচিত্র, তার তাল ব্যাপক ও দুরূহ, তার পরিসর হিন্দুস্থানী গানের চেয়ে বড়ো। তার মধ্যে যে বহুশাখায়িত নাট্যরস আছে—তা হিন্দুস্থানী গানে নেই"—(সুর ও সঙ্গতি, পৃ ৮৭)।

"কীর্তন সঙ্গীত আমি অনেককাল থেকেই ভালবাসি। ওর মধ্যে ভাব প্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোনো সঙ্গীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানিনে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়, কিন্তু ও শাখায়-প্রশাখায় ফলে-ফুলে-পল্লবে সঙ্গীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে। কীর্তনসঙ্গীতে বাঙালীর এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি"—(সাঙ্গীতিকী, পৃ ১০৬)।

"বাংলার সঙ্গীতের বিশেষত্বটি যে কি, তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্তনে পাওয়া যায়। কীর্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সে তো অবিমিশ্র সঙ্গীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্যরসের আনন্দ একাত্ম হয়ে মিলিত। কীর্তনে সুরও অবশ্য কম নয়, তার মধ্যে কারুনিয়মের জটিলতাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কীর্তনের মুখ্য আবেদনটি হচ্ছে তার কাব্যগত ভাবের,—সুর তারই সহায় মাত্র। এ-কথাটা আরও স্পষ্ট বোঝা যায় যদি কীর্তনের প্রাণ অর্থাৎ আখর কি বস্তু—সেটা একটু ভেবে দেখা যায়। সেটা শুধু কথার তান নয় কি?"—(রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪শ খণ্ড, পৃ ৯২১)।

সুরের তান ও কীর্তনের আখর

আখর-প্রসঙ্গে এখানে যৎকিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজন, যে,—হিন্দুস্থানীসঙ্গীতে সুরের তান শুনে আমরা যেমন মুগ্ধ হই, তেমনি কীর্তনের পদাবলীর ভিতরকার ভাব রসটিকেও আমরা নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি ঐ আখরেরই মাধ্যমে। অর্থাৎ তানালাপের মত কথাহীন সুরের বিস্তার না করে—কীর্তনের বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে

* কীর্তন-সুরে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি তালিকা সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থেরই পরিশিষ্টে।

ছন্দ যথানিয়মে ঠিক রেখে গানের ভাব-অনুসারে সুর দিয়ে সাধ্যমত অর্থপূর্ণ কথা বা শব্দ বিস্তার করে যাওয়াই হল আখরের মূল উদ্দেশ্য।

কিন্তু, এমনতর আখর-সংযোগে কীর্তনাঙ্গের গান রবীন্দ্রনাথ যে খুব বেশি রচনা করেছেন—তা নয়। মাত্র সামান্য কয়টিই, যথা—ওহে জীবনবল্লভ (স্বরলিপি দ্রঃ গীতশ্রী), মাঝে মাঝে তব দেখা পাই (স্বরবিতান-২৩), আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি (স্বরবিতান-২৪)। তবে, আখর-বিহীন কীর্তন সুরে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে বেশ কিছু—সে কথা আগেই বলা হয়েছে। আখর সংযুক্ত উপরে উল্লিখিত গান কয়টি বিশেষ-অনুশীলন করলে কবিগুরুর কথার তাৎপর্য হয়ত অধিকতর স্পষ্টভাবে বোঝা যেতে পারে—কেনই বা তিনি আখরগুলিকে বলেছেন "কীর্তনের প্রাণ"। পুনশ্চ দেখুন, পূর্ব-সংকলিত উক্তি মধ্যে,—একে 'শুধু কথার তান' আখ্যা দিয়ে তিনি আমাদের যা বুঝিয়েছেন সেই বর্ণনারও খানিকটা এখানে উদ্ধার করছি: "এই আখর অর্থাৎ বাক্যের তান, অগ্নিচক্র থেকে স্ফুলিঙ্গের মত কাব্যের নির্দিষ্ট পরিধি অতিক্রম করে বর্ষিত হতে থাকে। সেই বেগবান্ অগ্নিচক্রটি হচ্ছে সঙ্গীতসম্মিলিত কাব্য। সঙ্গীতই তাকে সেই আবেগ-বেগের তীব্রতা দিয়েছে যাতে করে নূতন নূতন আখর তা-থেকে ছিটিয়ে পড়তে পারে"—(রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৪শ খণ্ড, পৃ ১২২)।

১৩৩১ সালের কোন এক বক্তৃতায় কীর্তন গানের প্রশংসা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "বাংলা কি গান গায় নি? বাংলা এমন গান গাইলে যাকে আমরা বলি কীর্তন। বাংলার সঙ্গীত সমস্ত প্রথা, সঙ্গীতসম্বন্ধীয় চিরাগত প্রথার নিগড় ছিন্ন করেছিল। দশকুশী, বিশকুশী, কত তালই বেরল, হিন্দুস্থানী-তালের সঙ্গে তার কোনোই যোগ নেই। খোল একটা বেরল, যার সঙ্গে পাখোয়াজের কোনো মিল নেই! কিন্তু কেউ বললে না, এটা গ্রাম্য বা অসাধু। একেবারে মেতে গেল সব—নেচে কুঁদে হেসে ভাসিয়ে দিলে। কত বড়ো কথা! অন্য প্রদেশে তো এমন হয় নি।…বাংলাদেশের সাহস আছে—সে মানেনি চিরাগত প্রথাকে"—(রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪শ খণ্ড, পৃ ১০০৪)।

কীর্তন-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এতাদৃশ আরো অসংখ্য সুন্দর-সুন্দর প্রশস্তি সংগ্রহ করে যদি মন দিয়ে পড়বার সুযোগ পান তাহলে দেখবেন,—স্ব-দেশীয় কীর্তনগানকে কতদিক থেকে কত অন্তরঙ্গভাবেই না অনুশীলন করেছেন রবীন্দ্রনাথ, এবং এর সার্থক প্রয়োগও ঘটেছে তাঁর স্বরচিত একাধিক কীর্তনাঙ্গ সংগীতে।

তাহলেও এইক্ষেত্রে আরেকটি কথা ভাববার আছে।

কীর্তন গান যেখানে-সেখানে গাওয়া চলে না, সাধারণত ভক্তদের সমাবেশেই গাওয়া হয়। এবং অনেকেরই ধারণা,—খোল-করতাল সহযোগে একটা বিশেষ মনমাতানো ঢঙে ও সুরে গান করাটাই বুঝি কীর্তনের প্রচলিত রীতি। কিন্তু রবীন্দ্র-রচিত কীর্তন গানের মধ্যে উক্ত রীতির মিল বড় একটা পাওয়া যায় না। প্রাচীন কীর্তনের নিয়মকানুন রক্ষা

করেও যে অভিনবত্ব ও অপূর্বত্বের সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কীর্তনাঙ্গ সঙ্গীতে—সেটা ভক্তদের চিত্তকে চলিত প্রথা মত মাতিয়ে তোলে না বটে, কিন্তু নিবিড়ভাবে আবিষ্ট করে।

রবীন্দ্র-কীর্তন

বলাবাহুল্য এগুলিই রবীন্দ্রসঙ্গীতানুশীলনকারীদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে ভেবে দেখবার বিষয়। উপাসনাদির উদ্দেশ্যে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কীর্তনাঙ্গ-সঙ্গীত তো আছেই একাধিক, তাছাড়া—তাঁর স্ব-রচিত জাতীয়সঙ্গীত, ঋতুসঙ্গীত এবং গীতিনাট্য নৃত্যনাট্যের গানেতেও কবি, কীর্তনের সুর যথোচিতভাবে আরোপ করেছেন যথেষ্ট—নানা রকমের আশ্চর্য ভঙ্গিমায়। যা শুনে সহজভাবেই মন্তব্য করা যায়,—কীর্তনের প্রভাব রবীন্দ্রসঙ্গীতে ওতপ্রোতরূপেতেই জড়ানো (বাউলেরও আছে —সে কথায় আমরা পরে আসছি) এবং এর প্রয়োগ-ধারাটি একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব—একে বাংলাকীর্তনের একটা নবজাত রূপ কিংবা সরাসরি 'রবীন্দ্রকীর্তন' বললেও ভুল হবার কারণ নেই কিছু।

এবার 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাউলের প্রভাব'* নিয়ে আলোচনা করা যাক।

'বাউল' শব্দটি আমাদের মধ্যে এত বেশী চালু যে এর স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা না করলেও হয়ত চলবে। তবে এইটুকু বলে রাখা ভাল,—মুক্তি পাবার জন্য পাগল যে-সব গানের সাধক, তাঁদেরই সাধারণত 'বাউল' বলা হয়। বহু প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার আকাশে-বাতাসে মিশে আছে এক ধরনের সাধন-সঙ্গীত,—এই সঙ্গীতও তাঁদেরই,—যাকে আমরা সহজ চলতি ভাষায় বলে থাকি 'বাউলের গান'। 'বাউল' একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম বলেও অভিহিত,—সেই ধর্মের পথে চলতে হিন্দু-মুসলমান কারো কোনো বাধা নেই। এই নিয়ে, শিক্ষিত পণ্ডিতজনের অনেক কথাই বলবার অবকাশ আছে। তবে আমরা অতি সাধারণভাবে যা দেখি তা হল এই, যে, বাউলরা গানের ভিতর দিয়েই তাঁদের 'মনের মানুষ'কে খুঁজে বেড়ান। গানের কথার মধ্যেও সেই অনুভবটুকু থাকে—যাঁকে দেখা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না কখনও—সেই ইন্দ্রিয়-অগম্যকেই বলেন ওঁরা মনের মানুষ। এসব একটু গভীর তত্ত্বকথা বটে, এবং সহরের হাটে-বাটে উগ্র বস্তুবাদীদের মধ্যে যথাযথ প্রযোজ্য নয় বলেই বোধকরি উপরোক্ত তত্ত্বকথাপূজারী অধিকাংশ বাউলদের বসবাস পল্লী অঞ্চলেই হয়ে থাকে।

এখানে লক্ষণীয়,—সহরের প্রতি কবি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ কখনও খুব তীব্র ছিল বলে ত মনে হয় না। যদিচ তিনি সহরেরই একজন বিশিষ্ট লোক ছিলেন। এটা নিশ্চয় অনেকেরই জানা আছে যে, জমিদারী দেখাশোনার কাজে শিলাইদহ, কুষ্টিয়া, পতিসর ইত্যাদি বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলে যখন রবীন্দ্রনাথের যাতায়াত ছিল তখন সে-সব জায়গায়

* এই প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ কয়টির ভিতর 'প্রভাব' শব্দটি 'প্রেরণা' অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে—এতদ্‌সম্পর্কীয় বিবরণ পূর্বসংলগ্ন 'রবীন্দ্রনাথের গানে প্রাদেশিক ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব' নামক অধ্যায়ের উপসংহার-অংশে দ্রষ্টব্য।

বাউলদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন তিনি,—তাদের গানও শুনতেন। সেই গানে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য বাউল-গান সম্পর্কে তিনি অনুসন্ধিৎসু ছিলেন আরো আগে থেকেই,—এমন কি বাউল-গানের সাহিত্যিক মূল্য নির্ধারণেরও চেষ্টা করেছেন তখন—এসবের নিদর্শন, আলোচনা প্রসঙ্গে পরে যথাস্থলে পাওয়া যাবে। তবে তাঁর নিজ, এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের, উক্তির সাহায্যে আমরা এইটুকু জানতে পারি, যে, শিলাইদহ অঞ্চলে আসার পর থেকে রবীন্দ্রনাথ—বাউল, বৈষ্ণব, দরবেশ, ফকির, চাষা, জেলে, মাঝি প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে মিশে তৎকালীন বৃহত্তর বাংলার বৈচিত্র্যময় পল্লীগীতির সন্ধান পান। এই বিভিন্ন রকমের পল্লীগীতির মধ্যে 'বাউলের গান'ই তাঁকে মুগ্ধ করে সব চেয়ে বেশি। বাউল গানের সুর ও ঢং তাঁর জীবনে যে অসম্ভব রকমে প্রভাব বিস্তার করেছিল একথা নিজেই স্বীকার করে মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন-রচিত 'হারামণি' নামীয় গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন: "আমার লেখা যারা পড়েছেন তাঁরা জানেন বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ* আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউলসুরের মিলন ঘটেছে. এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন্-এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স, শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল—

> কোথায় পাব তারে—আমার মনের মানুষ যে রে!
> হারায়ে সেই মানুষে—তার উদ্দেশে, দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে!"

উপরোক্ত ঘটনার বহুকাল পরে, শান্তিনিকেতন উপাসনা-মন্দিরেও এর উল্লেখ করে কবিগুরুকে বলতে শুনা যায়: "একবার বৈরাগীর মুখে গান শুনেছিলুম, 'আমি কোথায় পাব

* কবিগুরুর এই অনুরাগ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা। সেটা ছিল ১৯২৮ সাল; তখন আমি সবে মফস্বল সহর থেকে এসে কলকাতা-কলেজে ভর্তি হয়েছি,—নিতান্ত বালক। তা সত্ত্বেও এ-হেন বালকের মুখে শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ-লক্ষণছিরির বাউল ভাবাপন্ন পল্লীকবি দেওয়ান হাসনরজার নাম শুনে তাঁর সম্পর্কে কত প্রশ্নই না খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র দে মহাশয় ছিলেন উক্ত হাসনরজা সাহেবের গৃহচিকিৎসক। তাঁকে হাসনরজা সাহেব, স্বরচিত কবিতার মুদ্রিত পুস্তক উপহার দিয়েছিলেন সম্ভবত ১৯১৭ কি ১৮ সালে আমাদের বাড়িতে ঐ পুস্তক অনেককাল সযত্নে রক্ষিত ছিল, পরে দুর্ভাগ্যবশতঃ কীটদষ্ট হয়। খুব মনে আছে, পুরানোকালের মোটামোটা টাইপের বাংলা অক্ষরে একটানা ছাপা বেশ বড় সাইজের সেই কবিতাপুস্তক আমি ছেলেবেলায় দেখেছিলাম, পড়েওছিলাম কিছু কিছু—তাইজন্যে কবিগুরুর কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়া তখন আমার পক্ষে সহজ ও সম্ভব হয়েছিল অনেকটা। এর বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছে ১৩৭৫ সালে ১৯ জ্যৈষ্ঠ আনন্দবাজার পত্রিকা-রবিবাসরীয় সংখ্যায়।

তারে'… । সে আরো গেয়েছিল—'আমার মনের মানুষ যেখানে, আমি কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে ?' তার এই গানের কথাগুলি আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—যখন শুনেছি তখন এই গানটিকে যে মনের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেছি তা নয়…কিন্তু এ-কথা ঠিক যে, এই গানের মধ্যে মানুষের একটি গভীর অন্তরের কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মানুষের মনের মানুষ তিনিই তো,—নইলে মানুষ কার জোরে মানুষ হয়ে উঠছে ?…অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম অন্য জগতের অন্য জীবের সঙ্গে আপনাকে কী সম্বন্ধে বেঁধেছেন তা জানবার কোনো উপায় আমাদের নেই,—কিন্তু এইটুকু মনের ভিতরে জেনেছি যে মানুষের তিনি মনের মানুষ ;—তিনিই মানুষকে পাগল করে পথে বের করে দিলেন, তাকে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দিলেন না। কিন্তু সেই মনের মানুষ তো আমার এই সামান্য মানুষটি নয় ; তাঁকে তো কাপড় পরিয়ে, আহার করিয়ে, শয্যায় শুইয়ে, ভোগের সামগ্রী দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার নয়। তিনি আমার মনের মানুষ বটে কিন্তু তবু দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতে হচ্ছে, 'আমার মনের মানুষ কে রে, আমি কোথায় পাব তারে !' সে যে কে, তা তো আপনাকে কোনো সহজ অভ্যাসের মধ্যে স্থূল রকম করে ভুলিয়ে রাখলে জানতে পারব না !…'কোথায় পাব তারে ?' কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে তো পাওয়া যাবে না,—স্বার্থবন্ধন মোচন করতে করতে, মঙ্গলকে সাধন করতে করতেই তাকে পাওয়া —আপনাকে নিয়ত দানের দ্বারাই তাকে নিয়ত পাওয়া। মানুষ এমনি করেই তো আপনার মনেরমানুষের সন্ধান করছে—এমনি করেই তো তার সমস্ত দুঃসাধ্য সাধনার ভিতর দিয়েই যুগে যুগে সেই মনের মানুষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে ;—যতই তাকে পাচ্ছে, ততই বলছে : 'আমি কোথায় পাব তারে ?'—সেই মনের মানুষকে নিয়ে মানুষের মিলন-বিচ্ছেদ একাধারেই, তাকে পাওয়ার মধ্যেই তাঁকে না-পাওয়া।…এই যে তার চিরকালের গান, 'আমি কোথায় পাব তারে—আমার মনের মানুষ যে রে ?' এই প্রশ্ন যে তার চিরদিনের প্রশ্ন : 'মনের মানুষ যেখানে,—বলো কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে ?'—কেননা সন্ধান এবং পেতে থাকা একসঙ্গে ;—যখনি সন্ধানের অবসান তখনি উপলব্ধির বিকৃতি ও বিনাশ—" (শান্তিনিকেতন, পৃ ৫৩৭-৫৪০)।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে আধ্যাত্মিকতা

আবার, উপরে বর্ণিত গানটিরই অনুপ্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ যখন রচনা করলেন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' - সারা দেশ মেতে উঠল তাঁর সেই গানের সুরে। যাঁরা গত ১৩১২ সালের বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছেন—শুধু তাঁরাই পারেন বলতে সেই উদ্দীপনার ইতিকথা। এ-সময়েরই আগে-পরে ঐ বাউল সুরে অনুপ্রাণিত হয়ে একাধিক জাতীয়সঙ্গীত লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বাউল' নামে তখন তাঁর একটি গানের বইও প্রকাশিত হয়। এই সম্পর্কে, বর্তমান গ্রন্থমধ্যে 'সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি' শীর্ষক প্রস্তাবটির প্রতি জিজ্ঞাসু পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি

আকর্ষণ করছি। বস্তুত তৎকালীন সৃষ্ট কবিগুরুর অনেক গানই, উক্ত বাউল সুরের দ্বারা প্রভাবিত।

শুধু গানে কেন,—কবির ব্যক্তিগত জীবনের উপরেও যে বাউলের প্রভাব পর্যাপ্ত মাত্রায় ছিল না,—সেটাই বা আমরা বলি কী করে! স্বরচিত নাটকের অভিনয়ে 'বাউল'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে তিনি বিশেষ ভালবাসতেন—নিজেকে 'রবীন্দ্র বাউল' বলে পরিচয়ও দিয়েছেন—এটা তাঁর লেখা থেকেই জানা যায়,—'বাউলবেশে রবীন্দ্রনাথে'র ছবি আছে—তাও পাওয়া যায় দেখতে। তাছাড়া অনেকেই জানেন, বিধাতা কবিকে প্রচুর সুখসম্পদের অধিকারী করে পাঠালেও—কবি সেই অধিকার স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে প্রায় নির্জন বসবাস শুরু করেছিলেন, বোলপুর-শান্তিনিকেতনে এসে।

শান্তিনিকেতন হল বোলপুর-বেলষ্টেশান হতে মাইল দেড়েক দূরে। এর নামকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :—একদা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রায়পুরের ভুবনসিংহের বাড়িতে নিমন্ত্রণ সেরে পাল্‌কি করে ফিরছিলেন তখন রুক্ষ-রিক্ত পথ ও মাঠের মাঝখানে দুটি গাছের আহ্বান তাঁর মনে এসে পৌঁছেছিল। ঐখানেই শান্তির প্রত্যাশায় সিংহদের কাছ থেকে জমিদান গ্রহণ করে একটা একতলা বাড়ি বানিয়েছিলেন তিনি,-নাম দিয়েছিলেন তার 'শান্তিনিকেতন'। সেই খোলামাঠে তখন আর কিছুই ছিল না,—না ছিল কোনো গাছপালা, না ছিল মানুষের এত ভিড়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যস্মৃতিতে লিখেছেন: "উপনয়নের পরেই [বাবামশায়ের সঙ্গে ন-দশ বৎসর বয়সে, আমি এখানে এসেছি। উপনয়ন-অনুষ্ঠানের ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করবার যে-দীক্ষা পেয়েছিলেম পিতৃদেবের কাছ থেকে—এখানে বিশ্বদেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলেম সেই দীক্ষাই। আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথম বয়সে এই সুযোগ যদি আমার না ঘটত। পিতৃদেব কোনো নিষেধ বা শাসন দিয়ে আমাকে বেষ্টন করেননি"—(প্রবাসী ১৩৪০ আশ্বিন।। অবশেষে ১৯০১ সালে মহর্ষির সম্মতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন ঐ জায়গাতেই এসে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন—তখন তার বয়ঃক্রম চল্লিশ। প্রতিষ্ঠাকালের শুরুতে কেবল পাঁচ-ছয়টি ছাত্র পেয়েছিলেন তিনি। সেই সময়ে তাঁর স্ত্রী মৃণালিনীদেবীই* ছিলেন এ-কাজে একমাত্র সহায়িকা। প্রাচীন ভারতের তপোবনে শিক্ষাদানের আদর্শ অনুযায়ী নবীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতিকেও প্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে মুক্ত করে দেওয়াই ছিল কবিগুরুর উদ্দেশ্য। তাঁর রচিত এই ব্রহ্মচর্যাশ্রম-বিদ্যালয়টি ক্রমশ: বিশ্বভারতীতে পরিণত হয়—যার সূচনা ১৯১৮

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং 'বিশ্বভারতী'

*"১২৯০ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ (১৮৮৩, ৯ই ডিসেম্বর) খুলনা জেলার দক্ষিণডিহির বেণীমাধব রায় চৌধুরীর কন্যার সহিত রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। কুলপঞ্জী অনুসারে কন্যার নাম ছিল ভবতারিণী, ঠাকুরবাড়িতে আসিয়া তাঁহার নাম হইল মৃণালিনী"—[রবীন্দ্রজীবনের ঘটনাপঞ্জী : 'দেশ' ৩১শে শ্রাবণ ১৩৪৮ পৃ ৬৫৭]

সালে। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশ্বভারতীকে কবি সর্বসাধারণের জন্যে উৎসর্গ করেন। বর্তমানে 'বিশ্বভারতী' যে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়—এতথ্য তো সর্বজনবিদিত।

কিন্তু বলছিলাম,—সেই ১৯০১ সালের ২২ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম খোলা হল আনুষ্ঠানিক ভাবে। তখনই শিলাইদহ থেকে স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চলে আসেন বোলপুরে। সকল রকমের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজ পুত্রকন্যাদের কলকাতা নগরীতে রেখে লেখাপড়া শেখান নি। কবিগুরুর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটুকু লক্ষণীয়। কারণ, সঙ্গীতের সুর রচনায় ও কাব্যের ছন্দ যোজনায় যেমন কোনো বাঁধা পথ অনুসরণ করে তিনি চলতেন না, (কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে, সুর-রচয়িতা হিসাবেও নাকি রবীন্দ্রনাথ বাউল-পর্যায়েরই লোক।—তেমনি আমরা দেখি, তাঁর সংসার পরিচালনায়ও সংসারের অতি সাধারণ চলতি সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বাঁধা পথ ধরে নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে চলতে দিতেও তাঁর রীতিমত অনিচ্ছা। এমনতর মনোভাব কিন্তু সুষ্ঠু সঙ্গতিবান হিসাবী-সংসারীদের মধ্যে খুবই বিরল। আমার বিশ্বাস এটা সম্ভব হয়েছিল কবিগুরু যথার্থ বাউল প্রকৃতির লোক ছিলেন বলেই। আজ যে শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী নিয়ে আমাদের এত গৌরব- তাও তো রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি। সেটা তো মোটেই কবির সাংসারিক ভোগবিলাসের মধ্যে তৈরি হয় নি, সেটা তিলে-তিলে গড়ে উঠেছে তাঁর বিরাট ত্যাগের যজ্ঞেতে। এর পিছন থেকে কবিগুরুর অন্তরের বাউল প্রকৃতিটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের কোন এক লেখা থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি,—আশাকরি এর দ্বারা পাঠকেরা আমার উপরিউক্ত অভিমত প্রকাশের মূল দৃষ্টিকোণটিও সহজে অনুভব করতে পারবেন।

রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "কলকাতায় মা আত্মীয়স্বজনের স্নেহবন্ধনের মধ্যে একটি বৃহৎ পরিবেশের মধ্যে ছিলেন। তাঁকে সকলেই ভালবাসত। জোড়াসাঁকো-বাড়ির তিনিই প্রকৃতপক্ষে কর্ত্রী ছিলেন। সেইজন্য কলকাতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনে এসে থাকা তাঁর পক্ষে আনন্দকর হয়নি।...শান্তিনিকেতনে গুছিয়ে সংসার পাতার কোনো উপায় ছিল না, কিন্তু তাঁর নিজের পক্ষে সেটা যতই কষ্টকর হোক তিনি সব অসুবিধা হাসিমুখে মেনে নিয়ে স্কুলের কাজে বাবাকে প্রফুল্লচিত্তে সহযোগিতা করতে লাগলেন। তাঁর জন্য তাঁকে কম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। যখনই বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে নিজের অলংকার একে একে বিক্রী করে বাবাকে টাকা দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত হাতে সামান্য কয়েক গাছা চুড়ি ও গলার একটি চেন ছাড়া তাঁর কোনো গয়না অবশিষ্ট ছিল না। মা পেয়েছিলেন প্রচুর;—বিবাহের যৌতুক ছাড়াও শাশুড়ীর পুরানো আমলের ভারী গয়না ছিল অনেক। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের খরচ জোগাতে সব অন্তর্ধান হল। বাবার নিজের যা-কিছু মূল্যবান সম্পত্তি ছিল তা আগেই তিনি বেচে দিয়েছিলেন।...বাবার সেই ত্যাগ স্বীকারে মা তাঁর অংশ স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের আত্মীয়েরা মাকে এই জন্য ভর্ৎসনা

করতেন। বাবাকে তো তাঁরা কাণ্ডজ্ঞানহীন অবিবেচক মনে করতেন। বহুকাল পর্যন্ত বাবাকে, আর মা যতদিন বেঁচেছিলেন তাঁকে,—বাড়ির লোকদের কাছ থেকে···বিদ্রূপ ও বিরুদ্ধতা সহ্য করতে হয়েছিল"—(পিতৃস্মৃতি পৃ ৭৯)। কবিগুরু তাঁর মহাপ্রয়াণের অল্পকাল আগে গল্পচ্ছলে নিজে আমাদের যা বলতেন তাও এখানে কিছুটা শোনা যাক: "দেখ্, ছেলেবেলা থেকেই আমার কেমন সন্ন্যাসীর জীবন! সেই কত অল্পবয়সে একলা পদ্মার চরে ছিলুম। মাসের পর মাস কেটেছে,—কারো সঙ্গে কথাটি পর্যন্ত কই নি। আর সে-সময় যত ভালোভালো লেখা আমার বেরিয়েছে। আমি হলুম শ্যামলা ধরণীর বরপুত্র। শ্যামল মাটির সঙ্গেই আমার সম্পর্ক বেশি। সেখানেই আমার গভীর টান। আমার কি সাজে দালানে বাস করা! আমার এই মাটির বাসায় মাটি হয়ে থাকব, একদিন মাটির সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাব—এই-ই ভালো" –(আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, পৃ ১৯ এবং ২৪)।

যাই হোক এবার ফিরে আসুন আমাদের আগের কথায়, যেখানে বলা হচ্ছিল, শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউলের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নবীন বয়সে যে গানটি শুনেছিলেন 'কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে'—এমনতর চিত্ত-উদাস করা বাণীকে কেন্দ্র করেই তিনি আরো লিখেছিলেন সেই একই ভূমিকায়: "কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে· যাকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো,—নইলে যে মরণবেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুনলুম তার গেঁয়ো সুরে, সহজ ভাষায়। 'অন্তরতর যদয়মাত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' বলে শুনলুম, আমার মনে বড়ো বিস্ময় লেগেছিল"—(রবীন্দ্ররচনাবলী-১৪শ খণ্ড, পৃ ৯৬৩)।

কবিগুরুর বলার শেষ এইখানেই নয়। মনের মানুষ নিয়ে তিনি সারা জীবনে প্রচুর আলোচনা করেছেন—বিশেষকরে কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয়ে-প্রদত্ত কমলাবক্তৃতামালায়;—সেখান থেকেও কয়টি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি:

"আপনারই পরমকে না দেখে মানুষ বাইরের দিকে সার্থকতা খুঁজে বেড়ায়। শেষকালে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে সে বলে: কস্মৈ দেবায় হাবষা বিধেম। মানুষের দেবতা—মানুষের মনের মানুষ,—জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে-পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই—অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাইনে। মানুষের যত কিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে।···সেই বাহিরে-বিক্ষিপ্ত আপনা হারা মানুষের বিলাপগান একদিন শুনেছিলেম পথিক ভিখারির মুখে,—'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে!'···সেই নিরক্ষর গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনেছিলেম,—

মনের মানুষ

'তোরই ভিতর অতল সাগর'।—সেই পাগলই গেয়েছিল…যা আমাদের বাংলাদেশের বাউল বলেছে :

'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।
একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে [তারে] দেখতে পাবি সর্ব ঠাঁই

সেই মনের মানুষ সকল-মনের মানুষ,—আপন মনের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেলে সকলের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া হয়। এই কথাই উপনিষদ বলেছেন : যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। বলেছেন : তং বেদ্যং পুরুষং বেদ। যিনি বেদনীয় সেই পূর্ণমানুষকে জানো,- অন্তরে আপনার বেদনায় যাঁকে জানা যায়—তাঁকে সেই বেদনায় জানো,—জ্ঞানে নয়, বাইরে নয়"—(রবীন্দ্র-রচনাবলী-১২শ খণ্ড, পৃ ৫৮২ এবং ৫৯৬)।

আমরাও তাই ঐ গানের ঢং-এ ঐ একই সম্বোধনে একই অনুভূতি নিয়ে স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথকেও গাইতে শুনলাম :

'ও আমার মন, যখন জাগলি না রে,
তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।'

কিংবা 'অনেক দিনের মনের মানুষ এলে কে—কোন ভুলে যাওয়া বসন্ত থেকে?'

কিংবা 'সে যে মনের মানুষ কেন তাবে—বসিয়ে রাখিস নয়নদ্বারে।'

আবার গাইলেন তিনি একটু অন্যভাবে : 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই—যে রয় মনে, আমার মনে' অথবা 'আমাব প্রাণেব মানুষ আছে প্রাণে, তাই হেরি তায় সকল খানে'…এই ধরনের একাধিক গান।

রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন, বাউল ও বাউলগানেব সুরকে। সেই উপলব্ধি প্রকাশও কবেছেন এই বলে : "এমন বাউলেব গান শুনেছি, ভাষার সরলতায় ভাবের গভীরতায় সুবেব দরদে যার তুলনা মেলে না,—তাতে যেমন জ্ঞানেব তত্ত্ব, তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তিব রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করিনে"— ববীন্দ্র রচনাবলী-১৪শ খণ্ড, পৃ ১৬৩)।

এই প্রসঙ্গে তাঁব আব একটি অমূল্য প্রশস্তিব কিয়দংশও উদ্ধৃত হল :

"একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের সঙ্গীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে, অথচ সেই সুরগুলা স্বাধীন। ক্ষণে-ক্ষণে এ-রাগিণী ও-রাগিণীর আভাস পাই, কিন্তু ধরিতে পাবা যায় না। অনেক কীর্তন ও বাউলের সুর বৈঠকীগানের একেবারে গা ঘেঁষিয়া গিয়াও তাহাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ। কিন্তু বাউলের সুর যে একঘরে, রাগরাগিণী যতই চোখ রাঙাক সে কিসের কেয়ার করে! এই সুরগুলিকে কোনো রাগকৌলীন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে, তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না—স্পষ্ট বোঝা যায় এ আমাদের দেশেরই সুর; বিলিতি সুর নয়"— (সঙ্গীতের মুক্তি)।

কবিগুরুর এই উক্তিগুলি যত্নসহকারে অনুধাবন করলে দেখা যাবে, তাঁর স্বরচিত গানে নবনব সুর-সৃষ্টির ব্যাপারেও কিন্তু ঐ একই আদর্শ বহুলাংশে অনুসৃত।

মোটের উপর সংগীত-রচনায় বাউলের গান রবীন্দ্রনাথকে বিচিত্রভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং পল্লীগীতির যাবতীয় সুরের মধ্যে এই বাউল সুরের প্রতিই যে তিনি সব চেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। তাছাড়া বাউলতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যাদি বাঁচিয়ে বাউল সুরেরই মাধ্যমে যে, কাল এবং যুগোপযোগী উচ্চ উৎকৃষ্টশ্রেণীর বাংলাগান রচনা করা সম্ভব এটাও আমরা জানার সুযোগ পেয়েছি রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট এই আলোচ্য নূতন-সঙ্গীত-ধারারই প্রসাদে,—তা বললে বোধকরি ভুল হবে না। তবুও এখানে উল্লেখ প্রয়োজন,—তাঁর রচিত বাউল গানের সকল ক্ষেত্রে সকল সময়েই যে তিনি বাউলের সুরটি পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছেন তা বলা ঠিক নয়। অনেক সময়ই কিন্তু রাখেন নি। অন্যান্য গানের মতন এর ভিতরেও সুচারু মিশ্রণ তিনি ঘটিয়েছেন —কোথাও বা বাউলের সঙ্গে কীর্তনের সুর মিশিয়ে, আবার কোথাও বা স্বচ্ছন্দে মিলিয়েছেন এনে ভাটিয়ালী কিংবা সারি-গানের সুরের স্পর্শ*।

রবীন্দ্র-বাউল

রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন: "বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি। নিঃসংশয়ে জানি, বাউল-সঙ্গীতে একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে যা চিরকালের আধুনিক।…আমার অনেক গান বাউলের ছাঁচের, কিন্তু জাল করতে চেষ্টাও করি নি। সেগুলো স্পষ্টতর রবীন্দ্র-বাউলের রচনা।"

রবীন্দ্রনাথের স্বীয় বক্তব্য থেকে আমরা এবার যা জানলাম—এর পরে এই প্রসঙ্গে অতিরিক্ত মন্তব্য আরোপ করে প্রবন্ধটিকে অধিকতর ভারাক্রান্ত কিংবা জটিল করে তোলা অনাবশ্যক বোধ করি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে হিন্দুস্থানীগানের প্রভাব

"গোড়াতেই একটা কথা জোর করে বলে রাখি, ছেলেবেলা থেকে ভাল হিন্দুস্থানীগান শুনে আসছি বলে তার মহত্ত্ব ও মাধুর্য সমস্ত মন দিয়েই স্বীকার করি। ভাল হিন্দুস্থানীগান আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করে"—রবীন্দ্রনাথ

১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় 'অল বেঙ্গল মিউজিক কন্‌ফারেন্স'-এ উপস্থিত থেকে নিজেই শুনেছিলাম, কবিগুরু বলছিলেন: "আমি স্বীকার করব হিন্দুস্থানী ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের সৌন্দর্যের সীমা নেই, -যেমন অজন্তার মত কারুকার্য আর কোথাও হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু ছোট ছেলের মত তার উপর দাগা বুলিয়ে বুলিয়ে পুনর্চিত্রিত করা, -সেই কি আমাদের ধর্ম? সেই কি আমাদের আদর্শ? যে-পূর্ণতা পূর্বতনকালে আপনাকে প্রকাশ করেছে সেই পূর্ণতাকে উত্তীর্ণ হয়ে আপনাকে যদি প্রকাশ

* বাউল সুরে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা মোটামুটি তালিকা দেওয়া আছে পরিশিষ্টে।

করতে না পারি তাহলে ব্যর্থ হল আমাদের শিক্ষা। বড়ে বড়ো মনস্বীগণ আমাদের কী শিক্ষা দিয়েছেন ? বলেছেন, 'তোমরা অনুপ্রেরণা লাভ কর—সেই অনুপ্রেরণা তোমাদের শক্তিতে প্রকাশ কর'। তানসেন অনুকরণের কথা বলেন নি এবং কোনো গুণীই তা বলেন নি,—বলতে পারেন না।"

এরই বছর চারেক বাদে কোন্ এক আলাপ-আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন: "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত আমি সর্বান্তঃকরণে ভালবাসি···বাল্যকাল থেকেই।···প্রতি সুন্দর সৃষ্টি পুরনো হলেও রসিকের মনে আনন্দের সাড়া তুলবে এই তো উচিত।···ভাল জিনিস ভাল না লাগাটা লজ্জারই বিষয়, গৌরবের নয়। সুতরাং শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যখন সত্যিই সঙ্গীতের একটি মহৎ বিকাশ, তখন সেটা যদি তোমাদের কারো ভাল না-ও লাগে তো সলজ্জেই বলবে, যে, ভাল লাগল না, বলবে—ও-রসের রসিক হবার কোনো সাধনাই করিনি বা করবার সময় পাইনি,—নইলে লাগত নিশ্চয়ই।" তিনি ফের ঐ বক্তব্যেরই সূত্র টেনে বলছেন; "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিরুদ্ধে আজ এই যে বিদ্রোহের চিহ্ন দিকে-দিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তাকে তাই অকল্যাণজনক মনে করা সঙ্গত নয়। হিন্দুস্থানী বীণাপাণি আজ শবাসনা—তার এ-আসনকে চাই টলানো।···বাংলাগানে দেখ, হিন্দুস্থানী সুরই তো পনর আনা।···হিন্দুস্থানী সুরের শাশ্বত দীপ্তিই যে বাংলাগানে নবজন্ম পেয়েছে একথা ভুললে তো চলবে না। আমরা যে বিদ্রোহ করেছি সেটা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আত্মপ্রসাদের বিরুদ্ধে, গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে,—তার আনন্দদানের বিরুদ্ধে নয়। কেননা, আমাদের গানেও তো আমরা হিন্দুস্থানীগানের রাগরাগিণীর প্রেরণাকেই মেনে নিয়েছি। হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতকে আমরা চেয়েছি,—কিন্তু আপনার করে পেলে তবেই না পাওয়া হয়। হিন্দুস্থানী সুরবিহার প্রভৃতি শুনে আমি খুশি হই; কিন্তু বলি: বেশ—খুব ভালো। কিন্তু ওকে নিয়ে আমি করব কী? আমি চাই তাকে, যে আমার সঙ্গে কথা কইবে"—(তীর্থংকর, পৃ ১৫৫-১৫৭)।

ঐ একই প্রসঙ্গে ১৯৩৫ সালের কোন এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানাচ্ছেন: "আমরা যাকে হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত বলি তার মধ্যে দুটো জিনিস আছে,—একটা হচ্চে গানের তত্ত্ব, আর একটা গানের সৃষ্টি। গানের তত্ত্বটি অবলম্বন করে বড়ো বড়ো হিন্দুস্থানী-গুণী গান সৃষ্টি করেছেন। যে-যুগে তাঁরা সৃষ্টি করেছেন সেই বাদশাহী যুগের প্রভাব আছে তার মধ্যে। দেশকালপাত্রের সঙ্গে সঙ্গতিক্রমে তাঁদের সেই সৃষ্টি সত্য,—যেমন সত্য সেকেন্দ্রাবাদ প্রাসাদের স্থাপত্য। তাকে প্রশংসা করব, কিন্তু অনুকরণ করতে গেলে নূতন দেশকালপাত্রে হুঁচট খেয়ে সেটা সত্য হারাবে"—(সুর ও সঙ্গতি, পৃ ৮২)।

রবীন্দ্রনাথের ইত্যাকার উক্তি যথাযথ অধিগত হয়ে সতর্কতার সঙ্গে তাঁর গানে হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতের প্রভাব নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই ত সকলের পক্ষে সর্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত। কারণ কবিগুরু আরেক জায়গায় স্পষ্ট করেই যখন বলেছেন:

"আমি যে গান তৈরি করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতের ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে—এ কথা কেন তোমরা স্বীকার করতে চাও না? কেন স্বীকার করবে না যে, হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতে সুর মুক্তপুরুষভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে? কথাকে শরিক বলে মানতে সে যে নারাজ! বাংলায় সুর কথাকে খোঁজে,—চিরকুমার ব্রত তার নয়, সে যুগল-মিলনের পক্ষপাতী।...বাংলাসঙ্গীতের,—বিশেষত আধুনিক বাংলাসঙ্গীতের বিকাশ তো হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতের ধারায় হয়নি। আমি তো সে-দাবী করছিও না। আমার আধুনিক গানকে সঙ্গীতের একটা বিশেষ মহলে বসিয়ে তাকে একটা বিশেষ নাম দাও না,—আপত্তি কী!"—(রবীন্দ্র-রচনাবলী—১৪শ খণ্ড, পৃ ১২৪-১২৫)।

কাজেই সঙ্গে-সঙ্গে এ-ও বিবেচ্য,—রবীন্দ্রনাথ তার গানকে একটা বিশেষমহলে বসিয়ে বিশেষ নাম দেবার দাবীটা যে কী কারণে জানিয়েছেন, সেই কারণটাকে আমরা ক-জনেই বা তলিয়ে দেখি কিংবা বুঝবার প্রয়োজন মনে করি! এইটে বলছি আরো এজন্যে, যে,—গানের জগতে রবীন্দ্রনাথ একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তন করে গেছেন—যার উৎসমূল তাঁর নিজেরই মানসলোক। সেখানে তিনি তাঁর সক্রিয় প্রতিভার জ্যোতিতে সম্পূর্ণভাবে একক—এবং সৃষ্টিটাও তাঁর সম্পূর্ণ একার।—এসব কথা আমরা মুখে মুখে প্রচার করি বটে (যা অন্যত্রও বলা হয়েছে একটু অন্যভাবে), কিন্তু কাযত নানা বিভ্রমে পড়ে' তাঁর গানকে আবার কখনসখন নানাবিধ তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা অন্য সঙ্গীতের পর্যায়ে টেনে আনবার চেষ্টায়ও যে আমরা প্রকারান্তরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সৌন্দর্য, ভাব-রস তথা তার মূল প্রাণ-ঐশ্বর্য উপলব্ধির পথ থেকে নিজেদেরই ক্রমশঃ দূরে সরিয়ে নিয়ে যাই—এই অনুভূতি কি যথার্থ সজাগ থাকে তখন? ঐ একই সংশয়ের প্রেক্ষিতে আরো বলা যায়,—এ খবর কি সবাই রাখেন যে, প্রাকৃত ও সাধুবাংলার দৃষ্টান্ত টেনে এই হিন্দুস্থানী সুরাদি-সহযোগে বাংলাগানের ভিতর তাঁর সৃষ্ট নবধারা-প্রবর্তন সম্পর্কেই কবি একবার আমাদের বলেছিলেন:

"বিদ্যাসাগরী 'রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপত্যনির্বিশেষে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন' এ হল অতি ব্যাকরণসম্মত অনবদ্য ভাষা। কিন্তু তবু বঙ্কিম একে গ্রহণ করেননি। তাঁকে গাল খেতে হল তাঁর নবভাষার জন্যে—কিন্তু তবু বঙ্কিমই হলেন ভাষার ধ্বজাবাহী—বিদ্যাসাগর নন। আমরাও এই পথেই চলেছি—অর্থাৎ নবসৃষ্টির পথে। বৈয়াকরণরা কখনো বা হাসলেন, কখনো বা গুরুগম্ভীরস্বরে তর্জন করলেন, 'তিষ্ঠ—গুরুচণ্ডালি দোষে ভাষার যে ঘটল ভরাডুবি'। কিন্তু...আমাদের হাতে প্রাকৃতবাংলার অনধিকার প্রবেশে ভাষার তো ঘটেনি অপঘাত...প্রাকৃতবাংলার সহযোগে বাংলাভাষার প্রকাশশক্তি বেড়েছে অজস্র—রঙে ঢঙে ব্যঞ্জনায়। আর এ-সম্ভব হয়েছে জেনো,—এই গুরুচণ্ডালী দোষের প্রসাদেই। তারই কল্যাণে আজকের বাংলায় সংস্কৃত জীমূতমন্দ্রের সঙ্গে প্রাকৃতবাংলার কেয়ূর কঙ্কণ মিশে গেল

—পর হল আপন, মান্যগণ্য হল প্রিয় পরিজন। তেমনি, হিন্দুস্থানীসুরে মিশেল আনতে আমাদের বাধবে কেন? আমি মানি বাগরাগিণীর একটা নিজস্ব মহিমা আছে। এও মানি যে রাগরাগিণীর পরিচয় বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ঐ যে বললাম তা থেকে প্রেরণা পেতে, তাকে নকল কবতে নয়” (তীর্থংকর পৃ ১৫৭)।

এ-সব কথা তো কবিগুরু আমাদের বলেছেন মাত্র এই চলিত বিশ-শতকের মধ্যে, কিন্তু এরও বহুকাল আগে বাংলা ১২৯১ সালে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে রেখেছিলেন:

“হিন্দিসাহিত্য সম্বন্ধে, বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্তু, এ-কথা বলিতে পারি, হিন্দিতে যে-সকল ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি পদ শুনা যায় তাহার অধিকাংশই কেবল মাত্র গান, একেবারেই কাব্য নহে। কথাকে সামান্য উপলক্ষ মাত্র করিয়া সুব শুনানোই হিন্দিগানের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বাংলায় সুরের সাহায্য লইয়া কথার ভাবে শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করাই কবির উদ্দেশ্য। কবির গান, কীর্তন, রামপ্রসাদী গান, বাউলের গান প্রভৃতি দেখিলেই ইহার প্রমাণ হইবে। অতএব কাব্যরচনাই বাংলাগানের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুবসংযোগ গৌণ। এই সকল কাবণে বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারে রত্ন যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা গান”—(ববীন্দ্র-রচনাবলী-১৪শ খণ্ড, পৃ, ৯৯৮)। অতঃপব ১৩৩১ সালে কবি আবার জানাচ্ছেন: “হিন্দুস্থানীসঙ্গীত শিক্ষা দেবার আমি পক্ষপাতী, কিন্তু একথা আমি বলব না যে—‘যা হয়ে গেছে তা আর হবে না’। হয়তো সেটাই উৎকৃষ্ট মনে করে কিছুদিন তার অনুবর্তিতা কবতেও পাবি, কিন্তু তা টিঁকবে না। তাকে নিজস্ব কবে, জীবনস্রোতের কলধ্বনিব সঙ্গে সুর বেঁধে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে, নইলে তা টিঁকবে না।”—(রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ১০০৫)।

কবিগুরুর তাৎপর্যপূর্ণ উপরোক্ত কথাগুলির প্রতি পাঠকদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে ক্রমাণ আলোচনা-ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করি,—আমরা যদি এখন অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই একটা ঢালাও মন্তব্য করে বসি যে—রবীন্দ্রসঙ্গীতে হিন্দুস্থানীগানের প্রভাব অপবিসীম—তাহলে কি সেটা ঠিক হবে? বরং যদি বলি, যা অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একদা কোন্-এক জায়গায় বলেছিলেন:

“রবীন্দ্রসঙ্গীত হিন্দুস্থানীসঙ্গীতেরই অঙ্গ। যে-সব গান অঙ্গভঙ্গ হয়েছে মনে হয়, সেখানেও অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ রীতি-বিগর্হিত কাজ করেন নি। রাগভ্রষ্টতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী তাঁর কবিতার কোনো বিশেষ ভাব, যাকে মূর্তি দেওয়া প্রচলিত বিশেষ রাগরূপের মধ্যে এক প্রকার অসম্ভব। তবু রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্ণসংকর নয়”—(বক্তব্য, পৃ ১১৮)।

তখন না হয় এই কথারই প্রেক্ষিতে কবিগুরুর গানে হিন্দুস্থানীসঙ্গীতের প্রভাব * সম্পর্কীয়

---

* ‘প্রভাব’ শব্দটি যে ‘প্রেরণা’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—সেই বিষয়ে ‘রবীন্দ্রনাথের গানে প্রাদেশিক ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব’ শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখিত উপসংহারের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আগেই আকর্ষণ করেছি। এবার এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত কবিগুরুর স্বীয় প্রাসঙ্গিক উক্তিগুলিও পাঠকেরা তুলনা করে দেখতে পারেন।

বিচারে অবতীর্ণ হওয়া আমাদের পক্ষে খানিকটা সম্ভব হলেও হতে পারে। অন্তত খুব সংক্ষেপ আমরা এটুকু বলতে পারি :

" জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে হিন্দুস্থানী ক্লাসিক্যাল পদ্ধতির প্রায় সমস্ত ধারাগুলোই সাদর আমন্ত্রণ পেয়েছিল।...এখানে শুধু কোন নির্দিষ্ট ঘরানারই একক কর্তৃত্ব বা স্বীকৃত ছিল না। তাই বাংলাদেশের বিভিন্ন ঘরানার বিশিষ্ট গুণীরা ছাড়াও, দূর-দূরান্ত থেকে নানা ঘরানার খ্যাতিমান ওস্তাদেরা এখানে সমবেত হতেন সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ পেয়ে। তবুও, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত-কর্মধারার বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এখানে অন্য কোন ঘরানা অপেক্ষা 'বিষ্ণুপুরী' ঘরানার প্রভাবই বেশি পরিমাণে রয়েছে। বিশেষভাবে, তাঁর ধ্রুপদ, খেয়াল এবং টপ্পা ইত্যাদির গানের সুর সংযোজনে—এ ঘরানার প্রভাব অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়।...এই ঘরানার খ্যাতিসম্পন্ন ওস্তাদদের অনেকের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির যোগাযোগ নিবিড় ছিল এবং রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রাগ্রজদের মধ্যে সকলেই বিষ্ণুপুরী পদ্ধতিকে বেশি পছন্দ করতেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও এই প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।...বিষ্ণুপুরী ঘরানা ছাড়াও, সে যুগে ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল পদ্ধতির নানা ঘরানার চলন কলকাতা এবং বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে প্রচলিত ছিল এবং সে সমস্ত ঘরানার ব্যাপক অনুশীলন এবং মর্যাদাকে তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের গায়কগোষ্ঠী এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ গুণীরা মোটেই উপেক্ষা করতে পারেন নি। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত রচনা-শৈলীর প্রতি লক্ষ্য করলেই বিষয়টা সহজেই অনুধাবন করা যাবে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-মানস এবং গীতরচনা-রুচিও, ঐ সমস্ত ক্লাসিক্যাল ঘরানার প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। ফলে, রবীন্দ্রনাথের গানে বিষ্ণুপুরী ঘরানার রীতি-নীতি ছাড়া, অন্যান্য ঘরানার নিয়ম-নিষ্ঠার ও মিলন-মিশ্রণ ঘটেছে। তাছাড়া, এ সময়ে বাংলার সঙ্গীতজগতে দু'জন অসাধারণ প্রতিভাশালী ধ্রুপদীয়ার আবির্ভাব হয়েছিল এবং তাঁরা হলেন যদুভট্ট এবং রাধিকা গোস্বামী।...এঁদের গায়নরীতি বা পদ্ধতিও সে যুগে বাংলাদেশের সঙ্গীতসমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এমন কি, রবীন্দ্রনাথও এই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি"—(রবীন্দ্রসঙ্গীত ১I, পৃ ১৫৫-১৫৬)।

এই হল আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের (সম্পূর্ণ নয় কিন্তু), অতি সংক্ষিপ্ত পটভূমি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ-বিষয়ে বলেছেন :

"বাল্যকালে...ভাগ্যক্রমে গানের রসে আমার মন রসিয়ে উঠেছিল। তখন আমাদের বাড়িতে গানের চর্চার বিরাম ছিল না। বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন সঙ্গীতের আচার্য, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকলায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন। অতএব...যে সব গান সর্বদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল, সে শখের দলের গান নয়; তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা

ঠাট আপনা-আপনি জমে উঠেছিল।…মনে যে-সুর জমে ছিল, সে-সুর যখন প্রকাশিত হতে চাইলে তখন কথার সঙ্গে গলাগলি করে সে দেখা দিল। ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল, তখন অবিমিশ্র সঙ্গীতের রূপ সে রচনা করলে না। সঙ্গীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে,—কোন্‌টা বড়ো কোন্‌টা ছোটো বোঝা গেল না"—(সবুজপত্র ১৩২৮ ভাদ্র)।

কবিগুরুর এই কথার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর তাঁর তৎকালীন রচিত অনেক গানের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন সুরে। সেই সব গানের তালিকা তৈরি করেছেন শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী,—এ সম্পর্কে তাঁর রচিত 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণীসংগম' পুস্তিকাটি জ্ঞানার্থীদের পক্ষে দ্রষ্টব্য।

তাছাড়া অনেকেরই জানা আছে যে, বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ যদুভট্টের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি যদুভট্ট-রচিত কয়েকটি হিন্দীগানের প্রতি এত আকৃষ্ট হন যে সেগুলির আদর্শে নিজেও বাংলাগান রচনা করেন। কৌতূহলী পাঠকদের জন্য কয়-একটি কলি তুলনামূলক হিসাবে এখানে তুলে দেওয়া হল :

[বাহার - তেওরা]

॥ আজু বহত সুগন্ধ পবন সুমন্দ মধুর বসন্ত মেঁ ॥—যদুভট্ট	॥ আজি বহিছে বসন্ত পবন ॥ সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে ॥—রবীন্দ্রনাথ

[তিলককামোদ—সুরফাঁকতাল]

॥ শম্ভু হর পদযুগ ধ্যানি বখানি ॥—যদুভট্ট	॥ শান্তি কর বরিষণ নীরব ধারে ॥—রবীন্দ্রনাথ

[তিলক-কামোদ—ঝাঁপতাল]

॥ কৌনরূপবনে হো রাজাধিরাজ ॥—যদুভট্ট	॥ মধুররূপে বিরাজ হে-বিশ্বরাজ ॥—রবীন্দ্রনাথ

[ছায়ানট—সুরফাঁকতাল]

॥ শম্ভুহরমহেশ আদিত্রিলোচন ॥—যদুভট্ট	॥ ভক্তহৃদিবিকাশ প্রাণবিমোহন ॥—রবীন্দ্রনাথ

[এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, শুধুমাত্র যদুভট্ট-রচিত বাণীতে নয়,—তাল-রাগেতেও রবীন্দ্রনাথ হিন্দীগানের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন তাঁর স্বীয় রচনায়]

আর বেশি উপমা টেনে না দেখালেও পাঠকেরা এর দ্বারাই অনুমান করতে পারবেন, যে, রবীন্দ্রনাথের গানের উপর হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতের প্রভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছিল কত শোভন ও অন্তরঙ্গ। অথচ এসবের সঠিক খবর না রেখে সেকালের অনেকে, রবীন্দ্রনাথের গীতরচনার বিষয় নিয়ে যখন নিজ-নিজ মনগড়া নানা রকমের উদ্ভট ধারণা প্রচার করার কাজে বিশেষরূপে উৎসাহী ও মনোযোগী ছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথকেও বাধ্য হয়ে, তাঁর শেষ বয়সে বলতে হয়েছিল :

"বাংলাদেশে আমার নামে অনেক প্রবাদ প্রচলিত ;—তারই অন্তর্গত একটি জনশ্রুতি আছে যে, আমি হিন্দুস্থানী-গান জানি নে, বুঝি নে। আমার আদিযুগের রচিত

গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুব-পদ্ধতির রাগরাগিণীর সাক্ষী-দল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণসহ দূর ভাবীশতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাদ্-বিতণ্ডার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সঙ্গীতকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনে,—সেই সঙ্গীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি—একথা যারা জানে না, তারাই হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত জানে না" —(সুর ও সঙ্গতি, পৃ ৭-৮)।

অনেকটা এই প্রসঙ্গেই, কবির গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি উক্তি অবশ্য শ্রোতব্য : "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত কেমন জানো ?—যেন শিব। রাগরাগিণীর তপস্যা হল শৈব-বিশুদ্ধির তপস্যা। কিন্তু তাইতেই ও মরল। এল উমা,—সঙ্গে এল ঐ ফুলের তীরন্দাজ ঠাকুরটি যার নাম ইংরাজিতে 'প্যাশন'। আমি বলি, যুগে-যুগে ক্লাসিসিজমের শৈব তপস্যা ভাঙতে হবে এই প্যাশনে—স্থাণুকে করতে হবে বিচলিত"—(তীর্থংকর, পৃ ১৫৭)। কিন্তু ঐ পূর্বোক্ত কথাটির সূত্র টেনে—রবীন্দ্রনাথ আবার বলেছিলেন অন্য জায়গায়, তাও এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে :

"আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি—একদিকে তার বিপুলতা, গভীরতা,—আর একদিকে তার আত্মদমন, সুসঙ্গতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা এই ধ্রুপদের সৃষ্টি আগেকার চেয়ে আরও বিস্তীর্ণ হোক, আরও বহু কক্ষবিশিষ্ট হোক, তার ভিত্তিসীমার মধ্যে বহু চিত্রবৈচিত্র্য ঘটুক,—তাহলে সঙ্গীতে আমাদের প্রতিভা বিশ্ববিজয়ী হবে"—(সুর ও সঙ্গতি, পৃ ৬৫)

কবিগুরুর দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ এত সব উক্তির সঙ্গে তার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত ভিন্ন ভিন্ন স্তরের গানগুলি মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করতে পারলে পরিষ্কার বোঝা যায়,—ধ্রুপদ ও ধামারে রচিত গানগুলিতে রাগরূপ, রস, ভাব, গাম্ভীর্য পুরোমাত্রায় বজায় রেখেও রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে নূতনত্বের সৃষ্টি করেছেন প্রচুর। সবাই জানেন, তাঁর দ্বারা বাংলাসঙ্গীতে অনেক নূতন মিশ্রণ প্রবর্তিত হয়েছে,—তাহলেও তাঁর সঙ্গীত-সৃষ্টির ক্ষেত্রে আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ* রাগরূপায়ণের এই চারিটি স্তর কিন্তু বহুলাংশে থেকে গেছে অটুট জনৈক বিশেষজ্ঞের অভিমত : 'রবীন্দ্রনাথ যে-সমস্ত পরিবর্তন করেছিলেন, এমনকি তাঁর ভুল-ত্রুটিগুলিও, নতুন ভাব, নতুন রাগরূপ সৃষ্টি করেছিল'—(বেতারজগৎ ২২ এপ্রিল, ১৯৬১)।

এ-সমস্ত, বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের স্বাধীনচিন্তার অনন্যসুলভ প্রতিভারই পরিচয়।

* গানের কলি "প্রধানতঃ চারি প্রকার :—আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থের মতানুসারে : 'গানের যেস্থানে রাগ উপবেশন করে, তাহাকে আস্থায়ী বলে। গানের শেষ ভাগকে অর্থাৎ যথায় গীত সমাপ্ত হয়, তাহাকে আভোগ বলে। ইহাদের মধ্যে যে কোন সুর উচ্চারিত হয়, তাহাকে অন্তরা বলে। এই তিনের মিশ্রিত যে-সুর, তাহার নাম সঞ্চারী'। কিন্তু আধুনিক গায়কদিগের মধ্যে যে অর্থে উহারা ব্যবহৃত হয় তাহাতে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে"—(গীতসূত্রসার, পৃ ৭৬)।

এর পিছনে আর বিশেষ টীকার প্রয়োজন পড়ে না। শুধু ভাবতে গিয়ে বিস্ময় জাগে, কৈ, কোনো প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তো রবীন্দ্রনাথ কখনো উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের সাধনা করেন নি! নিজেই বলেছেন কত জায়গায় কতবার,—ছেলেবেলায় দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে কান পেতে বাড়িতে আগত ওস্তাদগুণীদের মুখে যে-সব গান শুনতেন—সেগুলিই তাঁর মনে থেকে যেত। এমনি করেই নাকি শুধু ঐ কানে-শোনা আর নিছক অনিয়মের মধ্যেই তাঁর গানশেখা, এবং এ-থেকেই পেয়েছিলেন তিনি গান-রচনার প্রেরণা। কথাটা খুবই সহজ এবং অবিশ্বাস্য হতে পারে না কোনো মতে—যেহেতু কবি স্বয়ং তা জানিয়েছেন। তাহলেও কখন-সখন কি আর বিমূঢ়চিত্তে আমাদের কারুকে ভাবতে হয় না, যে,—তাঁর সৃষ্ট গান বিশ্বের দুয়ারে, বিশেষত এতদ্দেশীয় রক্ষণশীল অনেক সঙ্গীতবেত্তাদের কাছেও, এত আদরণীয়, সুন্দর ও অপূর্ব বলে স্বীকৃতি পেল কি করে? এর জবাব মিলবে অবশ্যই, যদি আমরা বুঝি এবং মনে রাখি, যে, লোকোত্তর পুরুষরূপেই রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন আমাদের মধ্যে* এবং লোকোত্তর পুরুষ মাত্রই স্বপ্রকাশ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের শোনা এবং শেখার কাজ তো অতি সাধারণদের মত হতে পারে না,—তাঁর কাজে অসাধারণত্ব ছিলই ছিল। এমনতর কথনের যাথার্থ্য, গানের মধ্যে তাঁর স্ব-আরোপিত সুরগুলি আজ কবির তিরোধানের সুদীর্ঘকাল পরেও পর্যালোচনা করলে,—এবং কবি যে বলেছিলেন, যা বর্তমান গ্রন্থেরই ১৫৭ পৃষ্ঠায় পূর্বে একবার উদ্ধৃত হয়েছে: "কথাকে সামান্য উপলক্ষ মাত্র করিয়া সুর শুনানোই হিন্দীগানের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বাংলায় সুরের সাহায্য লইয়া কথার ভাবে শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করাই কবির উদ্দেশ্য"—(পাঠকেরা ভেবে দেখুন, হিন্দী ও বাংলা গানের ভিতর অমিল-প্রসঙ্গীয় এমন এক সত্য অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের মত, তার আগে ভাষা দিয়ে এত সুন্দর সুনির্দিষ্ট আকারে বাঙালীদের তরফ থেকে, কে কবে কোথায় বা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন?)—তাঁর এই প্রকাশিত অমূল্য উক্তিটি ভুলে না গেলে; —যে-কোনো সুরবোধসম্পন্ন সঙ্গীতপ্রিয় সুশিক্ষিত জনই অনুভব করতে পারেন এবং স্বচ্ছন্দে অভিমত জানাতে পারেন এই বলে, যে,—ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের [*] প্রতি কবিগুরুর অনুরাগ এবং অনুশীলনবোধ ছিল কত নিবিড় ও গভীর। যথাবিধিতে 'নাড়া' বেঁধে কোনো ওস্তাদগুরুর অধীনে থেকে তা অনুশীলন না করলেও তিনি যে নিজ অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে এই সঙ্গীতের রাগরাগিণী এবং তালাদি সম্বন্ধে অসামান্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানটিও যে আবার সাধারণ বিদ্যার্থীর জ্ঞান নয়—সেই

অনিয়মের ভিতর কবির গান-শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান এবং সাধারণ বিদ্যার্থীর জ্ঞান

* রবীন্দ্রনাথের জন্ম: ৭ই মে ১৮৬১, সোমবার। মৃত্যু: ৭ই আগষ্ট ১৯৪১, বৃহস্পতিবার।

[*] ভারতের উচ্চাঙ্গসঙ্গীত বলতে এতৎঅঞ্চলে সাধারণত হিন্দুস্থানী গানকেই বোঝায়। প্রসঙ্গত বর্তমান প্রবন্ধের আরম্ভে কবিগুরুর নিজ উক্তি দ্রষ্টব্য।

কথাটাও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি আলোচনার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই অতিঅবশ্য স্মরণ এবং উপলব্ধিসাপেক্ষ। আসলে, যাবতীয় রাগরাগিণীর অমূর্তরূপকে নিজের অন্তরের ভিতরেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি—তাঁর স্বতঃস্ফর্ত জ্ঞানেরই উজ্জ্বল প্রতিভায়;—যে প্রতিভার রশ্মি অহরহ বিকীর্ণ হত অজস্র ধারায়—নানারকমে নানাভঙ্গীতে। আর, তারই পুণ্য আলোকে স্নান করে ধন্য হবার সুযোগ পেয়েছেন দেশ-বিদেশের জ্ঞানীগুণী রসিক কত সঙ্গীতপ্রেমীরাই না! এই সম্পদও তো আমাদের কাছে পরম গৌরবের। ইত্যাকার মন্তব্য বাদ দিয়েও এক্ষেত্রে চলতি ভাষায় শুধু বলা চলে,—গান-রচনার একেবারে শুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথ ধ্রুবপদ সঙ্গীতেই বিশেষভাবে মনোনিবেশে করেছিলেন, আর তাইজন্যে সেই সঙ্গীতের মহত্ত্ব এবং মাধুর্যকে কী সুন্দর ও সংযত ভাবেই না পূজো করে গেছেন প্রাণের অর্ঘ্য দিয়ে আজীবন! এর চুলচেরা-বিচার সরস, সুষ্ঠু ও সবল ভঙ্গিমায় করতে হলে প্রত্যেক বিচারককে যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি,—তেমন হিন্দুস্থানীসঙ্গীতের প্রতিও সমান অনুরাগী হতেই হবে—অর্থাৎ উভয় সঙ্গীতেই জ্ঞান ও পারদর্শিতা-অর্জন তাঁর অবশ্য বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় এ বিষয়ে অস্পষ্টতার অনুভূতি বিচারকেব মনে স্থায়ী হয়ে থেকে যাবারই সম্ভাবনা বেশি,—যার ফলে, বিচারের কাজে অনন্ত কাল ধবে চলতে থাকবে শুধু এক গোলমালেরই অনুবতন। এমনতর ইঙ্গিত প্রসঙ্গান্তরেও আগে নেওয়া হয়েছে একাধিক স্থলে,—তবু ফের লিখছি এইজন্যে, যে, পূজনীয় গুরুদেবকে বলতে শুনেছিলাম: 'যে-কোনো-জাতীয় সম্পদকে আয়ত্ত করতে গেলে তার বিশেষ-জাতীয় আধারটিকেও আয়ত্ত করতে হয়'—তানৈলে পণ্ডশ্রম। কিন্তু আধারটিকে যদি এক-আধ দিনের মধ্যে আয়ত্ত করে নেবার সুযোগসুবিধা না-পাওয়া যায়, তাহলে কি হাল ছেড়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে সমুচিত?—মোটেই না। এর পিছনে সহিষ্ণুতাবও প্রয়োজন আছে—সেই সহিষ্ণুতা-অর্জনও মানব জীবনের এক পরীক্ষা বটে।

গীত-সাধকদের সম্পদ

যেহেতু পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবাব পথ কারুরই রুদ্ধ নয়, সুতরাং আমরা তো একে অসাধ্যও বলতে পারিনে কখনও। আবার অন্যদিকে দেখুন, যাঁরা আপন-আপন সাধনায় উন্নত হতে চান তাঁদের প্রত্যেকেরই পক্ষে নিষ্ঠা, শ্রম এবং অধ্যবসায় অতি অবশ্যবরণীয়,—এই তিনের সমন্বয়ে আসে কঠোর অনুশীলন। বিশেষত শিল্পব্রতীদের জীবন যুগে-যুগে যে ঐ অন্তহীন অনুশীলনের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত—এই বাস্তবানুভূতি অন্তরে জাগিয়ে রাখলে—আদর্শচ্যুতিরও আশঙ্কা থাকে না কারুর। তা-ছাড়া দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় আমরা যখন প্রত্যক্ষ করে জেনেছি, যে, যাবতীয় অনুশীলনের সার্থক রূপায়ণ ঘটাতে পারেন যথার্থ সঙ্গীতসাধকেরাই তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ কঠোরমনঃসংযম ও স্থৈর্যের মাধ্যমে,—তখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষার্থী এবং সাধকসম্প্রদায়ই বা তা থেকে দূরে সরে থাকবেন কোন যুক্তিতে!

মোটের উপর সর্বশেষে স্পষ্ট কথাটা হল: ঈদৃশ সব প্রাসঙ্গিক আলোচনায়

সুচারু ও সুষ্ঠু অংশগ্রহণের বিশেষ উদ্দেশে,—শুধু শুধু গতানুগতিকভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণী এবং সুরটুকু কণ্ঠে নির্ভুল আবৃত্তি করবার কাজে নয়,—এর যথোচিত তত্ত্বানুসন্ধান এবং বিশ্লেষণের কাজেও,—রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পীদের সর্বতোভাবে আগ্রহী ও বিদগ্ধ হওয়া চাই, অর্থাৎ রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সার্থক রূপ দেবার জন্যে যে বিরাট প্রস্তুতির প্রয়োজন—সেই অনুভবটুকু সংশ্লিষ্ট বিদ্যার্থীরা তাঁদের ভক্তিনত জীবনের পরতে পরতে, এই সঙ্গীত সম্বন্ধেই ব্যাপক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লাভ করে চলবেন—এমনতর সঙ্গত প্রত্যাশা নিয়েই আপাতক বর্তমান নিবন্ধের সমাপ্তি সাধন করলাম।

বিষ্ণু চক্রবর্তী

রাণাঘাট অঞ্চলের 'আন্দুলে-কায়েৎপাড়া' নামক গ্রামে ১৮০৪ (মতান্তরে ১৮১১) খৃষ্টাব্দে বিষ্ণু চক্রবর্তীর জন্ম হয়। বিষ্ণু এবং তাঁর অগ্রজ কৃষ্ণ উভয়েই ছিলেন সে-যুগের বাংলার বিশিষ্ট সঙ্গীতকার।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়-কর্তৃক যখন 'ব্রহ্মসভা'র সূত্রপাত হয়েছিল তখন উক্ত দুই ভ্রাতা রাজার সংস্পর্শে আসেন এবং রাজার সমাজে 'গায়ক' পদে অভিষিক্ত হন। রামমোহন-জীবনচরিতের পঞ্চদশ (কোন এক সংস্করণে ষোড়শ) অধ্যায়ে তাঁর 'হৃদয় ও ধর্মভাব' শীর্ষক অনুচ্ছেদে লেখা আছে: "সমাজে বিষ্ণু যখন গান করিতেন, রাজা রামমোহনের গণ্ডদেশ ধৌত করিয়া অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত।"

এই বিষ্ণুই পরবর্তীকালে 'আদিসমাজের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক' নামে খ্যাতি লাভ করেন।

এটা হল আজ চলিত এই ১৯৮১ সাল থেকে, অঙ্কের হিসাবে প্রায় ১৫৩ বৎসর আগেকার কথা। তখনকার দিনে এতদ্দেশীয় গায়কেরা উচ্চাঙ্গসঙ্গীতাদির চর্চা বহুল পরিমাণে করতেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গীত যে সুরুচিসম্মত রীতিতে ঈশ্বর-উপাসনার কাজেও সার্বজনীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে—সে-বোধটা তাঁদের মধ্যে হয়ত কোনো-না-কোনো কারণে নিষ্প্রভ ছিল। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, রাজা রামমোহনই হলেন 'সঙ্গীতে-উপাসনা'র রীতির আসল প্রবর্তক এবং উপাসনায় পরিবেশিত গানই জনসাধারণের মধ্যে আজ ব্রহ্মসঙ্গীত বলে অভিহিত। 'ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রবর্তন যে বাংলা-সঙ্গীতের এক নবযুগ'—এ-বিষয়টা বর্তমান আলোচনা-সূত্রে গীতার্থীদের শ্রদ্ধার সঙ্গে জেনে নিয়ে বুঝে রাখা ভাল, আরো বিশেষত এইজন্যে যে, 'ঐ ব্রহ্মসঙ্গীতেরই চরম উৎকর্ষ হল রবীন্দ্রনাথের ভক্তিসঙ্গীতে'—(দ্রঃ বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ৪)। উপাসনার উপযোগী গভীর তত্ত্বকথা সংবলিত সংস্কৃত ঘেঁষা একাধিক বাংলাগান রামমোহন নিজে যা রচনা করেছিলেন—সেগুলি 'হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের অনুরূপ পদ্ধতিতে' তাঁর সমাজে গাওয়া হত। গাইতেন বিষ্ণু চক্রবর্তী। এই

প্রসঙ্গে, ১৮৯৬ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বয়স যখন প্রায় ৭৯ কি ৮০, তখন তিনি বলেছেন তাঁর স্মৃতিচারণে : "ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইলে পর, আমি মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া তথায় যাইতাম। তখনও বিষ্ণু গান করিতেন। বিষ্ণুর এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার নাম কৃষ্ণ। রামমোহন রায়ের সমাজে বিষ্ণুর সহিত কৃষ্ণ একত্রে গান করিতেন। গোলাম আববাস নামক একজন মুসলমান পাখোয়াজ বাজাইতেন। 'বিগতবিশেষং' সঙ্গীতটি রাজার অতিপ্রিয় ছিল। বিষ্ণু ঐ সঙ্গীতটি মধুরস্বরে গান করিতেন। ঐ প্রিয় পুরাতন সুর এখনও আমার কানে বাজিতেছে। তখন ব্রাহ্মসমাজে বেঞ্চ ও কেদারা ছিল না। কার্পেটের উপর সাদা চাদর বিস্তৃত থাকিত, তাহাতেই সকল লোক গিয়া বসিতেন। রাজা একটি ছোট মোড়ার উপরে বসিতেন"—(মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত-পরিশিষ্ট, পৃ ৩১০)।

উক্ত 'বিগতবিশেষং' এ-গানটি রাজা রামমোহনেরই রচনা। এ-সকল প্রাচীন চিত্তাকর্ষক তথ্য, অধুনা বাংলার সঙ্গীত-ইতিহাস-বেত্তাদের অজানা থাকবার কথা নয়। তথাপি উপরোক্ত উদ্ধৃতি এখানে সংকলিত হল—এইটুকু বুঝাতে যে, রাজা রামমোহন-প্রবর্তিত 'সঙ্গীতে-উপাসনা'র ধারাটাই,—বিষ্ণু চক্রবর্তী পরম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন তাঁর জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত।

বিষ্ণু ছিলেন সঙ্গীতে জাতশিল্পী। অর্থ উপার্জনের বিস্তর সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সঙ্গীতকে তিনি অর্থকরী বিদ্যা হিসাবে গ্রহণ করেননি। সাংসারিক নানা অভাব-অনটনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও, শোনা যায়, তাঁর সঙ্গীত-সাধনা ব্যাহত হ'ত না কখনো। এরই প্রেক্ষিতে তাঁকে অন্যতম ত্যাগব্রতী বলা চলে—বিশেষত, নিজেকে যখন সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মসমাজের সেবাতেই উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। "বিষ্ণুর চরিত্র অতি নির্মল ছিল। তিনি কেবল বেতনের জন্য ব্রাহ্মসমাজে গান করিতেন না ; ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে মাসে মাসে ৮০ টাকা সাহায্য করিতেন, তাহা হইতে বিষ্ণুকে ৪০ টাকা দেওয়া হইত। পরে নানা কারণে সেই বেতন কমিয়া গিয়া ১০ টাকায় পরিণত হইয়াছিল। বেতনের এতটা হ্রাস হওয়াতেও বিষ্ণু সমাজের কাজ পরিত্যাগ করেন নাই"—(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী গ্রন্থের পরিশিষ্ট-পৃ ২৯৪)। এছাড়া—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ির গায়ক এবং তাঁর পুত্রকন্যাদের গান শেখাবার জন্যে যখন বিষ্ণু চক্রবর্তী গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন, তখন সম্ভবত একমাত্র জোড়াসাঁকোর 'দেবেন্দ্র-ভবন' ছাড়া অন্য কোথাও যাবার তাঁর প্রয়োজন পড়ত না,—এতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন, আর সে কারণেই সেকালে বিষ্ণুর মত এত বড় এক গুণী গীতশিল্পীর কোনো বৃহৎ শিষ্যসম্প্রদায় গড়ে ওঠারও সাবকাশ মেলেনি। বিষ্ণু স্বল্পতে তুষ্ট থাকতেন বলে তাঁকে 'আশুতোষ' আখ্যা দিয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ,—তা জানা যায় মহর্ষিরই লিখিত কোনো এক পত্রাংশ থেকে। সেই পত্রাংশের নকল এইখানেই একটু পরে আমরা দেখতে পাব।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েরা প্রায় সবাই ছিলেন বিষ্ণুর শিষ্য; বিশেষকরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতজীবনের প্রথমগুরু যে বিষ্ণু চক্রবর্তী এ-বার্তা ত আজ সর্বত্র সর্বজন আলোচিত অন্যতম মূল্যবান তথ্য।

রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'বাল্যকথা'য় লিখেছেন: "আমাদের বাড়িতে দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী—এই দুই পূজা হত। দুর্গোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হত।... বিজয়ার দিন প্রত্যূষে আমাদের গৃহশিক্ষক বিষ্ণু আগমনী ও বিদায়ের গান করতে আসতেন। যাত্রার গান যেমন প্রাকৃত, বিষ্ণুর তেমনি classical—সে যে কি চমৎকার ঠেকত, শুনে শ্রোতৃমণ্ডলী মোহিত হয়ে যেত"। প্রাসঙ্গিক আরো কিছু গুণকথন মেলে সত্যেন্দ্রনাথের অনুজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতি-চারণে: "মহাত্মা রামমোহন রায়ের আমল হইতেই কৃষ্ণ ও বিষ্ণু দুই ভাই সমাজের একমাত্র গায়ক ছিলেন। কৃষ্ণকে আমরা কখনো দেখি নাই। আমাদের সময়ে বিষ্ণুই গান করিতেন। অন্যান্য ওস্তাদদের গানের চেয়ে বিষ্ণুর গানই সকলে বেশি পছন্দ করিত। বিষ্ণুর গানের একটা বিশেষত্ব ছিল। ওস্তাদেরা যেমন রাগিণীতে তান অলংকারেরই প্রাধান্য দেন, বিষ্ণু তেমন কিছু করিতেন না। তিনি অল্প-সল্প তান দিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে রাগিণীর মূল রূপটি বেশ ফুটিয়া উঠিত, গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত না। ইহা ছাড়া, গানের কথার যে একটা মূল্য আছে, সেটিও বিষ্ণুর গানে পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইত। সকলেই গানের সুর এবং গৎ দুই-ই সহজে বুঝিতে পারিত। বিষ্ণু ধ্রুপদ খেয়ালই বেশি গাইতেন। বিষ্ণুর এই হিন্দীগান ভাঙ্গিয়াই সত্যেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন।" মহর্ষির দৌহিত্রী সরলা দেবীর বাল্যস্মৃতির পৃষ্ঠা থেকেও সেদিনকার প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক চিত্র একটি এখানে তুলে দিচ্ছি: "সকাল বেলায় ৭টার সময় [জোড়াসাঁকোর বাড়িতে] ঘণ্টা বাজে দালানে উপাসনায় যাওয়ার জন্য। বউঝিয়েরা বিবাহের সময় অর্জিত স্ব-স্ব চেলি পরে সেখানে যান। নাত্নীরা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দাদামশায়ের কাছ থেকে একখানি করে যে চেলি উপহার পায়, তাই পরে তাদের দালানে যেতে হয়। সেই হল নাত্নীদের দীক্ষার চিহ্ন।...নাতিরা উপনয়ন না হলে দালানে বসার অধিকারী হয় না। অনধিকারে তারাও সেখানে গিয়ে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনতে পারে, ও শোনে। বিষ্ণু হলেন তখনকার গায়ক।"

উপরের কয়টি উদ্ধৃতি পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের পিতা থেকে শুরু করে রবীন্দ্রাগ্রজেরা এবং বাড়ির ছোট-বড় আরো অনেকেই বিষ্ণুর সঙ্গীতপরিবেশনরীতি বিশেষ-ভাবেই পছন্দ করতেন,—করতেন রবীন্দ্রনাথও। তদুপরি বিষ্ণুর সঙ্গীতশিক্ষাদান পদ্ধতিটিও ছিল স-রস বৈশিষ্ট্যময়। নিজে ধ্রুপদী-গায়ক হওয়া সত্ত্বেও কালোয়াতসুলভ কোনো অহমিকা বা গোঁড়ামি তাঁর ছিল না। ওস্তাদেরা সাধারণত যে-নিয়মে প্রথমে

সার্গমের সঙ্গে কণ্ঠসাধনার নির্দেশ দিয়ে পরে হাল্‌কা হিন্দীগান চাপিয়ে দেন শিষ্যদের স্কন্ধে,—বিষ্ণু কিন্তু তা করতেন না। অত্যন্ত সহজ বাংলা পাড়াগেঁয়ে ছড়ার উপর সুর বসিয়ে রসাল ভঙ্গিমায় গান শেখাবার রীতি ছিল তাঁর। এই বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের লেখাতে পাওয়া যায়। শিশুকালে তাঁরও গান-শিক্ষা ঐভাবেই শুরু হয়েছিল বিষ্ণুর কাছে—এই সম্পর্কীয় কিঞ্চিৎ টীকা বক্ষ্যমাণ পরিচ্ছেদের শেষাংশে দ্রষ্টব্য। মোটকথা বিষ্ণুর গায়ন ও শিক্ষাদান পদ্ধতি নিঃসন্দেহে মনোরম ছিল,—সর্বোপরি তিনি ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। সেই কণ্ঠস্বর শুনে মুগ্ধ হতেন সবাই। বিষ্ণুর কণ্ঠস্বর-প্রসঙ্গে তৎকালীন 'তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা' (ফাল্গুন ১৮০৪ শক) লিখেছিলেন :

"মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় হইতে শ্রীযুক্ত বিষ্ণু চক্রবর্তী আদিব্রাহ্মসমাজে অতি নিপুণতার সহিত সঙ্গীত করিয়া আসিয়াছেন। তিনি এক্ষণে বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন অবসর গ্রহণ করিতেছেন। অতঃপর সমাজের শ্রোতারা কেহ এইরূপ মধুরকণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত আর শুনিতে পাইবেন কিনা সন্দেহ। যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উপাসনায় যোগ দিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় এমন কেহই নাই বিষ্ণুর মধুরসঙ্গীতে যাঁহার অশ্রুপাত না হইয়াছে।"

আদিসমাজের কাজে বিষ্ণু যখন অবসর নিলেন সম্ভবত তারপরেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ চুঁচুড়া থেকে ৯ আষাঢ় [১৮৮৫] তারিখের কোন এক পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন : "বিষ্ণুর পেন্‌সন যেমন সমাজে পড়িয়া আসিতেছে, সেই প্রকার পড়িতে থাকিবে। আশুতোষের হৃদয়ে মঙ্গলময়ের আভা পড়িয়াছে—তিনিই তাহাকে এই সংসারের বিষম সংকট হইতে উদ্ধার করিবেন। আমাদের তাহাকে সাহায্য করিবার কিছুই ক্ষমতা দেখিতেছি না"—(বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' পৃ ২০০)।

বিষ্ণু চক্রবর্তীর মৃত্যু হয় ১৯০০ সালের ৫ই মে। এই সংবাদটিও 'তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা' (জ্যৈষ্ঠ ১৮২২ শক) যথাকালে প্রকাশ করে মন্তব্য করেন : "ইঁহার বয়ঃক্রম ৯৬ বৎসর হইয়াছিল।...ইঁহার ন্যায় সুকণ্ঠে তাল মান রাগ রাগিণী রক্ষা কবিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতে আর কেহই রহিলেন না। ঈশ্বর ইঁহাব অমর আত্মার কল্যাণসাধন করুন।"

উক্ত সংবাদ প্রচারিত হবার প্রায় ১৫ বৎসব কাল বাদে ১৮৩৭ শকে প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা মারফৎ আবার জানা যায় : "বিষ্ণু ১৮১৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন।...১১ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া ৭৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, ৬৭ বৎসরকাল একাদিক্রমে তাহার গায়কের কাজ করেন। শুনিলে অবাক হইতে হয় যে, এই সুদীর্ঘকার্য্যকালের মধ্যে তিনি একটি দিনের জন্যও সমাজে অনুপস্থিত হন নাই। প্রায় ৮২ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন"—(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী-পরিশিষ্ট, পৃ ২৯৪)।

প্রসঙ্গত :—১৮৩৬ শকের মাঘ-এ প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা মারফৎ আমরা জানতে পারি,—রবীন্দ্ররচিত বহু ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপিকার এবং আদিব্রাহ্মসমাজের

অন্যতম সুগায়ক কাঙ্গালীচরণ সেনেরও গুরু ছিলেন ৺বিষ্ণু চক্রবর্তী। যদিচ সঙ্গীতে অন্যত্রও অন্য গুরুর কাছে শিক্ষা পেয়েছিলেন তিনি,—তবু বিশেষত ব্রহ্মসঙ্গীতে শিক্ষালাভ হয়েছিল তাঁর কলকাতায় এসে" আদিব্রাহ্মসমাজে অবস্থান কালীন উক্ত বিষ্ণু চক্রবর্তীরই কাছে। অপিচ, বিষ্ণুর অধীনে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অগ্রজেরা যে কবে থেকে কতদিন পর্যন্ত গান শিখেছিলেন এর কোনো সুস্পষ্ট তথ্য আমাদের সামনে আপাতত নেই। শুধু এইটুকুই কবিগুরু আমাদের জানিয়েছেন, যে, যতদিন তাঁর সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের শিক্ষা দেবার কর্তা, ততদিন তিনি নিজে বিষ্ণুর কাছে ব্রহ্মসঙ্গীত আউড়েছেন এবং বড়ো হয়ে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করেছেন, একেবারে ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মনে যে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা-আপনি জমে উঠেছিল—তা অনেকটা তাঁদেব বাড়ির সঙ্গীতাচার্য বিষ্ণুরই প্রভাবে। এই প্রাসঙ্গিক কথাটা এখানে টানলাম এই জন্যে যে, সঙ্গীতগুরু বিষ্ণুর গান গাইবার, এবং শেখাবার গোঁড়ামিহীন সরস অনুভবটুকু গুরুপরম্পরা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে আপন সঙ্গীতরচনার ক্ষেত্রে যেমন আমৃত্যু পেরেছিলেন আরোপ করতে—তেমনি সঙ্গীতবিদ্যাটিকে সকলের মধ্যে সহজ সরস ও সর্বজনীন করে তোলবার অনুপ্রেরণাটিও হয়ত পেয়েছিলেন সেই সূত্রেতেই। অবশ্য এর পশ্চাতে মূল প্রেরণাদাতা তদীয় অগ্রজ সংস্কারমুক্ত সঙ্গীতবিদ্ জ্যোতিরিন্দ্রনাথেব নামটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে;—যিনি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: 'সকল পুরণো কায়দার ভিড়ের মধ্যে এসেছিলেন নির্জলা নূতন মন নিয়ে'। কিন্তু জ্যোতিবিন্দ্রনাথেরও যে পথিকৃৎ ছিলেন তাঁদেরই সঙ্গীতগুরু বিষ্ণু চক্রবর্তী—এটাও কি এই অবকাশে অনুমান করা চলে না,—গবেষণাপ্রিয়জনেরা তা আবশ্যকবোধে ভেবে দেখতে পাবেন

যদুভট্ট

যদুভট্টের পুরো নাম যদুনাথ ভট্টাচার্য; জন্ম বিষ্ণুপুরে ঊনবিংশ শতাব্দীব প্রথমভাগের শেষাংশে—আনুমানিক ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে। পিতা মধুসূদন ভট্টাচার্যের কাছে তিনি প্রথমে বীণা (মতান্তরে সেতার) ও মৃদঙ্গ বাজনা শেখেন। কণ্ঠস্বরের উপর তাঁর স্বভাবজাত প্রচুর আধিপত্য ছিল। যৌবনে তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষা শুরু হয় বিষ্ণুপুর-রাজদরবারেব খ্যাতনামা সঙ্গীতবিদ্ রামশংকর ভট্টাচার্যের কাছে। অতঃপর ধ্রুপদ গানের পাঠ নেন গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট।. বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে সম্ভবত যদুভট্টই সর্বপ্রথম তাঁদের ঘরানার গণ্ডীর বাইরে এসে ভারতবর্ষের অন্যান্য ঘরানার সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেন। সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন ওস্তাদের কাছ থেকে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন তিনি। তাঁর প্রতিভাজ্ঞানও ছিল অসাধারণ। প্রকাশ, মাত্র বাইশ বৎসর বয়সেই সারা ভারত

ভ্রমণান্তে সঙ্গীতবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছিলেন যদুভট্ট। বাংলার বাইরে রামপুর এবং গোয়ালিওর রাজ্য অবধি তাঁর সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

যদুভট্ট সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য খুব বেশি পাওয়া না গেলেও একথা সর্বজনবিদিত, যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে যদুভট্টকে নিজ বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন অল্প। ১৩৩৫ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিণত বয়সে 'বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতশিক্ষা' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন :

"বালক কালে যদুভট্টকে জানতাম। তিনি ওস্তাদজাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড়ো। তাঁকে গাইয়ে ব'লে বর্ণনা করলে খাটো করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা, অর্থাৎ সঙ্গীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত। তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্য কোনো হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না। সম্ভবত তাঁর চেয়ে বড়ো ওস্তাদ তখন হিন্দুস্থানে অনেক ছিল, অর্থাৎ তাঁদের গানের সংগ্রহ আরো বেশি ছিল, তাঁদের কসরতও ছিল বহুসাধনাসাধ্য, কিন্তু যদুভট্টর মতো সঙ্গীত-ভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছে কিনা সন্দেহ।...যাই হোক, ওস্তাদ ছাঁচে ঢেলে তৈরি হতে পারে, —যদুভট্ট বিধাতার স্বহস্ত-রচিত।"

এছাড়া আরো নানা জায়গায় নানা উপলক্ষে যদুভট্টের সুখ্যাতি বর্ণনা ক'রে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁরই স্মৃতিকথা থেকে আমরা আরো জানি, যে, বালক রবীন্দ্রনাথের মধুর গীতকণ্ঠ ওস্তাদ যদুভট্ট খুব পছন্দ করতেন, তাই স্বীয় সংস্কারবদ্ধ পদ্ধতিতে নিয়মমাফিক গান শিখিয়ে রবীন্দ্রনাথকেও চেয়েছিলেন তিনি ওস্তাদ তৈরি করতে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে সে-ভাবে ধরা দেননি। তবু যদুভট্টের গান যেমন তাঁকে, তেম্নি তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেও এবং অন্যান্য অগ্রজদের অসম্ভব প্রেরণা জুগিয়েছে—বিশেষত সঙ্গীত-রচনার কাজে। প্রাসঙ্গিকবোধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা থেকে একটি উক্তি এখানে উদ্ধারযোগ্য : "যদুভট্টও হিন্দীগান রচনা করিতেন। তাঁহার গানে স্বর-বিন্যাসে যথেষ্ট নিপুণতা এবং একটা মৌলিকতা ছিল। ইহা ব্যতীত তিনি পাখোয়াজের অনেক নূতন নূতন উৎকৃষ্ট বোলও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আমি দেখিয়াছি, কলিকাতায় তখনকার কোন কোন প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী তাঁহার নিকট বোল আদায় করিবার জন্য, সত্য-সত্যই তাঁহার চরণে তৈল মর্দন করিত।" যদুভট্টের সময়কার সাধারণ গীতার্থীরাও যে কীভাবে সঙ্গীতচর্চার সুযোগ নিতেন তার ঐতিহাসিক চিত্র কিছুটা ধরা আছে রবীন্দ্রনাথের লেখাতে : "যে-সব ধনীদের ঘরে বৃত্তিভোগী গায়ক ছিল, তাদের কাছে শিক্ষা পেত কেবল ঘরের লোক নয়,—বাইরের লোকও। বস্তুত এই সকল জায়গা ছিল উচ্চসঙ্গীত শিক্ষার ছোট ছোট কলেজ। বিখ্যাত বাঙালী সঙ্গীত-নায়ক যদুভট্ট তখন আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকতেন, নানাবিধ লোক আসত তাঁর কাছে শিখতে; কেউ শিখত মৃদঙ্গের বোল, কেউ শিখত রাগ-রাগিণীর আলাপ। এই কলরবমুখর জনসমাগমে

কোথাও কোন নিষেধ ছিল না। বিস্তাকে রক্ষা করবার ও ছড়িয়ে দেবার এই ছিল সহজ উপায়”—(রবীন্দ্র রচনাবলী-১৪শ খণ্ড, পৃ ৯১১)।

যদুভট্ট যেমন উত্তম গায়ক ছিলেন তেমনি ছিলেন একজন গীত-রচয়িতা এবং মার্জিত সুরকার। অতি উঁচুস্তরের হিন্দীগান রচনা করেছেন তিনি, এসবের অনেকগুলি প্রকাশ করেছেন সঙ্গীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রজ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রসিদ্ধ ‘সঙ্গীত-মঞ্জরী’ গ্রন্থে। এছাড়া যদুভট্টর কিছু ধ্রুপদাঙ্গের বাংলা গান ব্রহ্মসঙ্গীত-তালিকাভুক্তাবস্থায় পাওয়া যায়,—যথা: ‘বিপদ-ভয়-বারণ,’ ‘দেখিয়ে হৃদয়-মন্দিরে’ প্রভৃতি। ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যবাহাদুব ছিলেন যদুভট্টের পবম গুণগ্রাহী, তাঁকে তিনি ‘তানরাজ’ উপাধি দিয়ে সম্মানিত কবেন। এবও আগে পঞ্চকোটের রাজাব কাছ থেকে যদুভট্ট ‘রঙ্গনাথ’ উপাধি লাভ কবেছিলেন। ‘বঙ্গনাথ’ নামটি তাঁব বচিত হিন্দীগানের অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে।

কলিকাতা জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়িতে এবং ত্রিপুরা রাজ্যেই যদুভট্টের বসবাস ছিল বেশি। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমাংশে, প্রকাশ কয়েক মাস বোগশয্যায় থেকে মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে এই অসাধারণ প্রতিভাবানেব মৃত্যু হয়।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সকল গানেব ভাণ্ডারী—এই নামেতেই দিনেন্দ্রনাথ সুবিদিত। কেননা, রবীন্দ্রনাথ সাবা জীবনে গান লিখেছেন অজস্র এবং সেগুলিতে সুবও দিয়েছেন নিজে। কিন্তু অনবরত গানে নূতন-নূতন সুর দেবার পর সেই সুরগুলি সারাক্ষণ হুবহু মনে ধরে রাখা তাঁর পক্ষে তো সম্ভব ছিল না; তাই তাঁর সঙ্গীতজ্ঞ নাতি দিনেন্দ্রনাথকে সব সময়েই তিনি কাছে কাছে রাখতেন অথবা বলা যায়, দিনেন্দ্রনাথই থাকতেন কবিগুরুর সাথে ছায়ার মত এবং কবির সৃষ্ট যাবতীয় সুর সঙ্গে সঙ্গে লিখিতভাবে ধবে রাখতেন বলে সেগুলি একমাত্র দিনেন্দ্রনাথেরই জিম্মায় সর্বদা অবিস্মৃত অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যেত।

নূতন যে-কোনো গানের সুর শোনামাত্র তা নির্ভুলভাবে কণ্ঠে আয়ত্ত করার ক্ষমতা দিনেন্দ্রনাথের বাল্যাবধিই প্রবল ছিল। বিশেষতঃ সুর লিপিবদ্ধ করার কাজে তিনি ছিলেন সুনিপুণ। বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে, এমনকি কোনো প্রকারের গুনগুনমাত্র না করেই—যেন শ্রুতলিপি অনুধাবনের মত অবলীলায় তিনি দ্রুত স্বরলিপি করতে পারতেন। রবীন্দ্র-নাথের অধিকাংশ গানের স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথেরই করা। কবি, নিজের গানের সুর কখন-

যখন ভুলে গেলে পর তা আবার শিখে নিতেন দিনেন্দ্রনাথের কাছ থেকেই ;—দিনেন্দ্রনাথ এত বিশ্বস্ত ছিলেন কবিগুরুর,—তাঁর সুর-সংরক্ষণের ব্যাপারে।*

দিনেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১২৮৯ সালের ২রা পৌষ (ইং ১৮৮২ সালে)। তিনি রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র ছিলেন। তাঁর পিতার নাম দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতার নাম সুশীলা দেবী। গানে সুশীলা দেবীর খুব সুখ্যাতি ছিল। মাতৃগুণের অধিকারী হয়ে দিনেন্দ্রনাথ তিন-চার বছর বয়সেই নির্ভুল সুরে গান গেয়ে সবাইকে বিস্মিত করতেন। খুব ভাল করে পিয়ানো বাজনা শিখেছিলেন ছোটবেলায় যখন লরেটো কনভেণ্টে পড়তেন তখনই। তারপর যথানিয়মে সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। বিলেতেও গিয়েছিলেন ব্যারিষ্টারি পড়তে। কিন্তু সে-দেশের সঙ্গীতে এত বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন যে, ব্যারিষ্টারি পড়া আর তাঁর ভাল লাগল না। তা ছেড়ে দিয়ে শুরু করলেন নিয়মিত য়ুরোপীয় সঙ্গীত-চর্চা। অতঃপর দেশে ফিরে এসে একান্ত সংগোপনে সঙ্গীত নিয়েই চলছিল তাঁর নিভৃত সাধনা। সেদিনের প্রখ্যাত সঙ্গীতবিদ রাধিকা গোস্বামী এবং শ্যামসুন্দর মিশ্রের প্রিয় ছাত্র ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ। বিলেতীগানের ষ্টাফ্-নোটেশানেও তাঁর দক্ষতা ছিল। মোটের উপর দেশী-বিদেশী উভয় সঙ্গীতে যথেষ্ট পারদর্শী হয়েও তিনি ছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধক তথা পূজারী এবং প্রচারক। সঙ্গীত রচনায় কবিগুরুর যে বিমূর্ত প্রতিভা,—তাকে সর্বসাধারণের গোচরে এনেছেন এই দিনেন্দ্রনাথই। আজ বাংলার ঘরে ঘরে এবং তার বাইরে সারা ভারতে এমন কি সাগর পারের বিদেশেও যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এত প্রচার—এ সবের গৌরব দিনেন্দ্রনাথেরই—আর কারো নয়—একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়ে গেছেন দিনেন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব উপলক্ষে :

"রবির সম্পদ হোতো নিরর্থক, তুমি যদি তারে
না লইতে আপনার করি, যদি না দিতে সবারে।"

দিনেন্দ্রনাথের গান শেখাবার পদ্ধতি ছিল অনাড়ম্বর ও সাবলীল। শিষ্য মনোনয়নের ব্যাপারে কোনো গোঁড়ামি ছিল না তাঁর—তাইজন্যে গীতপিপাসু-শিক্ষার্থীদের ভিড়ও হত প্রচুর। কর্মস্থলে, প্রবাসে, ভ্রমণে যখন যেখানে যে-অবস্থায় থাকতেন—সেখানেই গড়ে উঠত তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিদ্যালয়। গীতার্থীদের মাঝখানে বসে সাধারণত খালি গলায়ই গান শেখাতেন তিনি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের যাবতীয় কারুশিল্প নিজের কণ্ঠেতেই প্রকাশ করতেন বলে—শিক্ষার্থীরাও চলিত প্রথানুযায়ী বাদ্যযন্ত্রসঙ্গৎ-প্রসূত বিকল্পধ্বনির দ্বারা কখনো বিভ্রান্ত না-হয়ে, তাঁর কণ্ঠস্বরের পরিচয় সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেতেন অক্লেশে। আসলকথা, কোনো যন্ত্র-সঙ্গতের মুখাপেক্ষী ছিলেন না দিনেন্দ্রনাথ—অন্ততঃ গান শেখাবার কালে।

* এ সম্পর্কীয় আরো বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য রবীন্দ্রগীতিপ্রবাহ-১ম ভাগ এবং ১৩৭৬ সালের ২৪ পৌষ, শুক্রবারের যুগান্তরে প্রকাশিত "রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিতর্কিত সুর" শীর্ষক লেখা দ্রষ্টব্য।

দিনেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করলেই বড় রকমের সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা এমন কি সাহিত্যিক কবিও হতে পারতেন একজন—অর্থাৎ নিজের নামেই প্রকাশিত হতে পারতেন ; কিন্তু আত্ম-প্রতিষ্ঠালাভে উদাসীন এবং আত্মপ্রচারে তিনি সম্পূর্ণ বিমুখ ছিলেন। নির্জনে সঙ্গীত-চর্চা আর শুধু রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি-লিখনের অন্তরালেই লুকিয়ে রাখলেন তাঁর বিরাট প্রতিভাকে সারাজীবন। এই বিষয়ের উপর সুস্পষ্ট আলোকপাত করে অনেক বৎসরকাল আগে দিনেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্র শ্রীসুধীরচন্দ্র কর লিখেছিলেন : "দিনেন্দ্রনাথ একাধারে বিজ্ঞসঙ্গীতজ্ঞ, মরমীকবি, সু-রসজ্ঞ সমালোচক ও দক্ষ অভিনেতা ; —তার উপরও অদ্ভুত রকমের দিল-দরিয়া সামাজিক। কিন্তু আত্ম-সংকোচশীল শম্বুকবৃত্তিই তাঁর সব সম্ভাবনাকে বহির্জগতের লোকচক্ষুর নিকট নিষ্প্রভ করে দিল—এইটেই আমাদের একমাত্র ও একান্ত দুঃখের বিষয়"—(সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা, ১৩৩৭ বৈশাখ)।

সঙ্গীতজ্ঞ দিনেন্দ্রনাথের অভিনয়-নৈপুণ্য প্রসঙ্গে তাঁর পিতৃষ্বসা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী বিশেষ ভাবে বলেছেন 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় : "সকলেই জানেন,—রবিকাকা, গগণদা আর দিনু—ঠাকুরবাড়ীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন"। আবার ঐ গ্রন্থেরই ৪১ পৃষ্ঠায় লিখছেন : "হয় রবিকাকা কিংবা দিনু পরিচালনা না করলে কোনো নাটক করাই আমাদের সার্থক হত না।" বস্তুত দিনেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার সম্যক বর্ণনা কোনো সীমিত ক্ষেত্রে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবলমাত্র এইটুকু আপাততঃ বলা যায়,—সঙ্গীতসাধক দিনেন্দ্রনাথ দীর্ঘায়ু হলেন না, এ আমাদের দুর্ভাগ্য। ১৯৩৫ সালে (১৩৪২ বাং ৫ই শ্রাবণ) মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে সহসা সন্ন্যাসরোগে দেহত্যাগ করলেন তিনি। কবিগুরু হারালেন তাঁর নিত্যসহচরকে—সে-ক্ষতি আমাদেরও নিত্যকালের।

দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু ও ছাত্রদের অনুরোধে এবং পূজনীয়া ইন্দিরা দেবীর সাহায্যে ১৩৪৩ সালে 'দিনেন্দ্র-রচনাবলী' প্রকাশ করেন তাঁর সহধর্মিনী শ্রদ্ধেয়া কমলা দেবী ঠাকুরাণী। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠে আমার গান শুনেছি, কিন্তু কোনোদিন তার নিজের গান শুনিনি। কখনো-কখনো কোন কবিতায় তাকে সুর বসাতে অনুরোধ করেছি, কথাটাকে একেবারে অসাধ্য ব'লে সে উড়িয়ে দিয়েছে। গান নিয়ে যারা তার সঙ্গে ব্যবহার করেছে,—তারা জানে সুরের জ্ঞান তার ছিল অসামান্য। আমার বিশ্বাস, গান সৃষ্টি করা এবং সেটা প্রচার করার সম্বন্ধে তার কুণ্ঠার কারণই ছিল তাই। পাছে তার যোগ্যতা তার আদর্শ পর্যন্ত না পৌছয়, বোধকরি এই ছিল তার আশঙ্কা। কবিতা সম্বন্ধেও সেই একই কথা ; কাব্যরসে তার মত দরদী অল্পই দেখা গেছে।...কবিতা সে যে নিজে লেখে, একথা প্রায় গোপন ছিল বললেই হয়।...আমার মনে হয়,... পাঠকসাধারণের স্বীকৃতির দিকে সে লক্ষ্যই করেনি। চিরজীবন অন্তকেই সে প্রকাশ

করেছে, নিজেকে করেনি। তার চেষ্টা না থাকলে আমার গানের অধিকাংশই বিলুপ্ত হোত। কেননা, নিজের রচনা সম্বন্ধে আমার বিস্মরণ-শক্তি অসাধারণ। আমার সুরগুলিকে রক্ষা করা এবং যোগ্য এমনকি অযোগ্য পাত্রকেও সমর্পণ করা তার যেন একাগ্র সাধনার বিষয় ছিল। তাতে তার কোনোদিন ক্লান্তি বা ধৈর্য্যচ্যুতি হতে দেখিনি। আমার সৃষ্টিকে নিয়েই সে আপনার সৃষ্টির আনন্দকে সম্পূর্ণ করেছিল। আজ স্পষ্টই অনুভব করছি, তার স্বকীয় রচনাচর্চার বাধা-ই ছিলেম আমি। কিন্তু তাতে তার আনন্দ যে ক্ষুণ্ণ হয়নি, সে-কথা তার অক্লান্ত অধ্যবসায় থেকেই বোঝা যায়। আজ এতেই আমি সুখ বোধ করি যে, তার জীবনের একটি প্রধান পরিতুষ্টির উপকরণ আমিই তাকে জোগাতে পেরেছিলুম।"

দিনেন্দ্রনাথের পরলোকগমনের সংবাদ পেয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-মন্দিরে যে ভাষণ দেন তারও কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

"প্রথম যখন এখানে [শান্তিনিকেতনে] এসেছিলাম, তখন চারিদিকে ছিল নীরস মরুভূমি—আমার পিতৃদেব কিছু শালগাছ রোপন করেছিলেন, এ ছাড়া তখন চারিদিকে এমন শ্যামশোভার বিকাশ ছিল না এই আশ্রমকে আনন্দনিকেতন করবার জন্য তরুলতার শ্যামশোভা যেমন, তেমনি প্রয়োজন ছিল সঙ্গীতের, উৎসবের। সেই আনন্দ উপচার সংগ্রহের প্রচেষ্টায় আমার প্রধান সহায় ছিলেন দিনেন্দ্র।…আমি যে সময়ে এখানে এসেছিলাম, তখন আমি ছিলাম ক্লান্ত, আমার বয়স তখন অধিক হয়েছে—প্রথমে যা পেরেছি, শেষে তা-ও পারিনি। আমার কবি প্রকৃতিতে আমি যে গান করেছি, সেই গানের বাহন ছিলেন দিনেন্দ্র।…দিনেন্দ্রের দান এই যে আনন্দের রূপ, এ তো যাবার নয়—যতদিন ছাত্রদের সঙ্গীতে এখানকার শালবন প্রতিধ্বনিত হবে, বর্ষে বর্ষে নানা উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন চলবে, ততদিন তাঁর স্মৃতি বিলুপ্ত হতে পারবে না, ততদিন তিনি আশ্রমকে অধিগত করে থাকবেন, আশ্রমের ইতিহাসে তাঁর কথা ভুলবার নয় এখানকার সমস্ত উৎসবের ভার দিনেন্দ্র নিয়েছিলেন, অক্লান্ত ছিল তাঁর উৎসাহ। তাঁর কাছে প্রার্থনা করে কেউ নিরাশ হয়নি—গান শিখতে অক্ষম হলেও তিনি ঔদার্য্য দেখিয়েছেন—এই ঔদার্য্য না থাকলে এখানকার সৃষ্টি সম্পূর্ণ হত না। সেই সৃষ্টির মধ্যেই তিনি উপস্থিত থাকবেন।—প্রতিদিন বৈতালিকে যে রসমাধুর্য আশ্রমবাসীর চিত্তকে পুণ্যধারায় অভিষিক্ত করে,—সেই উৎসকে উৎসারিত করতে তিনি প্রধান সহায় ছিলেন। এই কথা স্মরণ করে তাঁকে সেই অর্ঘ্য দান করি,—যে-অর্ঘ্য তাঁর প্রাপ্য "

পরিশিষ্ট

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এই গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠায় ৪র্থ লাইনে ভুলক্রমে ছাপা হয়েছে :

দেব—এমনতর কথা আকাশের সূর্যদেবও কি কখনও···ইত্যাদি।

কিন্তু এর সংশোধিত রূপ হবে :

পৃথিবীকে আলো দেব—এমনতর কথা আকাশের সূর্যদেবও কি কখন ঘোষণা করতে পারেন ? বস্তুতঃ এ-সব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া বড় শক্ত

রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাগরাগিণী এবং তালের নাম-নির্দেশ প্রসঙ্গ

গায়কদের ভিতরে এমন অনেক আছেন কোনো একটা গান শুরু করবার পূর্বাহ্নে এর তাল ও রাগিণীর নামটি সুনির্দিষ্টরূপে জেনে নিতে না পারলে অন্তরে দারুণ আক্ষেপ বোধ করেন তাঁরা। তাঁদের কথা মনে করে শাস্ত্রীয় রাগরাগিণীর সঙ্গে মিলিয়ে-মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমুদয় গানের একটা তালিকা প্রণয়নের সংকল্প নিয়েছিলাম বহুকাল আগে ১৯৩৫ সালে দিল্লীতে কোনো এক রসিক ওস্তাদ সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গগুণে। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে পূজনীয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ যখন সদলে এলেন দিল্লী—তখন তাঁকে এই সংকল্পের কথা জানিয়ে উৎসাহ পেয়েছিলাম মনে পড়ে*। কিন্তু দীর্ঘসূত্রতাবশতঃ কাজটি বাস্তবে রূপায়িত হল না। আর হয়ত হবেও না,—যেমন করে ভেবেছিলাম ঠিক তেমন করে। কারণ সেই সঙ্গ, সেই উদ্যম, সেই পরিবেশ, সেই দিন এখন আর নেই—শতচেষ্টাতেও আবার ফিরে পাওয়া অসম্ভব। অথচ এমনতর এক-তালিকার প্রয়োজনীয়তা ও প্রকাশযোগ্যতা সর্বকালে অনস্বীকার্য। তাই অগত্যা পূর্বেকার বড়ো পরিকল্পনার বদলে অধুনা, রবীন্দ্রসঙ্গীতেরই প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের সহায়তায় অর্থাৎ কেবলমাত্র তত্র (কতক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক, কতক বা অন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা) নির্দেশিত রাগরাগিণী এবং তালের নাম নিয়ে, মোটামুটিভাবে, যে একটি ফর্দ দাঁড় করাতে পেরেছি তা-ই এখানে সংযোজিত করে দিলাম। যদি কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাদের কাজে লাগে তাহলে নিজশ্রম সার্থক বোধ করব। তবে তাঁদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ,—"গানের কাগজে রাগরাগিণীর নাম-নির্দেশ না থাকাই ভালো। নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে, রূপের মধ্যে না। কোন্ রাগিণী গাওয়া হচ্ছে বলবার কোনো দরকার নেই;—কী গাওয়া হচ্ছে সেইটেই মুখ্য কথা।"—কবিগুরুর এই উক্তির তাৎপর্য সর্বক্ষণ স্মরণে রেখে যেন তাঁরা এই তালিকাটি ব্যবহার করেন। এ-ছাড়া বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গেই তাঁদের জ্ঞাতার্থে আরো কিছু নিবেদন এই :

(১) আলোচ্য তালিকায় রাগরাগিণীর নামগুলি কিঞ্চিৎ বৃহত্তর হরফে মুদ্রিত হল।

(২) শ্রেণীভুক্ত গানের নামের পাশাপাশি তাল ও প্রকাশসূত্রের (অর্থাৎ যে-সব গ্রন্থ থেকে এগুলি প্রধানত সংকলিত, তাদের) নাম যথানিয়মে স্তম্ভ-বিভাগ করে দেখানো হয়েছে —অবশ্য সংক্ষিপ্ত আকারে কতিপয় সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে।

(৩) কোন-কোন গানের স্বরলিপি একই রকমের থাকা সত্ত্বেও, ভিন্ন-ভিন্ন গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করে' এদের রাগরাগিণী ও তালের নাম-নির্দেশ করাকালীন ভিন্ন-ভিন্ন জ্ঞানলব্ধ কৃতী সম্পাদক-কর্তৃক সময়-সময় পূর্বসূরী-কৃত নামগুলিরই উপর যে পার্থক্য রচিত হয়েছে—

* পূজনীয় গুরুদেবের গান নিয়ে তাঁর সঙ্গে বর্তমান লেখকের তাৎকালিক আলোচনার কিছু-কিছু অংশ ১৯৬৮, ১৯৭০ সালের 'সুরছন্দা' মাসিক পত্রিকায় "রবীন্দ্রগীতস্মৃতি" নামে প্রকাশিত রচনাগুলিতে পাওয়া যাবে।

তাও এই তালিকায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়; অর্থাৎ কবিগুরু যে বলেছিলেন: "নামের সত্যতা দশের মুখে,—সেই দশের মধ্যে মতের মিল না-ও থাকতে পারে"—(রঃ রচনাবলী-১৪শ খণ্ড, পৃ ৯৭২), তাঁর এ-কথারও যথাযথ তাৎপর্য পাঠকেরা এরই মাধ্যমে উপলব্ধি করার সুযোগ পেতে পারেন।

(৪) "প্রকাশসূত্র" স্তম্ভে সাংকেতিক চিহ্নের দ্বারা নামোল্লিখিত গ্রন্থগুলির পূর্ণ পরিচয়:

স্ব-বি = স্বরবিতান: বিশ্বভারতী প্রকাশিত স্বরলিপি-পুস্তিকামালা।

স্ব-গী-মা কিংবা **গী-মা = স্বরলিপি-গীতি-মালা:** জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত।

ব্র-স্ব = ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি: প্রণেতা কাঙ্গালীচরণ সেন।

শ-গা = শতগান: সরলাদেবী-রচিত স্বরলিপি-গ্রন্থ।

স-গী = সংগীত-গীতাঞ্জলি: ভীমরাও শাস্ত্রী-কৃত দেবনাগরী অক্ষরে স্বরলিপি-গ্রন্থ।

গী-লি = গীতলিপি: সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত স্বরলিপি পুস্তক।

র-স = রবীন্দ্রসঙ্গীত: শান্তিদেব ঘোষ প্রণীত।

গীতশ্রী: সাহানা দেবী এবং দিলীপকুমার রায় প্রণীত স্বরলিপিগ্রন্থ।

রবিচ্ছায়া: রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম প্রকাশিত গানের বই।

শারদোৎসব: রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যগ্রন্থ' ৮ম খণ্ডের অন্তর্গত (প্রকাশ ১৯১৬)।

(৫) এই তালিকায় তারকা (*) চিহ্নিত গানগুলির সুর কবির স্ব দত্ত নয় বলে জানা যায়। এ সম্পর্কীয় অধিকতর তথ্য সংশ্লিষ্ট 'প্রকাশসূত্রে' দ্রষ্টব্য।

রাগরাগিণী এবং তালের নাম-নির্দেশিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিকা

গান	তাল	প্রকাশসূত্র
অহং		
চল্ চল্ ভাই।	কাহারবা॥	স্ব বি ২৯
আলাইয়া		
আমার নয়ন।	একতাল॥	শারদোৎসব
ওই পোহাইল।	ত্রিতাল॥	স্ব-বি ২৪
কে রে ঐ ডাকিছে।	ধামার॥	„ ২৫
তোমারেই করিয়াছি।	ঝাঁপতাল॥	„ ২৩
বসে আছি হে।	একতাল॥	„ ২৫
সংসারেতে চারিধার।	আড়ঠেকা॥	„ ৮
যাই যাই, ছেড়ে দাও।	দাদরা॥	„ ৩৫
আড়ানা		
আজি মম জীবনে।	তেতালা॥	স্ব-বি ২৪
নিত্যসত্যে চিন্তন।	ঝাঁপতাল॥	„
বাণী তব ধায়।	চৌতাল॥	„
মন্দিরে মম কে।	একতাল॥	স্ব-বি ৪
সকলগর্ব দূরকরি দিব।	ঐ॥	„ ২৩
আশাবরী		
অনেক দিয়েছ নাথ।	কাওয়ালি॥	স্ব-বি ৪
এখনো আঁধার।	চৌতাল॥	„ ৮
তব অমল পরশ।	ত্রিতাল॥	„ ২৬

আশাবরী (মিশ্র)

আসোয়ারি টোড়ি

আশা-ভৈরবী

আনন্দ-ভৈরবী

ইমন

ইমনী

ইমন-কল্যাণ

ইমন-ভূপালী

কর্ণাটি-খামাজ

কেদারা

কুকব

খট্

খামাজ

খামাজ-বাহার

গারা

গান্ধারী

গৌড়

গৌড়-সারং

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ

টোড়ি

টোড়ি (মিশ্র)

টোড়ি ভৈরবী

তিলোক কামোদ

দেওগিরি

দেওগিরি রিলাওল

দেশ

দেশকার

দেশকার (মিশ্র)

দেশ খাম্বাজ

দেশ মল্লার

দেশ সিন্ধু

পূর্বী কল্যাণী

পূর্ণ ষড়জ রাগিনী

প্রভাতী

বড়হংস সারঙ্গ

বাঁরোয়াঁ

বাউলের সুর

বাগেশ্রী

বাগেশ্রী (মিশ্র)

বাগেশ্রী বাহার

বাহার

বাহার (মিশ্র)

বাহার বাঁরোয়াঁ

বিভাস

বিভাস (মিশ্র)

বেলাওল

বেলাওল (মিশ্র)

বেলাওল আইরিশ

বেহাগ

বেহাগ (মিশ্র)

বেহাগ-খাম্বাজ

বেহাগড়া

বৃন্দাবনী-সারং

ভজন

ভীমপলশ্রী

ভৈরব কিংবা ভায়রোঁ

ভৈরবী

মিশ্র খাম্বাজ

মিশ্র গৌর সারং

মিশ্র ধনাশ্রী

মিশ্রবসন্ত

মুলতান

মেঘ

মেঘ মল্লার

মেঘাবলি

যুথীকামোদ

যোগিয়া

যোগিয়া (মিশ্র)

যোগিয়া বিভাস

রামপ্রসাদীসুর

রাজবিজয়

এমন আর কতদিন। কাওয়ালি ॥ স্ব-বি ৪৫
জগতে আনন্দযজ্ঞে। একতাল ॥ স-গী

সাহানা

আজ বুঝি আইল। ত্রিতাল ॥ স্ব-বি২৫
ডেকেছেন প্রিয়তম। ঝাঁপতাল ॥ „ ২৬
নিবিড় ঘনআঁধারে। নবতাল ॥ „ ৪

সাহানা (মিশ্র)

জড়ায়ে আছে বাধা। তেওরা ॥ স-গী
জীবনে আমার যত। ১ তাল ॥ স্ব-বি ২৬
ভুবন হইতে। একতাল ॥ ঐ ২৩
মেঘের পরে মেঘ। একতাল ॥ গী-লি ৩
যারা কাছে আছে। একতাল ॥ স্ব-বি ২৫
সকল করহে প্রভু। কাওয়ালি ॥ ঐ ৪
হার মানা হার পরাব। দাদরা ॥ স-গী

সিন্ধু

আমায় বলো না গাহিতে। ঝাঁপতাল ॥ শ-গা
এ পরবাসে রবে কে। মধ্যমান ॥ স্ব-বি ৮
কে-বসিলে আজি। মধ্যমান ॥ „ ৪৫
চরণধ্বনি শুনি তব। ঝাঁপতাল ॥ „ ২৫
হৃদয় বেদনা বহিয়া। তেওরা ॥ ঐ
*নিমেষের তরে। কাওয়ালি ॥ গী-মা ২

সিন্ধু (মিশ্র)

আজ নাহি নাহি। ত্রিতাল ॥ স্ব-বি ৩৬
আজ তোমারে। খেমটা ॥ গী-মা ১
তবে শেষকরে দাও। কাওয়ালি ॥ গী-মা ৪
অলি বারবার ফিরে। একতাল ॥ „ ২
দিবসরজনী আমি। „ ॥ ঐ
দেবতা জেনে দূরে রই। ১ তাল ॥ স-গী
মেঘের পরে মেঘ জমেছে। „ ॥ „
সমুখেতে বহিছে। ত্রিতাল ॥ স্ব-বি ২৯
হাসি কেন নাই নয়নে। কার্ফা ॥ ঐ ৩৫

সিন্ধু খাম্বাজ

আজ আসবে শ্যাম। খেমটা ॥ স্ব-বি ২৮
গায়ে আমার। ঢিমেতেতালা ॥ গী-লি ১
দেখ ঐ কে এসেছে। খেমটা ॥ স্ব-বি ৩৫
দেবতা জেনে দূরে। একতাল ॥ „ ৩৭
বাজিবে সখি বাঁশি। তেওরা ॥ „ ২৮

সিন্ধু বারোয়াঁ

আমি কী বলে। অর্ধঝাঁপ ॥ স্ব বি ২২
তোবা শুনিস নি কী। যৎ ॥ গী-লি ৩

সিন্ধু কাফি

আজি ঝড়ের রাতে। ঝম্পক ॥ স-গী
কেহ কারো মন। আড়ঠেকা ॥ স্ব-বি ৩২
চরণ ধ্বনি শুনি। ঝাঁপতাল ॥ ব্র-স্ব ৫
তোরা শুনিসনি কী। তেওরা ॥ স-গী
বাঁশরী বাজাতে চাহি। কাওয়ালি ॥ গী-মা ৪
যদি তোমার দেখা। ১ তাল ॥ স-গী
যদিএ আমার। ঝাঁপতাল ॥ স্ব-বি ২৭
শান্তিভবন। ঢিমেতেতালা ॥ গী-মা ৪
* হা সখি ও আদরে। কাওয়ালি ॥ ঐ ১

সিন্ধু ভৈরবী

আনন্দেরি সাগর। তেওরা ॥ শারদোৎসব
যদি এ আমার ঝাঁপতাল ॥ ব্র-স্ব ১

সিন্ধুড়া

জয় ভব প্রাণে নাথ। ত্রিতাল ॥ স্ব-বি ২২
জয়তি জয় জয় কাহারবা ॥ „ ২৯
কেমনে রাখিব ঝাঁপতাল ॥ „ ২৬
ধনে জনে আছি একতাল ॥ স-গী

সুগ্রাহী (মিশ্র)

আমার খেলা যখন ছিল। দাদরা ॥ স-গী

সুরট

এ ভারতে রাখ। চৌতাল ॥ স্ব-বি ৪

"তবু,—যত দৌরাত্ম্যই করি না কেন, রাগরাগিণীর এলাকা একেবারে পার হইতে পারি নাই। দেখিলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে,—কিন্তু বাসাটা তাদেরই বজায় থাকে। আমার বিশ্বাস এই রকমটাই চলিবে। কেননা, আর্টের পায়ের বেড়িটাই দোষের কিন্তু তার চলাব বাঁধা পথটায় তাকে বাঁধে না।"—

রবীন্দ্রনাথ